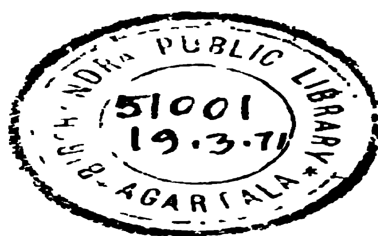
ইনক্লাব জিন্দাবাদ

ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ

[বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক]

লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত



রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৬

॥ দাম সাত টাকা মাত্র ॥

উৎসর্গ

ভারতের সুদীর্ঘ সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের (১৮৭৯—১৯৪৭, ১৫ই আগস্ট) দুর্যোগময় গভীর অন্ধকার রাত্রির প্রায় প্রতি পদক্ষেপে নিঃসম্বল, আপনভোলা দুরন্ত সংগ্রামীদের পথচলা যখন ছিল দুরধিগম্য ও দুঃসাধ্য, তখন ভারতের যে সকল নমস্য আত্ম-বলিদানকারীদের নিষ্কলুষ আত্মোৎসর্গের অনির্বাণ দীপশিখায় সেই গাঢ় অমানিশার পথ-পরিক্রমা হইয়া উঠিত আনন্দ-উজ্জ্বল, সেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাত শহীদ-কুলের মহৎ আত্মার অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" পুস্তকটি সবিনয়ে ও পরম শ্রদ্ধার সহিত উৎসর্গীকৃত হইল।

লেখক

অবতরণিকা

শৌর্য, বীর্য, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সাধনা ও স্বাধীন সত্তার উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অনৈক্য ও আত্মকলহের বিষময় পরিণামে প্রাচীন ভারত দশম হইতে একাদশ শতাব্দীতে আরব মরুভূমি এবং মধ্যপ্রাচ্য সংলগ্ন জনপদ পারস্য দেশ হইতে আগত ইসলাম-শক্তির নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া তাহার অমূল্য স্বাধীনতা ধন হইতে বঞ্চিত হয়।

পরবর্তীকালে ভারতের সেদিনের কথা স্মরণ করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

'এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল
এসেছে মোগল।
বিজয় রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয় পতাকা।'

তারপর পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধ হইতে উপনীত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সুযোগ-সন্ধানী শোষক ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী ছলে, বলে, কৌশলে ও ভাগ্যগুণে অপরাপর বিদেশী শক্তি এবং ভারতে অবস্থিত মুসলমান প্রাধান্যকে খর্ব করিয়া ক্রমশ ভারতের ভাগ্য-বিধাতা রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

সেই ফিরিঙ্গি রাজত্বের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া কবিগুরু আবার লিখিয়াছেন :

'আর বার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহ বাঁধা পথে
অনল নিঃশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।'

পরাধীন ভারতের এই অতীত দুর্দিনের কথা, অপমানের কথা, লজ্জার কথা সখেদে স্মরণ করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনী "ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়া"তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

"পশ্চাতে দৃকপাত করিয়া যখন এই সময়ের কথা ভাবি, তখন দেখিতে পাই যে, পর পর কতকগুলি আকস্মিক ঘটনা ও অপ্রত্যাশিত সুবিধার সুযোগ পাইয়া ইংরেজ ভারতের উপর তাহার আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিল।

বিপুল ধন ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ উজ্জ্বল উপহার স্বরূপ ভারতের মতো সুবিশাল সাম্রাজ্য তাহারা কত না সহজে করায়ত্ত করিয়াছিল। অথচ ঘটনার সামান্যতম হের-ফেরে যে কোন মুহূর্তে তাহাদের সেই আশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হইয়া যাইতে পারিত।"

এইভাবে জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়া ভারতবাসিগণ সাহস, আত্মমর্যাদা ও আত্মশক্তির সার্থকতা সম্বন্ধে ক্রমশ সন্দিহান হইয়া পড়েন এবং হীনবীর্য হইয়া যান।

ভারতের ললাটে এই পর-শাসনের দুর্ভাগ্যজনিত কালিমা-লিপ্ত দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও শত-শতাব্দীর গ্লানিকর সুপ্তি ও পুঞ্জীভূত হতাশা হইতে উত্থিত হইবার নিমিত্ত উদাত্ত আহ্বান জানাইতে দূরদর্শী, দেশহিতৈষী ও বিপ্লবী মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি এবং জননায়কদের অভাব হয় নাই।

সেই ঘোর তমিস্রা-পূর্ণ দুর্দিনের মরণজয়ী ঐতিহাসিক বক্তব্যের নিহিত মর্মকথা ছিল :

"ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচন প্রচেষ্টায় বিদেশী রাজ-শক্তির পশুবলের সম্মুখীন হইয়া যে-কোন প্রকার লাঞ্ছনা, অপমান, নির্যাতন, কারাবরণ, এমন কি—প্রয়োজনবোধে মৃত্যু-বরণের জন্যও প্রস্তুত থাকা এবং সঙ্কেতমাত্র অগ্রসর হওয়া।"

পঙ্কিল আবর্তে নিক্ষিপ্ত মেরুদণ্ডহীন পরাধীন দেশবাসীর মধ্যে এই মৃত্যু-ভয়ঙ্কর ও সর্বস্বত্যাগের আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য

সেই দিন যে খুব অধিকসংখ্যক দেশবাসীর সমর্থন লাভ করা সম্ভবপর হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

তাই যে কয়জন মুষ্টিমেয় সশস্ত্র-বিপ্লবী তখনকার দিনে আপন আপন বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য স্ফীতকায় অর্থ উপার্জনের চিন্তা, সম্মানিত শিক্ষা-দীক্ষার শিখরে উপস্থিত হইয়া আনন্দিত হইবার আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগী আত্মীয়-পরিজনের নির্ভরযোগ্য আশ্রয় ও আকাঙ্ক্ষিত সুখী দাম্পত্যজীবনের সোনালী স্বপ্ন পশ্চাতে ফেলিয়া সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন ও নির্লোভচিত্তে সর্বস্বত্যাগের পথে অবিচলিত থাকিয়া শৃঙ্খলিতা ভারতমাতার শৃঙ্খল-কলঙ্ক মোচনে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ যাত্রাপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত ও উপহসিত জীবনের পাথেয় ছিল কেবলমাত্র, audacity and death, অর্থাৎ, দুরন্ত স্পর্ধা ও মৃত্যুবরণের চরম দুঃসাহসিকতা। এখানে সেই স্পর্ধিত অতীত দিনের দুই-একটি অবিস্মরণীয় পৃষ্ঠা উন্মোচিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র।

ইহাতে কতটা সফলতা লাভ করিয়াছি পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা বলিতে পারিবেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কোনদিন তাহার আপন বিবর হইতে বাহির হইয়া বাস্তবে রূপায়িত হইয়া উঠিতে পারিত না, যদি না প্রতিবেশী কথাশিল্পী শ্রীশৈলেশ দে-র প্রবল উৎসাহ, শুভেচ্ছা ও তাগিদ আমাকে চতুর্দিক হইতে অনবরত ঘিরিয়া না ধরিত। সুতরাং তাঁহার ঋণ শোধ করিবার কথা উত্থাপন করিতেছি না।

আমার এই লেখা পলাশী-যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজ-যুগের ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ তারিখ পর্যন্ত বিস্তৃত। যদিও খুবই সংক্ষিপ্ত। বলা যায়, শহীদের তপ্ত রক্তে রঞ্জিত সেই সময়কার সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টার কাহিনীগুলি ছুঁইয়া যাওয়া হইয়াছে মাত্র।

আর গ্রন্থের শেষভাগে কয়েক পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট আছে।

বিপ্লবীদের সেই প্রচেষ্টাকে লঘু ও হেয় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সেই সময় বিদেশী ইংরেজ সরকার কখনও বলিত নিহিলিষ্ট, কখনও বলিত এনার্কিষ্ট, কখনও বা বলিত টেররিস্ট।

কিন্তু আমার বর্ণিত কাহিনীর ভিতরকার কেন্দ্রীয় চরিত্র হইল বিপ্লব-আন্দোলনের অন্যতম সার্থক পথিক, ভারত তথা পৃথিবী-বন্দিত দুঃসাহসী বিপ্লবী শহীদ—এ, আজম ভগৎ সিং।

তাঁহার সম্পূর্ণ জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিবার পরিপূর্ণ তথ্য আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাই আউট-লাইন বা রেখা টানা হইয়াছে বলাই ভালো।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি রচনার জন্য স্বভাবতঃই প্রামান্য পুস্তকাবলী, জীবিত বিপ্লবী, সহৃদয় ব্যক্তি-বিশেষ ও অপরাপর প্রকাশিত নির্ভরযোগ্য প্রবন্ধ এবং সংগৃহীত তথ্যের সহায়তা নেওয়া হইয়াছে। কারণ, ঐতিহাসিক জীবনী অলীক কল্পলোকের পাখায় ভর করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। উহা তথ্য-নির্ভর ঘটনায় জড়িত, দীপ্ত সত্য-ভাষণের অভিব্যক্তি। কিন্তু ঐ সত্য ঘটনা কখনও কখনও এমন অভাবনীয়ভাবে ঘটে যে, তখন উহা কল্পনাকেও হার মানায়। সেইজন্য বলা হয়, "ট্রুথ ইজ ষ্ট্রেনজার দ্যান ফিক্‌সন।"

অথচ এই সংগ্রহকার্য যে কেবলমাত্র কষ্টসাধ্য, এমন নয়। প্রকৃত-পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভবও।

এই গ্রন্থ-রচনায় সর্বাধিক পরিমাণ সাহায্য লইয়াছি শ্রদ্ধেয় শ্রীকালীচরণ ঘোষের বিশেষ মূল্যবান ও তথ্য-সমৃদ্ধ গ্রন্থ "রোল অব অনার" হইতে। আমি তাঁহার পরম স্নেহভাজনদের অন্যতম। তবু এই সুযোগে মুক্তকণ্ঠে সেই ঋণ স্বীকার করিতে বাধা নাই। সুতরাং সকৃতজ্ঞচিত্তে তাহা স্বীকার করিতেছি।

আর একথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, রবীন্দ্র লাইব্রেরীর তরুণ ও বুদ্ধিদীপ্ত কর্ণধার শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস এই পুস্তক

প্রকাশিত করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। নতুবা ইহা এত শীঘ্র প্রকাশিত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

প্রুফ সংশোধনের দুরূহ ও বিরক্তিকর কাজে রবীন্দ্র লাইব্রেরীর শ্রীপরিতোষ চক্রবর্তী এবং শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার আমাকে সদা-সর্বদা সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

ভ্রমবশতঃ যে সকল ভুল-ত্রুটি থাকিয়া গেল তাহা পরবর্তী সংস্করণ ব্যতীত সংশোধন করা সম্ভব নয়।

ইহা ভিন্ন যে সকল পুথি-পুস্তক, লেখক ও সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে আমি বিভিন্ন উপায়ে উপকৃত হইয়াছি তাঁহাদের সকলের প্রতি জানাই আমার অসীম কৃতজ্ঞতা। কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্ত বিহারী মুখোপাধ্যায়, শহীদ যতীন দাসের ভ্রাতা—প্রাক্তন রাজবন্দী শ্রীকিরণ দাস, শহীদ ভগৎ সিং এর ভ্রাতা—শ্রীকুলবীর সিং-এর কন্যা শ্রীমতী ভীরেন্দ্র (সিন্ধু) অরোরা (দিল্লী), পিউপিলস্ পাথ (জলন্ধর)-সম্পাদক—শ্রীনরেন্দ্রকুমার যোশী, শহীদ ভগৎ সিং-এর সতীর্থ—লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার প্রাক্তন বন্দী সাংবাদিক শ্রীবিজয়কুমার সিন্‌হা, লেখক ডাক্তার জি. এম. দিওল, অধ্যাপিকা শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায়, কম্পাস-সম্পাদক শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত, কলিকাতার সেভিয়েত কনসাল-জেনারেল দপ্তরের বার্তা-বিভাগ, ডক্টর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পুরুলিয়ার জননেতা ও সুলেখক শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীনির্মল রায়, শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (লেকচারার, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া) ছাত্রবন্ধু এ. এস. নাসের, শ্রীগুরুদাস রামজী, শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (জাতীয় গ্রন্থাগার), প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল গুহ, শ্রীবটুকনাথ আগরওয়াল (বারানসী), শহীদ ভগৎ সিং-এর সহযোদ্ধা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার প্রাক্তন বন্দী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে, সঙ্গীত-শিক্ষিকা ও প্রাক্তন নজরবন্দিনী

শ্রীযুক্তা শান্তি রায়, কবি-সাংবাদিক শ্রীকৃষ্ণ ধর, ভারত সরকারের তথ্যকেন্দ্রের কলিকাতা শাখার অধ্যক্ষ শ্রী জি. সি. চক্রবর্ত্তী, শহীদ ভগবতীচরণ ভোরার স্ত্রী দুর্গাদেবী ভোরা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং মহিলাদের কাছে আমি একাধিক কারণে ঋণী। সুতরাং তাঁহারা সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ।

এই পুস্তক রচনার জন্য যে সকল পুথি-পুস্তক হইতে আমি অল্প-বিস্তর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি এবার তাহাদের কিছু নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

রোল অব অনার	শ্রীকালীচরণ ঘোষ
ভগৎ সিং ও দত্তের অমর কাহিনী	সম্পাদনায়, শ্রীচমনলাল আজাদ
মিলিটাণ্ট ন্যাশানালিজম ইন ইণ্ডিয়া	শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার
জেলে ত্রিশ বছর	শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী
ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম	ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
আনন্দ মঠ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অনুশীলন সমিতির ইতিহাস	শ্রীজীবনতারা হালদার
রেমিনেসেন্স অব লর্ড হার্ডিঞ্জ	ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া
সন্ধ্যা (১৯০৭)	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
সাহিত্য সাধক বিবেকানন্দ	ডক্টর অধীর দে

স্বামী বিবেকানন্দের মাদ্রাজ-ভাষণের অংশ বিশেষ (১৮৯৭)

ইন্দু প্রকাশ (পুণা) (১৮৯৩)

পিউপিলস্ পাথ (মাসিকপত্র একাধিক সংখ্যা) জলন্ধর, পাঞ্জাব

রাসবিহারী বসু এণ্ড হিজ স্ট্রাগল ফর ইণ্ডিয়াজ ইণ্ডিপেনডেনন্স	প্রধান সম্পাদক, শ্রীরাধানাথ রথ সম্পাদক, শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
নবশক্তি	(১৯০৭, আগস্ট)

কম্পাসে প্রকাশিত কমরেড শৌকত ওসমানির বর্ণিত উক্তি

টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভলিউসনারিজ	শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায়
জাতীয়-আন্দোলনে সতীশচন্দ্র	অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায়
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি	ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
মাই লাইফ স্টোরি : ফিফটি ইয়ার্স	রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ
রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের ব্যক্তিগত পত্র	ডাঃ জি.এস. দি ওল-এর একাধিক প্রবন্ধ, মাসিকপত্র পিউপিলস্ পাথ-এ প্রকাশিত।
মরণ-বিজয়ী যতীন্দ্রনাথ দাস	শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী
আনটোল্ড স্টোরি	জেনারেল কাউল
ইন সার্চ অব ফ্রীডম	৺যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাংলায় বিপ্লববাদ	শ্রীনলিনীকিশোর গুহ
পেট্রিয়ট	দৈনিক পত্রিকা, দিল্লী
হাউ ইণ্ডিয়া স্ট্রাগল্‌ড ফর ফ্রীডম	শ্রীরামগোপাল
দি লাষ্ট ইয়ারস অব ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া	মাইকেল এডোয়ার্ডস
ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল	সুভাষচন্দ্র বসু
দি লাস্ট ডেজ অব ব্রিটিশরাজ	লিওনার্ড মোজলে
লেষ্ট উই ফরগেট	সম্পাদনায়, চমনলাল আজাদ
নবাগত হে পথিক বিগত পথিকদলে কর নমস্কার	সম্পাদনায়, প্রভাংশু ধর-চৌধুরী
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের	২।৩টি কবিতার ভগ্ন অংশ ও একটি ভাষণের ক্ষুদ্র অংশ
নির্বাসিতের আত্মকথা	৺উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবন্ধ ও ভাষণ (মস্কো)	৺অজয় ঘোষ, ১৯৬২
বিপ্লবের পথে	শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত
স্বাধীনতা	শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৭
দেশ	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩

কম্পাস — শারদীয়া, ১৩৭৫
দি ইয়ার অব দি গ্রেট ব্রেক থ্রু — নভাস্তি প্রেস এজেন্সী (মস্কো)
(কলিকাতা সোভিয়েত কনসাল জেনারেল দপ্তরের সৌজন্যে)
আমি সুভাষ বলছি — শ্রীশৈলেশ দে
ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়া — জওহরলাল নেহেরু
বিদ্রোহী কবি নজরুলের একটি গানের কলি
উত্তরপ্রদেশের কবি বিমলের একটি গানের কলি,
শহীদ কর্তার সিং সরাবার কবিতার অংশ-বিশেষ ও রচনা
সার্চ লাইট (পাটনা) দৈনিক পত্রিকা, একাধিক সংখ্যা।

এখানেই আমার প্রাথমিক বক্তব্য শেষ হইয়াছে বলিয়া ভূমিকা শেষ করিবার কথা। কিন্তু এই পুস্তকে প্রধানত যাঁহার (সর্দার ভগৎ সিং) বিষয়ে বলিব বলিয়া অগ্রসর হইয়াছি, তাঁহার সেই কথা বুঝিবার পক্ষে সহজ হইতে পারে মনে করিয়া আর একটি পুরাতন কথা তুলিয়া ধরিতে চাই।

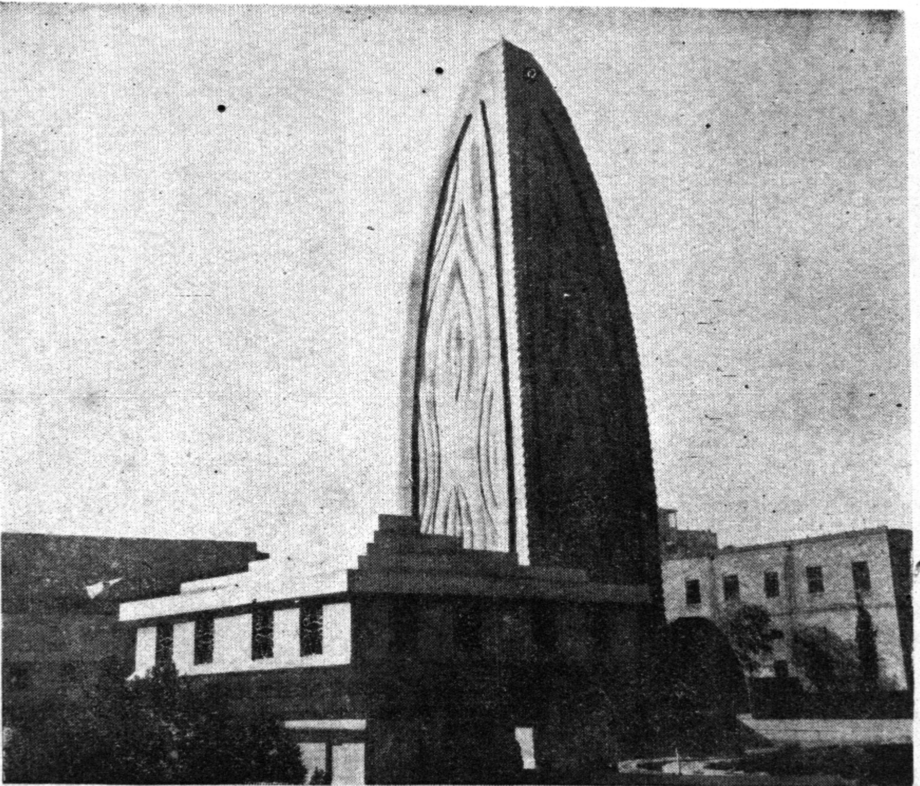
কথাটি "নির্বাসিতের আত্মকথা"য় অরবিন্দ-বারীন্দ্র-উল্লাস-এর সহকর্মী, অগ্নিযুগের অন্যতম সার্থক বিপ্লবী-প্রধান উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছিল অনেকদিন আগে।

॥ ষোল আনা স্বাধীনতা ॥

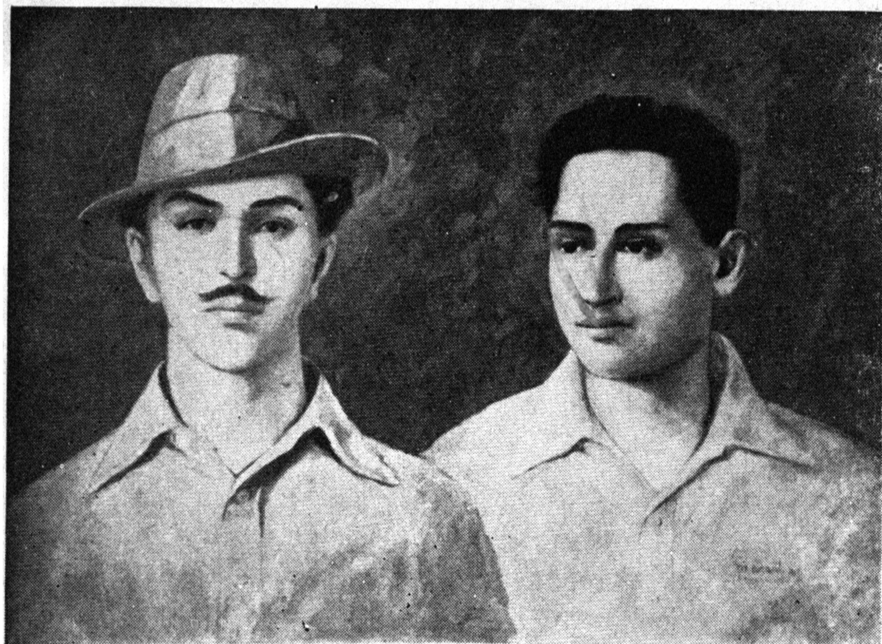
"দেশের যারা জনসাধারণ, বিদেশী ও স্বদেশীর পায়ের তলায় যারা সমানভাবে দলিত, তারা ষোল আনা স্বাধীনতা চায়।

একসঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক আর আর্থিক মুক্তিই তাদের কাম্য। স্বাধীনতার নাম করে যে তাদের ডাক দেবে তার শুধু আংশিক স্বাধীনতার কথা বললে চলবে না; ষোল আনা স্বাধীনতা দেবার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হবে।"

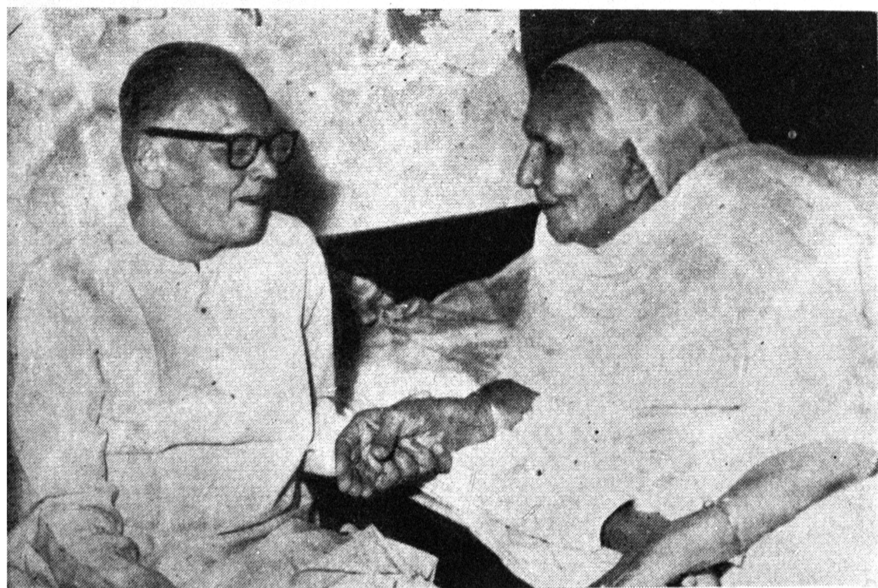
১৮ই বৈশাখ, ১৩৭৭ — ইতি
৮ডি, একডালিয়া প্লেস — শ্রীলোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
বালিগঞ্জ, কলিকাতা-১৯।



জালিয়ানওয়ালা বাগের শহীদস্তম্ভ



ভগৎ সিং বটুকেশ্বর দত্ত



ভগৎ সিং-এর মা ও কিরণ দাস



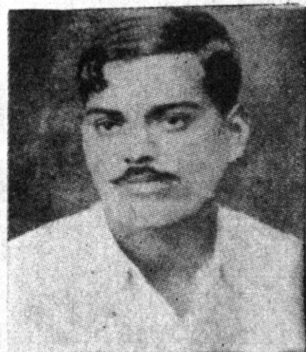
শুকদেব



রাজগুরু



যতীন দাস



চন্দ্রশেখর আজাদ



রামপ্রসাদ বিসমিল



ঠাকুর রোশন সিং



রাজেন লাহিড়ী



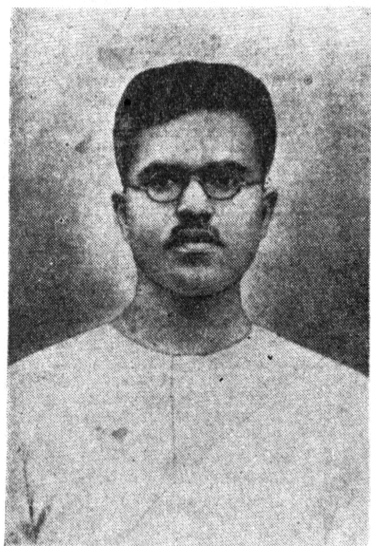
আসফাকউল্লা



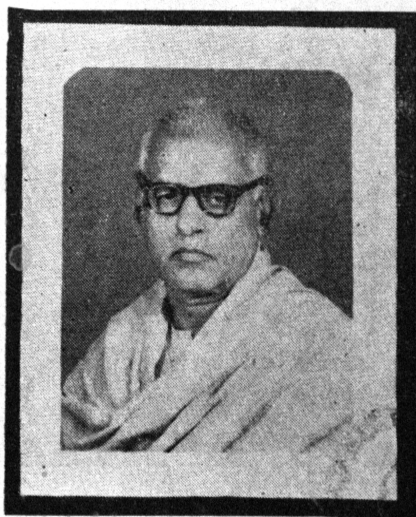
বিষ্ণু গণেশ পিংগলে



কর্তার সিং



ভগবতীচরণ



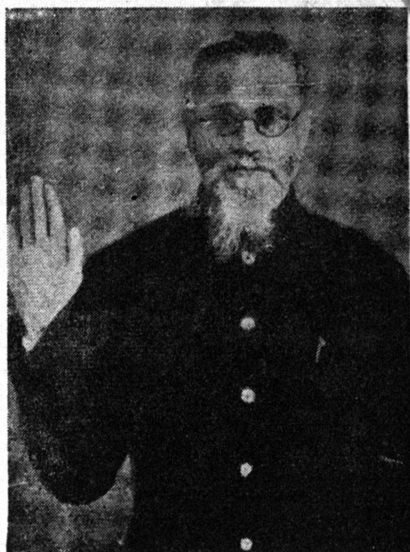
শুকদেব রাজ



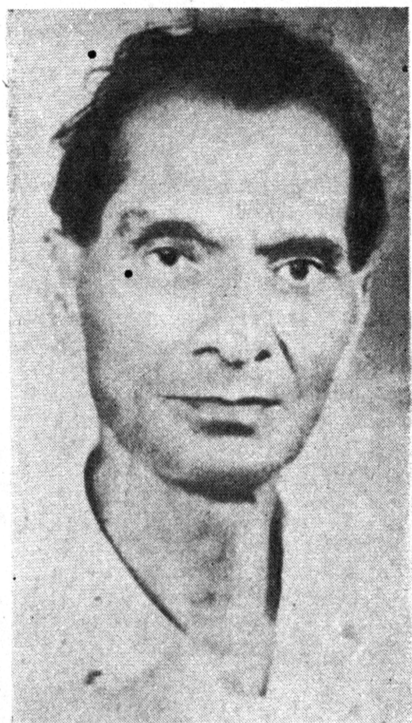
দুর্গা দেবী



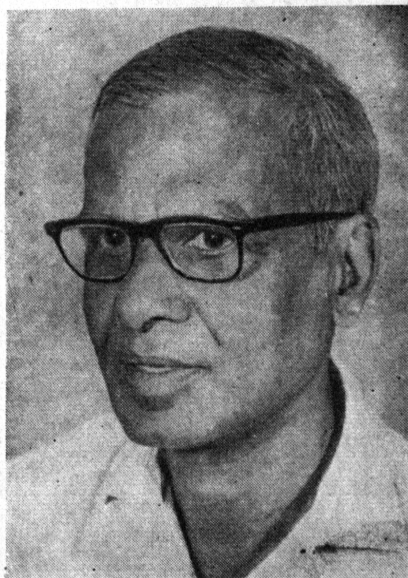
ডাঃ খান খোজে



রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ



সুরেন্দ্র পাণ্ডে



বিজয় সিং



ক্ষুদিরাম



উধম সিং



বাঘা যতীন



সুভাষচন্দ্র

॥ বাংলাতে গুরুমুখী ॥

সেবা দেশ দি—জিন্দিরিয়ে বড়ি ওখি
গালান্ করনিয়ান ঢের সুখালিয়ান নে,
জিন্হান দেশ-সেবা ভিচ্ প্যার পায়া
উনহান লাখ্ মুসিবতান ঝলিয়ান নে।

॥ ভাবানুবাদ ॥

দেশের কাজ করব, বলা তো সোজা।
কিন্তু করা কঠিন।
কারণ দেশপ্রেমের পথে ছড়ানো রয়েছে
অগুনতি বাধা-বিপত্তি, দুঃখকষ্ট—
আর মরণসম অশেষ পীড়ন।

॥ ইংরিজী অনুবাদ ॥

Difficult is the service of the Nation
Easy are utterences.
But, the path of patriotism
has countless torments.

এই ছোট্ট কবিতাগুচ্ছটি সর্বদা স্মরণ রাখতেন, ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের—অমর শহীদ, কর্তার-সিং সরাবা।

শহীদের সেই অমর বলিদানের দিকে তাকিয়ে কবিতাটি বারবার উচ্চারণ করে, আবৃত্তি করে, কণ্ঠস্থ করে ফেলেছেন আরেকজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী। নাম তাঁর ভগৎ সিং।

অসীম আনন্দে আর আগ্রহে অধীর হয়ে, ভগৎ সিং তাঁর মাকে বলছেন শহীদ কর্তার-সিং সরাবার স্থির-চিত্র হাতে নিয়ে "মা—দেখ—দেখ, চেয়ে দেখ। কী সুন্দর চেহারা! এই

আমার জীবনের আদর্শ বীরপুরুষ। আমার বন্ধু, আমার সাথী, আমার পথপ্রদর্শক। এই ছবি, আর কবিতা, আমার চলার পথের সঙ্গী। আমার অন্তরের সুরধনী। আমার আশার আশাবাণী।"*

পাগল ছেলের কাণ্ড দেখে ভগৎ সিং-এর মা, দেবী বিদ্যাবতী, বুকে তুলে নেন গর্ভের দুলালকে। এঁকে দেন চুম্বন তাঁর প্রশস্ত ললাটে। আশীর্বাদ করেন মাতৃস্নেহের অপার স্নেহ আর মমতা দিয়ে।

উৎসাহ দেন দেশকে ভালবাসার চিন্তায় এগিয়ে যেতে।

কিন্তু কে এই কর্তার সিং?

কোথা থেকে এল স্বাধীনতার স্বপ্ন?

কবে হারালেম স্বাধীনতা ধন?

কবে থেকে সুরু হল ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলন?

কেনই বা এই নিঃশেষে আত্মবলিদান?

এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে, অন্ততঃ আভাষ জানতে গেলে, আমাদের যেতে হবে দূর অতীতে।

* * * *

তখন ১৭৫৭ সাল। ২৩শে জুন।

একদিকে ইংরেজ সৈন্য আর তাদের ভাগ্যান্বেষী, দুঃসাহসিক, সৈন্যাধ্যক্ষ রবার্ট ক্লাইভ।

অন্যদিকে, নবাব সৈন্য আর ষড়যন্ত্রপ্রিয়, উচ্চাভিলাষী, মসনদলোভী, সৈন্যাধ্যক্ষ জাফর আলি খাঁ।

একাধিক কারণে সেদিন বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীর আম্রবাগানে, ইংরেজের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী হলেন সুপ্রসন্না।

তাঁদের ললাটে পরালেন, বিজয়ীর জয়টিকা।

মুর্শিদাবাদের রাজপথের দু'ধার থেকে প্রজাপুঞ্জ আভূমি আনত হয়ে জানালেন দু'হাতে কুর্ণিশ। দিলেন, হাজার "আশরফী"-র নজরানা!

---

*গদরদল ও শহীদ ভগৎ সিং—ডাঃ জি, এস, দিওল। পিউপিলস্ পাথ মার্চ, ১৯৬৮।

হ'ল সুদীর্ঘ কালের "মুসলমান" রাজত্বের অবসান। পরিবর্তে দেখা গেল দুর্দান্ত ফিরিঙ্গী রাজত্বের উত্থান। কবির ভাষায়ঃ

"—বণিকের মানদণ্ড

দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে— পোহালে শর্বরী।"

এগিয়ে চললো "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর" সৈন্যদল।

"রুল ব্রিটানিয়া" বলে বেজে উঠল বিউগ্যাল।

ইংরেজ সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী, বিজয়ী ক্লাইভের সুমুখ দিে কুচকাওয়াজ করতে করতে, সহর্ষে উচ্চারণ করল, লেফট্, রাইট্, লেফট্, রাইট্।

তারপর, সেই কুচকাওয়াজ বাহিনীর প্রধান, তারস্বরে চীৎকার করে উঠলঃ "আই-জ্য-রাইট্"!

* * * *

এরপর, ইংরেজ শাসনের অনেক ষড়যন্ত্র, অনেক শোষণ, অনেক অন্যায়, অনেক অবিচার অতিক্রম করে, ভারতের ইতিহাস, প্রবেশ করল ১৮৫৭ সালের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে। চারিদিকে বিদ্রোহের চাপা গুঞ্জন উঠল। সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষের ঢেউ ফেটে পড়তে দেখা গেল। পরিণামে, বাংলার উনবিংশ পদাতিক বাহিনী, ১৮৫৭ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি, বিদ্রোহের ধ্বজা তুললো বহরমপুরে।

কিন্তু অচিরেই তারা হ'ল কঠোরভাবে দমিত।

১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ বাংলার দেশীয় পদাতিক বাহিনীর সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে, বিদ্রোহের ইঙ্গিত জানালেন রাইফেলের মুখে। পদাতিক বাহিনীতে তাঁর ক্রমিক সংখ্যা ছিল ১৪৪৬। স্থান—বারাকপুর, ২৪ পরগণা।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ধৃত হয়ে, সামরিক বিচারে, বন্দুকের গুলির মুখে দিল নিজেকে আহুতি। দিল বলিদান।

তবু বিদ্রোহের আগুন ছাইচাপা পড়ল না। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়লো দাবানলের ন্যায় ভারতের চারিদিকে।

মীরাট, কানপুর, এলাহাবাদ, দিল্লী—সর্বত্র সুরু হলো বিদ্রোহের অগ্নিলীলা। যুক্ত হল হিন্দু-মুসলমান।

ইংরেজদের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক-এর হ'ল ভূতলে শয়ন। আর আকাশে উড়ল, বিদ্রোহীদের বিজয়-নিশান।

* * * *

হঠাৎ প্রতিকূল হাওয়ায় ভারতীয় সৈন্যদের হতে লাগলো পরাজয়।

হতে লাগলো পশ্চাদপসরণ।

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে প্রতিহিংসাপরায়ণ ইংরেজ সৈন্য দুর্বৃত্তের ন্যায় চারিদিক থেকে ধাওয়া করে, সিপাহীসহ, শত শত নাগরিকদের মস্তক, করতে লাগলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

এক সঙ্গে জন্তুর মত বেঁধে নিয়ে, দলকে দল মানুষকে, উড়িয়ে দিতে লাগলো জ্বলন্ত কামানের গহ্বরে।

নির্বিচারে মানুষ হতে লাগলো নিহত।

আর তাদের মৃতদেহগুলি ঝুলিয়ে রাখা হল বৃক্ষের শাখে শাখে। পথের দু'ধারে !!

ভয় দেখাবার জন্য। শাসনকে কায়েম রাখার তাগিদে।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে ১৮৫৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর, ইংরেজরা পুনরায় দিল্লী অধিকার করলো। প্রাসাদ দখল করে নিলো। ভারতের শেষ মামুলি সম্রাট বাহাদুর শা জাফর পরিবারবর্গ সহ প্রাণভয়ে আশ্রয় নিলেন বাদশা হুমায়ুনের কবরে। হায়! সে কী দুর্দশা!

কিন্তু তথাপি রেহাই নেই!

অবশেষে সৈন্যাধ্যক্ষ হাড্‌সন সেখান থেকে তাদেরকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এলেন। লাইন করে দাঁড় করালেন দুই শাহজাদা আর বাহাদুর শা'র এক দৌহিত্রকে।

তারপর. গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো দু'জনকে, একসঙ্গে—ইংরেজ-বীর হাড্‌সনের আদেশে! বাদশা বাহাদুর শা'কে গুলি না করে, বিচারের প্রহসনের মধ্যে—ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সাহায্য করার অভিযোগে, করা হল নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত।

১৮৬২ সালের ৭ই নভেম্বর, বর্মাদেশের রেঙ্গুন-নির্বাসনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। রেহাই পেলেন চূড়ান্ত অপমানের হাত থেকে। পলে পলে মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ থেকে।

এই বিপ্লবে স্মরণীয় হয়ে রইলেন—

রাণী লক্ষ্মী বাঈ (ঝান্সী)

নানা সাহেব (পলায়িত)

তাঁতিয়া তোপী (১৮ এপ্রিল, ১৮৫৯ সালে ফাঁসিতে মৃত্যু) ও আরও অনেকে।

এই বিদ্রোহ-শেষে একদিকে শোনা গেল বিজয়ীর পৈশাচিক উল্লাস ; আর একদিকে দেখা গেল, পরাজিতের আবেগরুদ্ধ বেদনার সকরুণ দীর্ঘশ্বাস!

১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর, লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদে উপস্থিত থেকে পাঠ করলেন, ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক রাজকীয় ঘোষণা। ভারতের শাসনক্ষমতা, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী থেকে হস্তান্তরিত হ'ল, খোদ ইংলণ্ডের রাজমুকুটের অধীনে। যে স্বর্ণ-মুকুটের মাথায় একদিন শোভা পেত, ভারতের বহু লুণ্ঠিত অমূল্য হীরা-জহরৎ-পান্না-চুনীর দ্যুতির—সঙ্গে সাত রাজার ধন "কোহিনুর মণি"!

আহ্লাদে গদ গদ হয়ে রাজভক্ত প্রজার দল, উচ্চৈঃস্বরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মহিমা ঘোষণা ক'রে বলে উঠ্‌লো, "জয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয়"।

পরবর্তী কালে, তাঁকে স্মরণ করে গড়ে উঠ্‌লো ভারতবাসীর কষ্টার্জিত বহু অর্থব্যয়ে শ্বেতমর্মর-খচিত বহু মূল্যবান সৌধ!

তাই বলে পরাধীনতার হীনতা থেকে বাঁচবার চেষ্টায় বিরতি দেখা যায়নি। আর সেই বিরতি দেখা যায়নি বলেই, সেই থেকে, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে, অবশেষে বহুদিন পরে ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তি ঘটলো, ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্টের মধ্য রাত্রি শেষে।

আপসের সূত্রে সে স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িয়ে রইলো চরম সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির পরিণাম-স্বরূপ তীব্র বেদনাদায়ক বিশাল ভারতের দেহচ্ছেদ পর্ব!

* * * *

ইংরেজ রাজশক্তি পরাজয়ের মধ্যেও বিজয়ীর গর্বোন্নতশিরে বেঁচে রইলো, কূটবুদ্ধি "জন বুল"-এর অক্ষয় ভেদ-নীতির সাফল্যে!—

তবু এর জন্য দিতে হল অনেক স্বেদ, অনেক অশ্রু, অনেক রক্তবিন্দু! একাধিক উপায়ে শোষণকারী ইংরেজ শত্রুর সঙ্গে করতে হয়েছে লড়াই বিভিন্ন ময়দানে, চত্বরে, গৃহে, অলিন্দে, সহরে, কাননে, সাগরে। জলধির অতল সলিলে। পর্বতে। গুহায়। সাগর, মহাসাগর পেরিয়ে, দূর বিদেশের পথে-প্রান্তরে। এই যুদ্ধ, চলেছে দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। কেউবা হয়েছেন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। কেউবা করে গেছেন তাঁর শেষবিন্দু দিয়ে দেশসেবা—যবনিকার আড়াল থেকে।

কারুর হয়েছে কারাদণ্ড। কারুর হয়েছে অন্তরীণ। নির্বাসন। কেউ হারিয়েছে পুত্র। কেউ স্বামী। কারো গেছে ভাই। কারো গেছে বোন। কারো শ্রদ্ধেয় পিতা, কারো স্নেহময়ী মাতা, চিরতরে সরে গেছেন কাছ থেকে। কারুর গেছে বিষয়-আশয়-সম্পত্তি-ধন-দৌলত সবকিছু।

কেউ-বা পুলিশের গুলিতে হয়েছেন হত।

কেউ-বা লাঠির আঘাতে হয়েছেন নিষ্ঠুরভাবে আহত।

কেউ হয়েছেন পঙ্গু। কেউ হয়েছেন নির্জীব। সহায়-সম্বল হীন। সর্বস্বান্ত। উপহাসের পাত্র। ঘৃণিত। পুলিশের তাড়া

খেয়ে কেউ-বা সামান্য একটু আশ্রয়ের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন দোর থেকে দোরে। কেউ-বা দু'টি অন্নের জন্য, ক্ষুধায় অস্থির হয়ে, হেঁটে চলেছেন, দেশ থেকে দেশান্তরে। তারপর, একদিন সবার অলক্ষ্যে ঢলে পড়েছেন, কোন্ এক অজানা দেশের বন-বনান্তরে, তা' কে জানে!

কেউ.বা চুম্বন করেছেন ফাঁসির রজ্জু, প্রেমিকের আলিঙ্গনের মতো। কেউ-বা তাই দেখে শিউরে উঠেছেন আতঙ্কে। স্বীকার করেছেন অপরাধ। চেয়েছেন মার্জনা। হয়েছেন জাতির কলঙ্ক চিরতরে। যাঁরা সমাজ-সংস্কারক, যাঁরা দেশহিতৈষী, যাঁরা লেখক, যাঁরা কবি, যাঁরা গায়ক, যাঁরা অভিনেতা, যাঁরা নাট্যকার, যাঁরা গীতকার, এমনকি যাঁরা মাঠে চাষ করেন, ধান বোনেন, ধান কাটেন, কিংবা যাঁরা দিনমজুর, কারখানায় কাজ করেন, তাঁরাও গ্রহণ করেছেন এই দীর্ঘস্থায়ী পবিত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে, তাঁদের নিজ নিজ অংশ।

মাতৃজাতিও ছিলেন না এর বাইরে। ছিলেন না পেছিয়ে। প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে, হয়েছেন দুর্দিনের সাথী। বন্ধু। সহায়িকা।

এই দুস্তর সংগ্রাম এই পথ-পরিক্রমা, কখনো নিয়মতান্ত্রিকতার পথ বেয়ে চলেছে অতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল নির্ঝরিণীর মতো, কিংবা ফল্গু স্রোতের অলক্ষিত সুরঙ্গপথে।

কখনও চলেছে, সশস্ত্র পন্থার ভীম বেগে। ভয়াল মূর্তিতে। কখনও-বা চলেছে সহিষ্ণুতার অপূর্ব ভঙ্গীতে। সম্পূর্ণ নিরস্ত্রভাবে। কিন্তু এই ত্রি-ধারার লক্ষ্য ছিল এক এবং অভিন্ন। যেতে হবে সেই স্বাধীনতার পবিত্র সাগর-সঙ্গমে। সেই সার্থক পরিণতির নির্দিষ্ট স্থানে।

* * * *

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে রামমোহন রায় আবির্ভূত হলেন, ভারতের ভাবী নব জাগরণের স্থায়ী ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে।

সেই পথ অনুসরণ করে যাঁরা পরাধীনতার দহনে জ্বলে-পুড়ে

মরছিলেন, তাঁদের স্নমুখে এক ধরনের নূতন আশার আলো হল বিচ্ছুরিত যখন প্রকাশিত হল, দূরদর্শী সাহিত্যিক ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "আনন্দমঠ" উপন্যাস।

দেশ উদ্ধারের ব্রত উদ্‌যাপনে সবচাইতে বেশী কিসের প্রয়োজন সেকথা বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখ্‌ছেন সেই অভাবিত গ্রন্থ "আনন্দমঠে"—

"সেই অনন্ত শূন্য অরণ্যমাঝে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল :

আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল। তখন কে বলিবে যে অরণ্য মাঝে মনুষ্য শব্দ শুনা গিয়াছিল ? কিছু কাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধ মথিত করিয়া মনুষ্য কণ্ঠ ধ্বনিত হইল :

আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল।

তখন উত্তর হইল—

তোমার পণ কি ?

প্রত্যুত্তরে বলিল,

পণ আমার, জীবন সর্বস্ব।

প্রতিশব্দ হইল,

জীবন তুচ্ছ। সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।

আর কি আছে ? আর কি দিব ?

উত্তর হইল, "ভক্তি"।

তখন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। এই আনন্দমঠের সঙ্গে দেশ পেল আর একটি অনাস্বাদিত "মন্ত্র", ভারত জননীকে আহ্বান করার, স্মরণ করার, শাশ্বত গীতির সুমধুর ধ্বনি "বন্দেমাতরম্"-এর অমিয় মধুর বাণী— !!

* * *

এই "বন্দেমাতরম্" গান গাওয়া মানে, মাতৃভূমিকে বন্দনা করা। স্মরণ করা। আহ্বান করা।

কিন্তু যাঁকে বন্দনা করছি, স্মরণ করছি, আহ্বান করছি, তাঁর রূপ কি ?

সেই রূপের ব্যাখ্যা করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন ১৮৭২ সালের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায়।

"বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত, লোকসমাজে উপস্থাপিত করার দশ বছর আগে।

আত্মবিস্মৃত বাঙালী তথা সমগ্র ভারতের মোহনিদ্রা ভাঙ্গতে।

"কমলাকান্ত প্রসূতি" জননী জন্মভূমির ভাবীমূর্তি, দেশের সামনে উপস্থিত করে তিনি ব'লছেন ঃ—

"চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি।

এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্ত রত্নভূষিতা ;

এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা।

রত্নমণ্ডিতা দশভুজা।

দশ দিক্ দশদিকে প্রসারিত।

শত্রুমর্দিনী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী।

দক্ষিণে, লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী,

বামে, বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞান-মূর্তিময়ী,

সঙ্গে, বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ,

আমি সেই কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ প্রতিমা।"

"এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই।

এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি।"

* * *

ইতিমধ্যে বিলেতে, অরবিন্দ ঘোষ, আই, সি, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদেশী প্রভু ইংরেজের অধীনে চাকুরী করতে করলেন অস্বীকার।

ফিরে এলেন নিজদেশ, ভারতবর্ষে।

বরোদা-রাজার সাদর আহ্বানে, উপস্থিত হলেন বরোদা রাজ্যে। গ্রহণ করলেন, সেখানকার মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষের পদ।

তখন ১৮৯৩।

কিন্তু, এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে তিনি ধরে রাখতে পারলেন না। অস্থির হলেন স্বদেশ উদ্ধারের দুশ্চিন্তায়।

দিন যেতে লাগলো ব্যর্থতায়।

রজনী কাটলো অনিদ্রায়। দগ্ধ হতে লাগলেন অহর্নিশ। অবশেষে সুরু করলেন লিখতে।

প্রথমেই আঘাত করলেন, কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের নির্জীব কর্মপদ্ধতিকে।

যে কংগ্রেসের জন্ম হল, স্কচ দেশীয় নাগরিক ও ভারতের সিভিল সার্ভিসের প্রাক্তন সভ্য, এলেন অক্টাভিয়ান হিউমের উদ্যোগে।

ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডাফরিনের পৃষ্ঠপোষকতায়।

১৮৮৫ সালে!

বম্বেতে।

পুনার 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল অরবিন্দ ঘোষের প্রবন্ধ "নিউ ল্যাম্পস্ ফর ওল্ড", ৭ই আগষ্ট ১৮৯৩।

তিনি বললেন, "একজন অন্ধ যদি আরেকজন চক্ষুহীনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, তবে কি দুজনেই গর্তে পড়বে না?"

* * * * *

এই বরোদাতে থাকাকালে, অরবিন্দ ঘোষ পরিচিত হলেন মহারাষ্ট্রীয় চিৎপাবন ব্রাহ্মণ, লেলে-র সঙ্গে।

সেই সূত্রে তিলকের সঙ্গে যোগসূত্রের কাজ করছিলেন বাংলার যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইনি, "যতীন্দর উপাধ্যায়" নাম গ্রহণ করে, অরবিন্দের সাহায্যে বরোদা রাজ্যের সৈন্য বিভাগে হয়েছিলেন যুক্ত। পরে, বরোদা রাজার "দেহরক্ষী"-র পদও অধিকার করেছিলেন। এঁর পরবর্তী নামই, নিরালম্ব স্বামী

ক্রমে, অরবিন্দ ভারতের মুক্তিসন্ধানে উদ্‌গ্রীব হয়ে, সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনের দিকে হলেন আগ্রহশীল। হলেন, উদয়পুর রাজ্যের সম্ভ্রান্ত নাগরিক ঠাকুর সাহেব দ্বারা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত। প্রেরণ করলেন, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বঙ্গদেশে। গুপ্ত বৈপ্লবিক কার্যে। তখন ১৯০১। অরবিন্দ-ভ্রাতা বারীন এলেন ১৯০২-এ, বাংলাতে। এদিকে ১৮৯৬ সালে, জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত গাইলেন, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অসীম নিষ্ঠা দিয়ে। উপস্থিত সকলে অবাক-বিস্ময়ে এই অপূর্ব মাতৃবন্দনা গীতির দিকে রইলেন তাকিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে। অধিবেশনের স্থান ছিল : কলকাতার বিডন স্কোয়ার।

* * * *

তারও আগে, ১৮৯৩ সালে, স্বামী বিবেকানন্দ, আমেরিকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ধর্ম মহাসভায় হিন্দু ভারতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে লাভ করলেন বিশ্ববিজয়ীর অভূতপূর্ব সম্মান। স্বীকৃতি।

ফিরে এলেন, ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বদেশ, ভারতবর্ষে। উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানালেন, দেশবাসীর কাছে। বললেন, "ওঠো, জাগো। আর মোহনিদ্রায় কাল কাটিয়ো না।"

---

*টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভোলিউসনারীজ—উমা মুখোপাধ্যায় : পৃ. ১১।

*"আজ অরবিন্দ এই কথা স্বীকার করিবেন না যে, আমিই তাঁহাকে রাজনীতিতে আনয়ন করি।

"আমি তিলকের কাছে শুনিতাম আর তাহা অরবিন্দকে বলিতাম।" (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ১২৯ পৃঃ, ভারতের ২য় স্বাধীনতা সংগ্রাম—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

তারপর দেশের দুর্দশার কথা ভেবে "আমার সমর নীতি" ভাষণে, দেশপ্রেমিকের "সংজ্ঞা" নির্দেশ করতে গিয়ে বললেন, মাদ্রাজে :— সার্কাস প্যাভেলিয়নে

"তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে। কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ, অজ্ঞানের কৃষ্ণ মেঘ সমগ্র ভারত গগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এ সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ?

এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে? তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এ ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে?

এ ভাবনা কি তোমাদিগকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে?

দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নাম, যশ, স্ত্রী, পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ?

তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি?

যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও, তোমরা প্রথম সোপানে, স্বদেশ হিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।"

॥ মহারাষ্ট্র ॥

এদিকে ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বম্বেতে, হঠাৎ দেখা দিল ভয়াবহ "প্লেগ রোগ।"

এই রোগ নিবারণের অজুহাতে ইংরেজ রাজপুরুষগণ পুণা সহরে সৃষ্টি করিলেন এক সন্ত্রাসের রাজত্ব!

দলে দলে নাগরিকবৃন্দ হতে লাগলেন লাঞ্ছিত, বিব্রত, অপমানিত, প্রহৃত, কারাগারে দণ্ডিত।

মন্দির, মসজিদ হল কলুষিত। পুরনারীগণের সম্ভ্রম, ইজ্জত হ'ল অবহেলে ধূলায় লুণ্ঠিত। এই সন্ত্রাসের রাজা হলেন পুনার প্লেগ কমিশনার মিঃ র‍্যাণ্ড।

এই নিরবচ্ছিন্ন অন্যায়, অত্যাচার আর মৃত্যু-তুল্য অপমানের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে লেখনী ধারণ করলেন মহারাষ্ট্র-বীর, বাল গঙ্গাধর তিলক। অবলম্বন—

পত্রিকা "কেশরী।"

তারপর, শিবাজী উৎসব পালন উপলক্ষে আয়োজিত এক জন-সভায়, জ্বালাময়ী ভাষণে দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন, এর প্রতিকার করতে। সেদিন ১২ই জুন, ১৮৯৭।

তিলকের ক্ষুরধার লেখনী ও দীপ্ত ভাষণ ব্যর্থ হল না। জাগরিত হ'ল, মহারাষ্ট্র গৌরব, মহারাষ্ট্র যুব-সমাজ! ফলে, ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন তারিখে জুবিলী উৎসবের মধ্য রাত্রিতে অত্যাচারী ইংরেজ প্লেগ কমিশনার মিঃ র‍্যাণ্ড, আততায়ীর হস্তে রিভলবারের গুলিতে হলেন মারাত্মকভাবে আহত।

সাথী লেফটেনাণ্ট আয়ার্ষ্ট সেই দিন, সেই স্থানে, রিভলবারের গুলিতে হলেন নিহত।

আহত মিঃ র‍্যাণ্ড প্রাণ হারালেন ৩রা জুলাই, ১৮৯৭। এই মৃত্যুতে সারা মহারাষ্ট্রে এক চাপা আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। জনগণের নীরব অভিনন্দনে তৃপ্ত হল র‍্যাণ্ড-হত্যাকারিগণ। ওদিকে পুলিশও বসে থাকল না। ধরা পড়তে লাগলো যুবকরা। সন্দেহে কিংবা অন্য কোন সূত্রে। একের পর এক। বিভিন্ন স্থানে। বিভিন্ন তারিখে।

প্লেগ কমিশনার মিঃ র‍্যাণ্ড হত্যার দায়ে ভারতরত্ন দামোদরহরি চাপেকার ধৃত হয়ে বিচারের নামে প্রহসনের মধ্যে ১৮৯৮ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে ফাঁসির রজ্জুতে আত্মবলিদান করে হলেন চিরস্মরণীয়। স্থান: যারবেদা কারাগারের নিষ্ঠুর পটভূমিকা। ভ্রাতা, ওয়াসদেও হরি চাপেকার, ফাঁসির রজ্জু চুম্বন ক'রে হলেন বরণীয়, গুপ্তচর 'ডেভিড-ব্রাদার্স'-কে হত্যার অপরাধে (৮ই মে, ১৮৯৯)। স্থান: যারবেদা কারাগারের আবেষ্টনী।

ঐতিহাসিক অত্যাচারী মিঃ র‍্যাণ্ডের সহচর ও দুষ্কর্মের সাথী,

মিঃ আয়ার্ষ্টকে হত্যা করার অপরাধে, মহাদেব রানাডে, যারবেদা কারাগারের ভয়াবহ ফাঁসির মঞ্চে হাসতে হাসতে আত্মদান করে লাভ করলেন এক নূতন জীবন। পেলেন শহীদের সম্মান।

সেদিন ছিল ১০ই মে, ১৮৯৯।

এরপর—

বালকৃষ্ণহরি চাপেকার, মহারাষ্ট্রের অমর আত্মদানীদের পথ অনুসরণ করলেন। অভিযোগ ?

মিঃ র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টকে হত্যা। ফাঁসির তারিখ ১২ই মে, ১৮৯৯।

স্থান ঃ যারবেদা কারাগারের সেই কুৎসিতদর্শন ভীষণ ফাঁসির মঞ্চ।

এমনি ক'রে একে একে শেষ হয়ে গেল, মহারাষ্ট্রের চারটি অমূল্য জীবন।*১

এদিকে ১৮৯৭ সালের ১২ই জুন তারিখের রাজদ্রোহকর ভাষণের দায়ে অভিযুক্ত হলেন বালগঙ্গাধর তিলক। আদালতে তিলককে সমর্থন করতে বাংলা থেকে প্রেরিত হলেন ব্যারিষ্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ইংরেজ রাজপুরুষ বদ্ধ-পরিকর হ'ল তিলককে দণ্ড দিতে।

ফলে তিনি ১৮ মাস কারাদণ্ডে হলেন দণ্ডিত।

* * *

তিলকের প্রতি এই অবিচারে সারা দেশ দুঃখে, ক্ষোভে হ'ল অভিভূত। উদ্ভব হল "মিত্র-মেলা" নামে এক গুপ্ত বৈপ্লবিক সংস্থা।*২ তখন ১৮৯৯।

এই "মিত্র-মেলা" রূপান্তরিত হয় "অভিনব ভারত" নামে। তখন ১৮৯৯। উদ্দেশ্য সশস্ত্র পন্থায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জন।

---

১ *Roll of Honour—রোল অব অনার। কে, সি, ঘোষ। পৃঃ— ৪২

২ *"মিত্র-মেলা" জন্মলাভ করে ১৯০০ সনে, (মিলিটেণ্ট ন্যাশনালাইজম ইন্ ইণ্ডিয়া,) বিমানবিহারী মজুমদার

॥ বাংলা ॥

বাংলাদেশে এ সময় যে বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা চলতে থাকে তার পরিণতি সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলছেন : তাঁর "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুস্তকের ১০০ পৃষ্ঠায়।

"গুপ্তবৈপ্লবিক সমিতি" ॥ বাংলা ॥

১৯০১ খৃঃ কাছাকাছি সময়ে বাংলার গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতি সংস্থাপিত হয়।

এই সমিতির সভাপতি হন : ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র।

সহকারী সভাপতিদ্বয় ছিলেন : অরবিন্দ ঘোষ এবং ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। কোষাধ্যক্ষ হন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছাত্রদের পরিচালক ও ব্যায়ামাগারের অধ্যক্ষ হন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।......

যতীনবাবু আপার সার্কুলার রোডস্থিত ব্যায়ামের আখড়া এবং কর্মীদের থাকিবার বাড়ীর অধ্যক্ষ ছিলেন। ঐস্থানটি তথাকার পুলিশ ফাঁড়ির সন্নিকট এবং গড়পারের অপর দিকে অবস্থিত ছিল।

এই বাড়ীতে সস্ত্রীক যতীনবাবু, অবিনাশ ভট্টাচার্য, বারীন ঘোষ প্রভৃতি তরুণ কর্মীরা থাকিতেন।

এইস্থানে প্রমথনাথ মিত্র এবং ব্যারিষ্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, জ্যোতিষচন্দ্র সমাজপতি, দেবব্রত বসু, জেনারেল এসেম্বলীর (কলেজ) অধ্যাপক নলিনী মিত্র, ভবিষ্যতের অনুশীলন সমিতির স্থাপয়িতা সতীশচন্দ্র বসু, আত্মোন্নতি সমিতির তরুণ সভ্যবৃন্দেরা আসিতেন।

প্রথম যুগের আর একটি বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন অধ্যাপক শ্রীশ সেন। তাঁহার বন্ধু সাহিত্যিক অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও দলের একজন সভ্য ছিলেন"।

সতীশবাবু "তাঁহার বিবৃতিতে যে পুরান অনুশীলন সমিতির কথা বলিয়াছেন, তাহা কৃষ্টি, নৈতিক উন্নতি ও সমাজ সেবা কর্মে নিযুক্ত ছিল। তাহা কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিলনা"।

(ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পৃঃ ১১৭)

এরপর, ১৯০২ এর ২৪শে মার্চ ১০ই চৈত্র ১৩০৮ বঙ্গাব্দে, দোল পূর্ণিমার দিন, সতীশচন্দ্র বসু স্থাপন করেন অনুশীলন সমিতি।

ক্রমে অরবিন্দ ঘোষ, প্রমথ নাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাশ, ভগিনী নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ স্বদেশহিতৈষী নেতৃবৃন্দ, অনুশীলন সমিতির সংশ্রবে আসেন।

(অনুশীলন সমিতির ইতিহাস, জীবনতারা হালদার)

এমনি করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূলে চলতে থাকে গুপ্ত বিপ্লবী প্রচেষ্টার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

* * *

বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্পৃহাকে খর্ব করতে ভারতের রাজ-প্রতিনিধি দুর্জন লর্ড কার্জন, বাংলাদেশকে দু'ভাগ করার সিদ্ধান্ত জানান। তখন ১৯০৩।

প্রতিবাদে সুরু হল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন"। বঙ্গভঙ্গ রোধে কৃতসংকল্প বাংলা ফেটে পড়লো আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিলেন নেতৃত্ব। পরিভ্রমণ করলেন চট্টগ্রাম থেকে পঞ্জাব।

তথাপি, ১৯০৫-এ বঙ্গদেশ হল দ্বিধা-বিভক্ত। সে ঘোর দুর্দিনের তারিখ হল ১৬ই অক্টোবর। পূর্ববঙ্গের ঢাকা সহরে স্থাপিত হল, নব-বঙ্গের রাজধানী।

* * * *

১৯০৬-এ অরবিন্দ ঘোষ বরোদা রাজ্যের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন দেশের কাজে।

এই ১৯০৬ সাল-এর ১৮ মার্চ, "যুগান্তর" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা করলো কলকাতায় প্রথম আত্মপ্রকাশ।

স্বামী বিবেকানন্দ-ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হলেন সম্পাদক। এই "যুগান্তর পত্রিকা" দেশের স্বাধীনতার জন্য, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে অগ্রসর হতে দেশবাসীকে দিতে থাকলো অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত।

"যুগান্তর"

আর এ সময় পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতির সঙ্গে কর্মপন্থা নিয়ে সভ্যদের মধ্যে নীতিগতভাবে দেখা দিল মতভেদ। ফলে, ব্যারিষ্টার পি, মিত্র মহাশয়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও "যুগান্তর" পত্রিকা-গোষ্ঠীর সঙ্গে কার্যত করলেন সম্পর্ক চ্ছেদ। এবং "বারীন্দ্র-বাবুর দল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, বোমা তৈয়ার ও হিংসাত্মক কাজে মনোনিবেশ করেন"। (জেলে ত্রিশ বছর. ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী)।

'বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ ঘোষের পবিচালনাধীন এই বিপ্লবী সংস্থার, আটটি আলাদা কর্মবিভাগ ছিল বলে জানা যায়।

যেমন "টিচার" অর্থাৎ যাঁরা বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করবেন, দর্শন শেখাবেন। "প্রিচার", অর্থাৎ যাঁরা বিপ্লবের কথা সংগোপনে ও সুকৌশলে প্রচার করবেন। "হিরো"—অর্থাৎ যারা অসম সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হবেন, বৈপ্লবিককার্যে নিজেকে বলিদান করতে।

"সাইন্টিস্ট" অর্থাৎ যাঁরা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করবেন। "মিশনারী" অর্থাৎ যাঁরা সন্ন্যাসীর ন্যায় নিরাসক্ত হয়ে তাঁর কর্তব্য কার্য করে যাবেন!

"কমিউনিকেটর" যাঁবা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বিশ্বস্তভাবে সংবাদ আদান-প্রদান করবেন।

"আর্নার" যারা বৈপ্লবিক কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ কিংবা উপার্জন করবেন। "লিটারি" যাঁরা, সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা রচনা করবেন।

"পাঞ্জাব"

এদিকে ১৯০৭ সাল এলো এগিয়ে। পরিণামে—

পাঞ্জাবের সর্দার অজিৎ সিং ও লালা লাজপত রায় হলেন সুদূর বার্মাদেশের "মান্দালয়ে" নির্বাসিত। সেদিন ৭ই মার্চ। এই ১৯০৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করলেন ভগৎ সিং। পঞ্জাবের লায়ালপুর জেলাতে। পঞ্জাবকেশরী লালাজীর এই নির্বাসনদণ্ডে ব্যথিত হয়ে, বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ অরবিন্দ ঘোষ, "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় ১১ই মে (১৯০৭) তাবিখে লিখলেন ঃ

"বক্তৃতা আর সুন্দর লিখনের দিন ফুরিয়ে গেছে। আমলাতন্ত্র যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছে। আর, আমরা তা' গ্রহণ করলুম"।

সুরু হল বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টা। এই প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে দু'দুবার চন্দননগরে (১৯০৭ সাল) ছোট লাট এণ্ড্ ফ্রেজারের গাড়ী উড়িয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা হল। আবার নেতার ইঙ্গিতে, মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ের রেল লাইনে বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের প্রস্তুত টাইম বোমা রাখা হল, ছোট লাট এণ্ড্ ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেন উড়িয়ে দিতে। ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর, সে বোমা ফাটলো বটে, কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে নয়। ১৯০৮এ, বিপ্লবী প্রফুল্ল চক্রবর্তী, উল্লাসকরের প্রস্তুত বোমার শক্তি ও কার্যকারিতা পরীক্ষা করলেন দেওঘর-এর দিঘারিয়া পাহাড়ের নির্জন পরিবেশে। সেদিন, উল্লাসকর আরও সতীর্থ-সহ নিজে ছিলেন উপস্থিত। উল্লাসকরের নিষেধাজ্ঞা না শুনে, অসতর্ক ভাবে বোমা ছুঁড়তে গিয়ে নিহত হলেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী। সে খবর, পাহাড়ের কঠিন পাথরের তলায় রইলো চাপা পড়ে।

১৯০৭-এ, মনীন্দ্র লাহিড়ীকে সঙ্গে নিয়ে নেতা অরবিন্দের ভ্রাতা স্বয়ং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ছোট লাট ফুলারের পেছনে পেছনে

ছুটলেন আসাম পর্যন্ত। কোমরে রইলো যমসদৃশ রিভলবার। কিন্তু ব্যর্থ হল অভিযান।

ইতিমধ্যে "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় এক জ্বালাময়ী প্রবন্ধের জন্য অরবিন্দ হলেন গ্রেপ্তার। রুজু হল মামলা। "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পালকে সরকার মানলেন সাক্ষী। বিপিনচন্দ্র দিলেন না সাক্ষী অরবিন্দের বিরুদ্ধে। সাক্ষী না দেবার কারণ সম্পর্কে নবশক্তিতে লিখলেন (১৯০৭, আগষ্ট)। গোলদিঘীর সভাতে এবং মকদ্দমার শেষ শুনানীর আগে বল্লেন ঃ

"কেন সাক্ষী দিলাম না"

"বন্দেমাতরম্ আমার মানস-পুত্র। ইংরেজ সরকার এমনি দয়ালু যে, আমায় বলছেন আমার পুত্রের বুকে নিজের হাতে ছুরি বসিয়ে দিতে। আমি তা কেমন করে পারি ? না পারার ফল ভোগ করতে হবে, সে ভোগ স্বেচ্ছায় কারাবরণ। তাতে কি ?

•প্রভু যীশু একদিন এমনি করে বিদেশী আদালতের সামনে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

তাঁকে কণ্টকের মুকুট পরিধান করতে হয়েছিল।

সাধারণ দস্যুদের সঙ্গে একত্রে "ক্রুশে" প্রাণ দিতে হয়েছিল।

বিদেশী রাজশক্তির জিঘাংসা চরিতার্থ হয়েছিল বটে। কিন্তু সত্যের জন্য তিনি লাঞ্ছিত, অপমানিত, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন —তাঁকে কি ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পেরেছে ?

আমারও তাই কাঁটার মুকুট পরতে হবে।

তোমাদের কাছ ছাড়া হয়ে যেতে হবে।

কিন্তু এও ঠিক রাতের আঁধারের পর যেমন অরুণোদয় হয় তেমনি ভারতের স্বাদেশিকতা, অপমান, লাঞ্ছনা ও নির্যাতনে, শক্তিশালী ও আয়ুষ্মান হবে।

তোমার, আমার, সবার, স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন সত্য হবে। বন্দেমাতরম্"।

—বিপিনচন্দ্র

সাক্ষীর কাঠগড়ায় উপস্থিত হয়ে সাক্ষী না দেবার জন্য আদালত অবমাননার দায়ে হলেন অভিযুক্ত বিপিনচন্দ্র। বিচারক মিঃ কিংসফোর্ড দ্বারা হলেন ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। আর, মুদ্রাকর অপূর্বকৃষ্ণ বসুর হল ছয়মাস কারাদণ্ড!

অপরদিকে, অরবিন্দ পেলেন মুক্তি। সেদিন ২৬শে আগষ্ট ১৯০৭।

এই বিচারের দিনে বিচারশালায় উপস্থিত হলেন বহুজনতা। হাকিমের নির্দেশে এদেরকে আদালত থেকে হটিয়ে দেবার অজুহাতে সার্জেণ্ট "হিউ" চালালেন নির্বিচার-এ লাঠি। কিশোর সুশীল সেন প্রতিবাদ জানিয়ে হলেন প্রহৃত। তবু তিনি অসম সাহসে ভীমদর্শন সার্জেণ্টকে প্রতিআক্রমণ করলেন ঘুষি দিয়ে। জনতা জানাল বিপুল হর্ষ-ধ্বনি। বিচারক মিঃ কিংসফোর্ড, এই নির্বোধ ও দুর্বিনীত বালককে জন্মের মত শিক্ষা দেবার জন্য প্রদান করলেন ১৫ ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ!

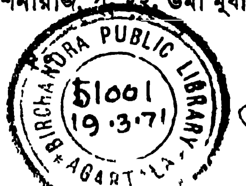
ইংরেজ বিচারক মিঃ কিংসফোর্ডের এই স্পর্ধায়, এই অবিচারে, এই প্রতিহিংসায়, জ্বলে উঠলো বাংলার "যুগান্তর" পত্রিকা-গোষ্ঠী আর তার বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ ঘোষ।

তাঁদের গুপ্ত বিচারালয়ের বিচারে, বিচারপতি মিঃ কিংস-ফোর্ডের প্রতি দেওয়া হল "মৃত্যু দণ্ডাদেশ"।

১৯০৮ সালের জানুয়ারির কাছাকাছি সময়ে বইয়ের ভেতর পুরে "টাইম বোমা" পাঠান হল কিংসফোর্ডের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তিনি সে বই নাড়া-চাড়া করার অবকাশ পেলেন না। ব্যর্থ হল পরিকল্পনা।*

ইতিমধ্যে কিংসফোর্ড বিহার প্রদেশের মজঃফরপুরে বদলি হয়েছেন। সেখানে গেল বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী আর তাঁর বিপ্লবী

*টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভলিউশনারীজ, পৃঃ ২২, উমা মুখার্জী



সাথী ক্ষুদিরাম বসু নেতার নির্দেশে। সঙ্গে রইলো রিভলবার আর তাজা বোমা। এবারে হেমচন্দ্র দাসের তৈরী।

যে করেই হ'ক কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে হবে। ১৯০৮এর ৩০শে এপ্রিল তারিখে রাত্রির অন্ধকারে মজঃফরপুর সহরে কিংসফোর্ডের গাড়ীর মত একটি ঘোড়ার গাড়ী কিংসফোর্ডের কুঠির দিকে অগ্রসর হতে দেখা গেল।

মুহূর্তে বিপ্লবীদ্বয় প্রস্তুত হলেন। ক্ষিপ্রহস্তে নিক্ষিপ্ত বোমা, সশব্দে বিদীর্ণ হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিংসফোর্ড সে ঘোড়ার (পাল্কি) গাড়ীতে না থাকায়, নিহত হলেন, অপর দুই আরোহী ঃ মিসেস ও মিস কেনেডি। পরদিন ১লা মে তারিখে (১৯০৮) প্রফুল্ল চাকী পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে রিভলবারের গুলিতে করলেন আত্মহত্যা, সমস্তিপুর রেল স্টেশনে। (B. and N. W. Rly.)

ক্ষুদিরাম বসু ধরা পড়ে—ফাঁসির দড়ি চুম্বন করলেন ১১ই আগষ্ট ১৯০৮, মজঃফরপুর কারাগারে।

বিপ্লবীদের এই দুঃসাহসিক কার্যে উৎসাহিত হয়ে, আনন্দিত হয়ে, বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর "কেশরী" পত্রিকার ২৬ শে মে, ১৯০৮ তারিখে লিখলেন ঃ মজ.ফরপুর বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে ঃ—

"এই বোমা বিস্ফোরণের ফলে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং বিলেতের জনসাধারণের মধ্যে যে অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তা' বিগত ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর আর দেখা যায়নি !

এর কাছে ১৮৯৭-সালের জুবিলী হত্যাকাণ্ড, লালা লাজপত রায়ের নির্বাসন দণ্ড, কিংবা 'শিখ ছাউনীতে তাদেরকে বিদ্রোহী করার চেষ্টাকালীন উদ্বিগ্নতা পর্যন্ত নিষ্প্রভ বলে মনে হচ্ছে !!"

এরূপ, পর পর তিনটি চমৎকার প্রবন্ধের মধ্যে, ইংরেজ সরকার, রাজদ্রোহের গন্ধ পেলেন।

সুতরাং তাঁরা তিলকের বিরুদ্ধে বিচারে করলেন না বিলম্ব। ১৩ই জুলাই তারিখে হলেন গ্রেপ্তার। ১৯০৮ এর ২২শে জুলাই তারিখে দণ্ডিত হলেন তিলক, সুদীর্ঘ ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে। তখন তাঁর বয়স ৫৮ বৎসর।

গম্ভীর কণ্ঠে আদালতের বিচারক বললেন,

"১২৪এ ধারা অনুসারে আমি দ্বীপান্তর কিংবা তার কম সাজা দেবার ক্ষমতা রাখি।

সুতরাং আমি প্রথম দুই অভিযোগের প্রত্যেকটির জন্য ৩ বৎসর করে দ্বীপান্তরের আদেশ দিচ্ছি।

(এই সঙ্গে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘট্‌লো। ১৮৯৭ সালে, রাজদ্রোহকর ভাষণের জন্য তিলকের ১৮ মাস সাজা দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেই শাস্তিভোগের সময় নির্ধারিত ১৮ মাস সাজার ৬ মাস পূর্বেই ছাড়া পেয়ে যান)।

এবার তাঁকে এই ৬ বৎসর থাকার সঙ্গে, সেই পুরনো ৬ মাসের সাজা ভোগ করতে বাধ্য করা হল। এমন অভিনব বিচারপদ্ধতির কোন জুড়ি পৃথিবীতে কোথাও আছে কিনা তা আমার জানা নেই।

"ভ্যালেণ্টাইন চিরোল," যাঁকে বলেছেন, "ফাদার অব ইনডিয়ান আনরেষ্ট", আদালতে সেদিন সেই তিলক বললেন :—

"মানুষ ও জাতির ভাগ্য উচ্চতর শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

আমার মনে হয় যে, আমার লেখনী ও জিহ্বা দ্বারা নয়। এবার নির্যাতনের মধ্যেই আমাব আরব্ধ ব্রত অধিকতর ফলপ্রসূ হবে বলে সর্বনিয়ন্তা স্থির কবে রেখেছেন।"

তিলক পুরো ছয় বছর সম্পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগ করে ছাড়া পেলেন ভগ্ন স্বাস্থ্যে, ১৭ই জুন ১৯১৪। এই দণ্ড ভোগকালে না হল তাঁর একদিনের দণ্ডহ্রাস। না হয়েছিল, কঠোর শ্রমের বিন্দু মাত্র লাঘব।

এই তিলক সম্পর্কে অরবিন্দ বলেছেন :—

"যতদিন পর্যন্ত দেশের লোকের মনে অতীতের প্রতি বিন্দুমাত্র

শ্রদ্ধা এবং ভবিষ্যতের প্রতি এতটুকু আশা বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত, এই বালগঙ্গাধর তিলকের কথা অসীম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ যোগ্য হবে।"

এদিকে মজঃফরপুর বোমা বিস্ফোরণের সূত্রে নেতা অরবিন্দ ঘোষ, সদলবলে হলেন ধৃত।

তখন ২রা মে, ১৯০৮।

সুরু হল দীর্ঘস্থায়ী মামলা।

৩৮ জন বিপ্লবী, বিচারের জন্য হল অভিযুক্ত।

মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে, আলিপুর জেলের মধ্যে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করলেন, বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

সেই অপরাধে ১৯০৮-এর ১০ই নভেম্বর বিপ্লবী কানাই ফাঁসির দড়ি গলায় পরলেন! হাসতে হাসতে।

বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ ২১-এ নভেম্বর ১৯০৮-এ আত্মবিসর্জন করলেন, ফাঁসিমঞ্চে 'বন্দেমাতরম্' বলে, নির্ভয় নিশ্চিন্তে।

এমনি করে একে একে নির্ভীক চিত্তে বাংলার বীর সন্তানগণ মৃত্যুকে তুচ্ছ করে নিঃশেষ আত্মবিলুপ্তির মাঝে আয়ত্ত করলো মৃত্যুর পরপারে যে অমর জীবন রয়েছে, তাকে। ওদিকে আলিপুর বোমার মামলার রায় বেরুল ৬ই মে ১৯০৯।

দুজনের হল ফাঁসির হুকুম।

১৭ জনেরও বেশী—হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিংবা বিভিন্ন দণ্ড।

অবশিষ্ট ১৭ জনের হল মুক্তি।

মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন একজন। আর ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার গুপ্ত, শচীন্দ্রকুমার সেন, কুঞ্জলাল সাহা, বিজয়কুমার নাগ, পূর্ণচন্দ্র সেন, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, দীনদয়াল বসু, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ধরণীনাথ গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমচন্দ্র সেন, দেবব্রত বসু, নিখিলেশ্বর রায়, বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রভাসচন্দ্র দেব।

*　　　*　　　*

এই অরবিন্দ যখন "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় যোগ দিয়েছিলেন তখন 'সন্ধ্যা" পত্রিকা-সম্পাদক বৈদান্তিক, সর্বস্বত্যাগী আজীবন স্বদেশ প্রেমিক, ঈশ্বর-পন্থী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখেছিলেন ঃ—

"অমলশুভ্র অরবিন্দ দেখিয়াছ কি ?"

ভারত মানস সরোবরের প্রস্ফুটিত শতদল।

এ ফিরিঙ্গির আদাড়ে বাদাড়ের লিলি ড্যাফোডিল নহে! নির্গন্ধ! শুধু রঙ্গের বাহার। কেবল বর্ণ বিন্যাস, দেবতার পূজায় লাগে না। বঙ্গ-যজ্ঞে অনাবশ্যক। শুধু সাহেব বিবির সাহেবিয়ানার আড়ম্বর। আমাদের এই অরবিন্দ জগৎ-দুর্লভ।

হিম শুভ্রবর্ণে স্বাত্বিকতার দিব্যশ্রী। বৃহৎ ও মহৎ। হৃদয়ের-প্রসারতায় বৃহৎ হিন্দুর স্বধর্ম মহিমায় মহৎ। এমন একটা গোটা ও খাঁটি মানুষ, এমন বজ্রের মত বহ্নিগর্ভ, আবার কমল পর্ণের ন্যায় কান্ত পেলব, এ হেন জ্ঞানাঢ্য, এমন ধ্যানসমাহিত মানুষ, তোমরা ত্রিভুবনে খুঁজিয়া পাইবে না।

দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য ইনি ফিরিঙ্গি সভ্যতার মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া ইহলোকের সুখসাধ বিসর্জন দিয়া, মায়ের ছেলে অরবিন্দ "বন্দেমাতরম্" পত্রের সম্পাদনায় ব্রতী হইয়াছেন। ইনি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভবানন্দ, জীবানন্দ, বীরানন্দ স্বামী।"

ওদিকে আলিপুর বোমার মামলার আপিলে উল্লাসকর দত্ত এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষের ফাঁসির দণ্ড হ্রাস পেয়ে হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

কালক্রমে, অন্যান্যদের দণ্ডও অল্প-বিস্তর হ্রাস পেলো। যে দলের মুখ্য নেতা বলে অরবিন্দ ছিলেন চিহ্নিত হয়ে, সেই "যুগান্তর" দল সম্পর্কে আড়বেলের অবিনাশ ভট্টাচার্য (যিনি "যুগান্তর" পত্রিকার দেখাশুনা করতেন এবং আলীপুর বোমার মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে হয়েছিলেন দণ্ডিত, কারাদণ্ড হ্রাস পেয়ে পরে সাত বৎসর কারাদণ্ড হয়) বলেছেন, "গোড়া হইতেই

শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে আপার সার্কুলার রোডে প্রথম গোপন বিপ্লবী সংস্থা স্থাপিত হয়। আমরা জানিতাম যে, আমাদের নেতা শ্রীঅরবিন্দ—। কিন্তু সর্বসাধারণ্যে শ্রীঅরবিন্দের নাম প্রকাশ না করিতে সর্বপ্রযত্নে সচেষ্ট থাকি। তাঁহারই অনুজ্ঞায় ১৯০৬ সালে আমরা আমাদের মুখপাত্র "যুগান্তর" পত্রিকা প্রকাশ করি এবং প্রকাশ্যতঃ উহারই মাধ্যমে জনসাধারণকে বৈপ্লবিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করিতে যত্নবান হই। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়াই যুগান্তর গুপ্ত বিপ্লবী গোষ্ঠী বা যুগান্তর দল গড়িয়া উঠে। সর্বসাধারণ, যুগান্তর বিপ্লবী দলকে জানিত এবং চিহ্নিতও করিত।

আমরা আমাদের নেতা শ্রীঅরবিন্দের নাম বা সংশ্রবকে গোপন রাখিবার প্রয়াসে পরস্পরের নিকট পরস্পরের পরিচয় 'যুগান্তর' হিসাবেই দিতাম।

এইভাবে আমাদের বাহিরের পরিচয় হিসাবে যুগান্তর নামটা ব্যবহার হইতে থাকে।"

স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা, "যুগান্তর" পত্রিকার প্রথম সম্পাদক (ডক্টর) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুস্তকের ১১৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন।

"আলিপুর মকদ্দমার পর বৈপ্লবিক পার্টির অখণ্ডতা ভঙ্গ হইয়া উত্তরবঙ্গ পার্টি, পূর্ববঙ্গের অনুশীলন এবং পশ্চিমবঙ্গ বা যুগান্তর পার্টির উদ্ভব হয়।"

এই "যুগান্তর" ও "অনুশীলন" বিপ্লবী-গোষ্ঠী সম্পর্কে বাংলার প্রদেশপাল মিঃ কেসী—রাজপ্রতিনিধি মিঃ ওয়াভেলকে যে গোপন লিপি পাঠান তার সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল ("স্বাধীনতা" পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা বাং ১৩৫৪।১৯৪৭ ইং পৃঃ ৪১-৪২ ঃ)

"বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও আরও জন কয়ে মিলিত হইয়া "যুগান্তর" পত্রিকা প্রকাশ করেন। গুপ্তসমিতি গঠন করিয়া হিন্দু যুবকদের আধুনিক মারণাস্ত্র তৈরী ও ব্যবহার শেখাতে থাকেন। তাঁরা প্রচার করিতে লাগিলেন—বৃটিশ এদেশ শাসন করছে,

ছল আর বলের সাহায্যে এবং তাদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে।

এই যুগান্তর দল ভয়ঙ্কর শক্তিশালী সংগঠনশীল সমিতিতে পরিণত হয়। বাংলার অন্যান্য বিপ্লবীদলগুলির মধ্যে এরূপ বাছা বাছা তীক্ষ্ণধী যুবক দেখা যায় না।

এই দলের মধ্যে-ই ছিলেন বৃটেনের সত্যকার দুর্জয় শত্রু।"

(২)

"এছাড়াও দল আছে। উহাদের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতিও অনুরূপ। এদের মধ্যে অনুশীলন সমিতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের প্রধান ঘাঁটি ঢাকায় এবং এই সমিতি প্রদেশের সবচেয়ে বিপজ্জনক সংগঠন। ইহাদের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। এদের সভ্যও অনেক। বিভিন্ন প্রদেশে এদের শাখা-প্রশাখা আছে। এই দলের বহু সভ্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন।

তাছাড়া—বিশেষ আইনের বলে এদের অনেককে আটক করে রাখা হয়েছিল।"

* * * *

একদিন এই "যুগান্তর" দলকে ভেঙ্গে দিলেন "যুগান্তর"-এর মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত সর্বশ্রী অরুণচন্দ্র গুহ, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত-এর বন্ধুবর্গ। পরে, ওরা মোহনচাঁদ গান্ধীকে লিখলেন, দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে, ১৭ই জানুয়ারি ১৯৪৬:

মহাত্মাজী—

এক প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে যুগান্তর পার্টিকে আমরা ভেঙ্গে দিয়েছিলাম। অতঃপর বিনাসর্তে আমরা কংগ্রেসে যোগ দিই···

আন্তরিকভাবে:

আপনার—

॥ দেশ, ১০ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ ॥ অরুণচন্দ্র গুহ

পৃঃ ৩৫০ ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও বন্ধুবর্গ।

এ'ভাবে, কোন একটি মহান ঐতিহ্যপূর্ণ গুপ্ত সমিতিকে ভেঙ্গে দেবার অধিকার কিংবা ক্ষমতা আছে কিনা, এ নিয়ে প্রশ্ন হল। দলের ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, দুঃখিত ও অপমানিত গোষ্ঠীর প্রতিবাদের ফলে যুগান্তর দলের প্রধানতম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি—ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় জানালেন :

"হ্যাঁ, যুগান্তর উঠিয়ে দেওয়ার কৈফিয়ত তলব করেছেন আমার কয়েকটি ভাই।

যে একটা সামরিক যন্ত্র বা কাঠামো নিয়ে যুগান্তরী আত্মা বা বিপ্লব-শক্তি দাঁড়িয়েছিল—কালের প্রভাবে জীর্ণ সে কাঠামো আজ আর নেই।

মাত্র সেইটুকু বদ্‌লানো হয়েছে।

যুগান্তর যে একটা আত্মিক শক্তি।

যুগ পালটে দেবার ঐচ্ছিক সামর্থ্য কি কোনদিন মরে বা নষ্ট হয় ?

তাকে উড়িয়ে দেবার কল্পনা কোন্ পাগল করবে ?

অগ্নিযুগের যুগান্তর পড়ে যে বিপ্লবী ভাবধারা দেশে শত শত জন পেয়েছিল, প্রকৃত যুগান্তর না আসা পর্যন্ত সে চিৎশক্তি কোথায় অদৃশ্য হবে ?

যা স্বল্পের মধ্যে ছিল তা আজ বহু ব্যাপক হয়ে পড়েছে। যুগান্তরী কাঠামো বদলে যায়—কিন্তু তার প্রেরণা শক্তি ঠিক বজায় থাকে।

যুগান্তর চেয়েছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও মুক্তি।

যেদিন তার সে ব্রত সাঙ্গ হবে সেদিন না নিরঞ্জনের অবকাশ ?

বিপ্লবের জয় হোক। যুগান্তর সাফল্যমণ্ডিত হয়ে আসুক।"*

*বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃঃ ৬২, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

দ্রঃ "এই 'যুগান্তর" নামটির উদ্ভব কেমন করে হয়েছিল তা জানতে গেলে, "ভারতের ২য় স্বাধীনতা সংগ্রাম," (ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত)-এর ১০৮ পৃষ্ঠায় দেখতে পাই, যে, তিনি লিখছেন :

"যুগান্তর নাম আমার মনোনীত। দেবব্রত বসুর সহিত অনেক আলোচনা করিয়া এই নাম নির্ধারিত করিয়াছিলাম।

এই নামটি শিবনাথ শাস্ত্রীর "যুগান্তর" নামক সামাজিক উপন্যাস হইতে ধার লওয়া হয়"।

আর, "অনুশীলন সমিতি" নামটি নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের হেডমাষ্টার নরেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য্যের দেওয়া। বঙ্কিমবাবুর সাহিত্য হইতে গৃহীত।"

সতীশচন্দ্র বসু, (ভারতের ২য় স্বাধীনতা সংগ্রাম, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ১৮১)

* * * *

ইতিমধ্যে, প্রেস আইনের কবলে পড়ে (জামানত তলব, নিষেধাজ্ঞা জরিমানা, কারাদণ্ড ও নানারূপ পুলিস হয়রানির ফলে) ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষভুক্ত পত্রিকা-গোষ্ঠী —মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার, "নবশক্তি", বারীনদের "যুগান্তর", ব্রহ্মবান্ধবের "সন্ধ্যা" ও বিপিন পালের "বন্দেমাতরম্" গেল অবলুপ্তির পথে। সময় ১৯০৮।

* * * *

কিন্তু তবু বৈপ্লবিক কার্যধারা স্তব্ধ হয়ে গেল না।

তাই ১৯০৮-এর ৯ই ডিসেম্বর পুলিস-দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার ১০০।২ সার্পেনটাইন গলিতে হলেন রিভলবারের গুলিতে নিহত।

এই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হ'ল সেই পুলিস কর্মচারী, যিনি মোকামাঘাট স্টেশনে বাংলার বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীকে ধরিয়ে দেবার অপচেষ্টা করেছিলেন। ১লা মে ১৯০৮-এ। জিতেন রায় চৌধুরী ১৯০৮ এর ১০ই আগষ্ট ছোটলাট এণ্ড্র ফ্রেজারকে হত্যা করতে চেষ্টা করেন ওভারটুন Y. M. C. A. Hall-এ। কিন্তু ব্যর্থ হন। এই

১৯০৮-এর ডিসেম্বর মাসে, ঢাকা অনুশীলন সমিতির পুলিন দাস হলেন ১৮১৮ রেগুলেশনের তিন আইনে গ্রেপ্তার।

আলিপুর বোমার মামলার পর, বাংলার সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন স্তিমিত হতে না হতে, আলিপুর বোমার মামলার সরকারী উকিল আশু বিশ্বাস হলেন গুলির ঘায়ে নিহত। এই অপরাধে চারুচন্দ্র বসুর হল ফাঁসি, আলিপুর কারাগারে। তখন ১৯শে মার্চ ১৯০৯।

এই চারুচন্দ্র বসু বৈপ্লবিক কার্যধারার একটি বিস্ময়কর চিহ্ন। কারণ, এর ডান হাত ছিল সম্পূর্ণ অকর্মণ্য।

অথচ এই পঙ্গুহাতে শক্ত করে বাঁধা রিভলবার দিয়ে তিনি তাঁর বিপ্লবী নেতার নির্দেশ পালন করতে সক্ষম হলেন, অক্ষরে অক্ষরে।

ওদিকে দেশ ছেড়ে, বিদেশ ভূমি খোদ বিলেতের মাটিতে—শোনা গেল গুপ্তবিপ্লবী সংস্থা "অভিনব ভারত"-এর সভ্য, যুবক, মদনলাল ধিংড়ার প্রতিশোধ গ্রহণের হুংকার। অট্টহাসি! আর আনন্দ।

সেদিন ১লা জুলাই, ১৯০৯।

স্যার জন কার্জন ওয়াইলি (সেক্রেটারি অব স্টেট-এর পার্শ্বচর) নিহত হলেন মদনলালের অব্যর্থ রিভলবারের গুলিতে।

১৭ই আগষ্ট, ১৯০৯ সালে, পেণ্টোনাইভিলি কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে জীবন বলিদান করে মদনলাল রচনা করলেন এক অসাধারণ ইতিবৃত্ত। আরেকবার বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষিত হল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবীদের দিকে।

১৯১০-এর ২৪শে জানুয়ারি তারিখে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় কলকাতা হাইকোর্টের মধ্যে বিপ্লবীর রিভলবারের গুলিতে ডি, এস্, পি, সামসুল হুদা হলেন নিহত।

তিনি আলিপুর বোমার মামলার তদ্বিরে ছিলেন বিশেষ উৎসাহী রাজভক্ত প্রজা ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী।

বিপ্লবী বীরেন দত্তগুপ্ত, সামসুল হুদা হত্যার অপরাধে, ১৯১০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ফাঁসির রজ্জু চুম্বন করে, হলেন অমর।

স্থান ঃ কলকাতার আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগার।

*   *   *   *

ওদিকে অনন্তলক্ষ্মণ কানহারে, কৃষ্ণগোপাল কার্ভে, বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডে "থানা"—স্পেশাল জেলের ফাঁসির মঞ্চে আত্ম-ত্যাগ করলেন ১৯১০ এর ১৯শে এপ্রিল। নাসিকের জেলা শাসক মিঃ জ্যাকসনকে গুলিতে নিহত করার অপরাধে (ডিসেম্বর ২১, ১৯০৯)।

এই জ্যাকসন, কবি গণেশ দামোদর সাভারকরকে, কবিতার পুস্তক "লঘু অভিনব ভারত-মেলা" রচনার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে করেন দণ্ডিত।

*   *   *   *

ভারত-জননীর বন্ধনমোচনের প্রচেষ্টায় এরপর এল, "মাদ্রাজ" অগ্রসর হয়ে, সশস্ত্র আন্দোলনের পথে।

ভারতমাতা সমিতির সভ্য ওয়াঞ্চি আয়ার, টিনেভেলীর কালেক্টর রবার্ট উইলিয়াম-ডি'স্-কোর্ট-এ্যাস-কে মায়ানঞ্চি রেলওয়ে জংশনে গুলি করে হত্যা করে মধ্যাহ্ন বেলায়। তারিখ ১৭ই জুন, ১৯১১। তারপর, রিভলবারের গুলিতে করেন আত্মহত্যা।

এই বিষয়ে মামলার বিচার হয় বিশেষ আদালতে। আগষ্ট ৩০, ১৯১১। অপরাধ রাজদ্রোহ ও রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। ১৪ জন অভিযুক্ত হন।

মামলা চলাকালে মামলার অন্যতম আসামী ব্রাহ্মণ ও উকিল ভেংকটেশ্বর আয়ার (পুনারল) ধারাল ছুরিকা দ্বারা নিজের গলা কেটে করেন আত্মহত্যা।

আরেকজন আসামী ধর্মরাজ আয়ার বিষপান করে করেন আত্মহত্যা। উভয় আসামী ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে এই-

ভাবে মৃত্যুবরণ করে আদালতের বিচারের প্রতি দেখালেন বৃদ্ধাঙ্গুলি।

(Roll of Honour, P. 224, K. C. Ghosh)

* * *

এদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে ইংরেজ সরকার আপাততঃ ভারতের প্রতি উদারতা দেখাবার ভান করলেন।

১৯১১ সালের ১১ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে, সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরির উপস্থিতিতে এক ঘোষণার মাধ্যমে ভারতের রাজপ্রতিনিধি দুর্জন লর্ড কুর্জনের বঙ্গ বিভাগের উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত "সেটেল্ড ফ্যাক্ট", হলো, "আনসেটেল্ড"। বঙ্গবিভাগ, মোটামুটিভাবে চলে গেল। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ জোড়া লাগল। কিন্তু পৃথক করে রাখা হল, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামকে। এটা চোখে পড়েও যেন পড়ল না কারোর।

তবু সকলে ভাবলো, এবার বোধহয় দেশে শান্তি ফিরে এলো। ইংরেজ ভাব্‌লো ভারত আর মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইবে না।

* * * *

কিন্তু, বহুজনের এই ক্ষণভঙ্গুর আশাকে ছিন্ন ভিন্ন করে, ভারতের নূতন রাজধানী দিল্লী সহরে, এক অভাবিত ঘটনা ঘট্‌লো। সেদিন ১৯১২ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর।

ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর রাজকীয় শোভাযাত্রা ধীরগতিতে দিল্লীর চাঁদনীচক্‌ দিয়ে যাচ্ছে। তিনি বসে আছেন লেডী হার্ডিঞ্জ সহ, সাজান-গোছান দাঁতাল হাতীর পিঠে। সামনে, পিছনে পুলিশ ও সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী আর ছিলো পোষমানা দেশীয় রাজার দল।

এমন সময় বিনামেঘে বাজ পড়ার মতো নিক্ষিপ্ত হল কোত্থেকে এক তাজা বোমা! আকাশ ফুঁড়ে!

স্বয়ং বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মারাত্মকভাবে হলেন আহত। নিহত

হল একজন অনুচর। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হল বোমার টুকরো। ভীত-চকিত রাজকীয় শোভাযাত্রার মৃত্যু-মধুর গতি সহসা হল ব্যাহত।

* * * *

পরের বৎসর ১৯১৩ সালের ১৭ই মে, লাহোর সহরের লরেন্স পার্কে, বিপ্লবীদের যে "টাইম-বোমা" বিস্ফারিত হল, সেখানে অত্যাচারী ইংরেজ মিঃ গর্ডনের পরিবর্তে, নিহত হল একজন পথচারী।

* * * *

এগিয়ে এল ১৯১৪।

ওদিকে, দূর প্রাচ্যের ঠিকাদার গুরুদিৎ সিং—"সিঙ্গাপুর" ছেড়ে উপস্থিত হলেন হংকং-এর আন্তর্জাতিক বন্দরে।

ভাড়া করলেন "কোমাগাটামারু" নামে পুরো একটি জাহাজ।

দৃষ্টি? কানাডার তটভূমি।

উদ্দেশ্য? সেখানে বসবাস ও রুজিরোজগারের চেষ্টা।

জুটে গেল প্রায় ৫০০ যাত্রী। বেশীর ভাগই ভাগ্যান্বেষী শিখ। ওরা রওয়ানা হল ৪ঠা এপ্রিল, ১৯১৪।

জাহাজ কানাডার বন্দর অঞ্চল "ভ্যাংকুভারে" পৌঁছলো ২৩শে মে, ১৯১৪। কানাডা ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মিলে শলা-পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, এই কালো আদমীদের এখানে নামতে দিলে শ্বেতবাসীদের এই উপনিবেশ হবে কলুষিত।

সুতরাং কানাডা কর্তৃপক্ষ সৃষ্টিছাড়া প্রতিরোধ তৈরী করলেন। অনেক তর্ক-বিতর্ক-অপমান ও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে গুরুদিৎ সিং আপ্রাণ চেষ্টা করলেন তীরে নামতে। পুরো দুটি মাস চেষ্টা করেও কিন্তু পারলেন না নামতে।

অবশেষে "ভ্যাংকুভার" পরিত্যাগ করে, "কোমাগাটামারু" জাহাজটি ফিরে চল্লো—"ইয়োকোহামা"-র পথে।

পৌঁছল সেই বন্দরে। ১৬ই আগষ্ট, ১৯১৪।

এখানেও বৃটিশ চক্রান্ত হল বলবতী।

সুতরাং গুরুদিৎ সিং-কে "ইয়োকহামা" ছাড়তে হল ১৮ই তারিখে। "কোবে" বন্দরে পৌঁছলো ২১শে আগস্ট, ১৯১৪।

না। এখানেও ঠাঁই নেই।

জাহাজ ভাসলো সিঙ্গাপুরের পথে। ১৯১৪-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর, তারিখে সিঙ্গাপুরের দরিয়ায় "কোমাগাটামারু" উপস্থিত হল। ব্রিটিশ শক্তি এখানেও তাঁদের নামতে দিলো না। সুতরাং কলকাতার পথে, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ জাহাজ পৌঁছলো "কুল্‌পি"তে। ২৪ পরগনা জেলা। ২৭শে সেপ্টেম্বর জল-পুলিস এসে উঠলো জাহাজে। করলো খানাতল্লাশি। করলো অকারণ হয়রানি। না, কোন রাজদ্রোহকর জিনিস পাওয়া গেল না।

* * *

জাহাজ এবারে এসে "বজবজে" পৌঁছলো ২৮শে সেপ্টেম্বর। ২৯শে সেপ্টেম্বর জাহাজে আবার পুলিস উঠলো।

যাত্রীদের বলা হল—এক্ষুণি নামতে হবে এখানে।

তারপর উঠতে হবে বজবজের অপেক্ষমান ট্রেনে।

সোজা যেতে হবে পাঞ্জাবে।

"কোমাগাটামারু"র যাত্রীরা—পর পর নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতে শেষটায় হয়ে গেল কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

এরই মধ্যে পুলিসের দল যাত্রীদের জোর করে ধাক্কা মেরেই জাহাজ থেকে নামাতে লাগলো। অপমানের বাকি রাখল না কিছুই। কিন্তু ওরা বজবজের ট্রেনে চাপতে রাজী না হয়ে পুলিসের ব্যূহ ভেদ করে হেঁটে চললো সদলবলে কলকাতার দিকে।

* * *

সংবাদ পেয়ে বাংলা সরকার এক বিরাট "ফৌজ" পাঠালেন ওদেরকে রুখতে। পথের মাঝে।

নেতৃত্ব নিলেন পুলিস কমিশনার স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে। বজবজ ও কলকাতার মাঝামাঝি "মহেশতলায়" পুলিস কমিশনার তাঁর "ফৌজ" নিয়ে এসে হাজির হলেন। বললেন বন্দুকের মুখে :—

না, এগুতে পারবে না। ফিরে চল আবার বজবজে। নিরস্ত্র যাত্রীর দল উদ্যত রাইফেলের সামনে বাধ্য হল মাথা নত করতে। অশেষ দুঃখ, কষ্ট, অপমান, ক্ষুধা আর তৃষ্ণা বুকে নিয়ে ওরা ফিরে এলো বজবজে। সামনে-পেছনে সশস্ত্র পুলিস বাহিনী।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়।

হঠাৎ হুকুম হল : জাহাজে ওঠো।

স্তম্ভিত, ব্যথিত, নিপীড়িত যাত্রীদলের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করলো। মরিয়া হয়ে ওরা অস্বীকার করলো ইংরেজ কমিশনারের হুকুম মানতে।

প্রতিপক্ষের সুরু হল চোখ রাঙানি। হুমকি।

কিন্তু না, এবার আর ওরা কোন কথা শুনতে চাইছে না।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে সার্জেন্ট-মেজর ইষ্টউড দৈত্যের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন শিখ বেষ্টনীর মধ্যে, নায়ক গুরুদিৎ সিং-কে গ্রেপ্তার করতে। মুহূর্ত মধ্যে গর্জে উঠলো গদর দলভুক্ত কোন এক শিখের হাতের রিভলবার। সার্জেন্ট-মেজর লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। সুরু হল পুলিস পক্ষের ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি-বৃষ্টি।

তার কাছে ২।১টি রিভলবারের প্রতিরোধ কতটুকু! হার হল যাত্রীদের। তবু রেলের (ডি. টি. এস.) মিঃ লোমাক্স সহ সিপাহী মালসিং আর তরুণ সিং হলেন নিহত। ২৯শে আগষ্ট, ১৯১৪।

আরও ১৮ জন যুবক প্রাণ হারালেন হয় পুলিশের রাইফেলের গুলিতে, নয় সঙ্গীনের খোঁচায় অথবা জলমগ্ন অবস্থায়।

তার মধ্যে ছিলেন :—*

১। শিহান সিং (অমৃতসর)	৫। লছমন সিং (জলন্ধর)
২। ইন্দার সিং (১) (জলন্ধর)	৬। বুর সিং (১) (অমৃতসর)
৩। আর্জন সিং (জলন্ধর)	৭। ভজন সিং (নাভারাজ্য)
৪। নারায়ণ সিং (ফিরোজপুর)	৮। চন্নন সিং (ওয়াজিরকি)

*পিউপিলস, (জলন্ধর) ১৯৬৭, সেপ্টেম্বর।

৯। শিব সিং (অমৃতসর) ১৩। ইন্দার সিং (২) (জলন্ধর) জলমগ্ন অবস্থায় মৃত্যু

১০। বুর সিং (২) (ফিরোজপুর) ১৪। রুক্মিনীকান্ত মজুমদার (বাংলা)

১১। কামার:সিং (পোখারি) ১৫। দীনবন্ধু পাণ্ডে (উড়িষ্যা)

১২। ঈশ্বর সিং (মানানকি) ১৬-১৭-১৮ : এই তিনজনকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

এছাড়া গ্রেপ্তার ও আহত হলেন শতাধিক যাত্রী। তবু নেতা গুরুদিৎ সিং ধরা পড়লেন না। ধরা গেল না তাঁর গুটিকয়েক বিশ্বস্ত অনুচরকেও।

বর্ণ-বিদ্বেষের বিষময় পরিণামে "কোমাগাটামারু"-র ঘটনা ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে পেল এক বিশিষ্ট স্থান। শিখদের প্রতি ইংরেজদের এই অবিচারে ক্ষুব্ধ হল সারা হিন্দুস্থান। জেগে উঠলো জাতির আত্মাভিমান বাঁচাতে—আত্মবিসর্জনের চিন্তা-স্রোত।

* * * *

এই ২৯শে আগস্টের তিন দিন আগে কলকাতার বুকে নিঃশব্দে সাধিত হল এক সুদূরপ্রসারী বৈপ্লবিক কার্য।

না, হত্যা নয়। অপহরণ!

না, মানুষ নয়। অস্ত্র!

স্থান: ডালহাউসী স্কোয়ারের সন্নিকটে অবস্থিত "রডা" বন্দুকের দোকান। সময়: অপরাহ্ন। তারিখ: ২৬শে আগস্ট ১৯১৪।

এই রডা কোম্পানীর পক্ষে কাস্টমস্ কার্যালয় থেকে বেশ কিছু বিদেশী অস্ত্র ছাড়িয়ে আনার জন্য প্রেরিত হলেন রডা কোম্পানীর অন্যতম কর্মচারী শ্রীশ মিত্র।

তিনি ছিলেন গুপ্ত বিপ্লবী দল আত্মোন্নতি-সমিতির সভ্য। শ্রীশচন্দ্র প্রথমবার ১৯২টি অস্ত্রের বাক্স গাড়ি বোঝাই করে

কাস্টমস্ অফিস থেকে ছাড়িয়ে এনে জমা দিলেন রডা কোং-র ঠিকানায়। যা ছিল নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের সুপরিকল্পিত কার্যের একটি অংশ বিশেষ।

দ্বিতীয়বার শ্রীশচন্দ্র অবশিষ্ট বাক্সে ভর্তি ৫০টি মাউজার পিস্তল আর ৪৬,০০০ হাজার গুলি নিয়ে আর ফিরলেন না কাস্টমস্ অফিসে। অপরাপর বিপ্লবী বন্ধুদের সক্রিয় সহযোগিতায় তিনি অবশিষ্ট অস্ত্রের বাক্সগুলি সরিয়ে ফেললেন বিপ্লবীদের গুপ্তকেন্দ্রে। পরাধীন ভারতে বিপুল অস্ত্রশস্ত্রের এমন দুঃসাহসিক ও সাফল্য-মণ্ডিত অপহরণ কার্য, তাও দিন-দুপুরে, আর কখনও ঘটতে দেখা যায়নি।

এই কৃতিত্বের সঙ্গে জড়িত হয়ে রইলেন একাধিক বিপ্লবী গোষ্ঠী, আর তাঁদের অসম সাহসিক বিশ্বস্ত কর্মীর দল। যাঁরা মুক্ত করলেন, সশস্ত্র বৈপ্লবিক ইতিহাসের এক নবদিগন্ত।

* * * *

এই ১৯১৪-এর জুলাই মাস থেকে শোনা গেল প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা। তৎপর হল সারা ভারতের বিপ্লবী গোষ্ঠী।

আগস্ট মাসে গ্রেট ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে করলো যুদ্ধ ঘোষণা। যুদ্ধের অল্পদিনের মধ্যে ভারতে অবস্থিত অধিকাংশ ইংরেজ সৈন্য প্রেরিত হল বহির্ভারতে।

মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গন থেকে ক্রমাগত ইংরেজের পরাজয় সংবাদ আসতে লাগলো। এটাও বিপ্লবীদের কাছে অভ্যুত্থানের পক্ষে সহায়ক হবে বলে ধরে নেওয়া হল।

গোপনসূত্রে ভারতের বিপ্লবীগণ আরও জানতে পারলেন যে, এ সময় সমগ্র ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ২০,০০০ হাজারের বেশি নয়।

তার মধ্যে কিছু আছে দেশী সৈন্য।

সুতরাং "দেয়ার এডভারসিটিজ আর আওয়ার অপরচুনিটিজ" অর্থাৎ তাদের বিপদ হল আমাদের সুযোগ, এই নীতির ভিত্তিতে

পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সামরিক অভ্যুত্থানের এই সুবর্ণ সুযোগকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে বিপ্লবীগণ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলেন।

পরামর্শ সুরু হল ভারতের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত। নিভৃতে পরিকল্পনা হল রচিত। পুরোভাগে রইলেন বিপ্লবী নায়ক অদ্বিতীয় পুরুষ সিংহ রাসবিহারী বসু।

এগিয়ে এলো সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিন।

সমস্ত ব্যবস্থা যখন প্রায় সম্পূর্ণ,—প্রদেশে প্রদেশে যখন চলে গেছে গোপন নির্দেশ, তখন নেতা রাসবিহারী বিশ্বস্ত সহচর নিয়ে চলে এলেন লাহোরের ইণ্ডিয়ান হোটেলে।

সেদিন ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫।

২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখ (১৯১৫) চিহ্নিত হল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিন।

স্থির হল ঃ—

এলাহাবাদের ভার নেবেন ঃ শিক্ষক দামোদর স্বরূপ
কাশীতে— বিভূতিভূষণ হালদার ও প্রিয়নাথ মিত্র
রামনগরে— বিশ্বনাথ পাণ্ডে ও মঙ্গল পাণ্ডে
সিক্রোলে— দিল্লা সিং
জব্বলপুরে— নলিনীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
বাংলায়— যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
লাহোর, আম্বালা,
রাওয়ালপিণ্ডি, ফিরোজপুর—(গদর দলের) কর্তার সিং সরাবা

তারপর সশস্ত্র বিপ্লবের "তেরঙ্গা-ঝাণ্ডা" উচ্চে ধরবেন তুলে। এই তেরঙ্গা-পতাকা তিনরঙ্গে বিভক্ত হয়ে একসঙ্গে একই অঙ্গে থাকবে। পতাকার "বর্ণ" হবে হলুদ (শিখ), রক্তবর্ণ (হিন্দু) ও নীল (মুসলমান)।

সহসা এই ব্যাপক আয়োজন, দ্বিধাহীন প্রচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম, মন্ত্রগুপ্তির অশেষ সতর্কতা, মৃত্যুদণ্ডকে তুচ্ছ করে অসীম সাহসে কদম কদম এগিয়ে যাওয়ার কল্পনা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ার উপক্রম হল।

কারণ, সংবাদ পাওয়া গেল যে, গোয়েন্দা বিভাগের গুপ্তচর, ছদ্মবেশী বিপ্লবী কৃপাল সিং করেছে চরম বিশ্বাসঘাতকতা !!!

রাসবিহারী স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন, তিনি হেরে গেছেন বুদ্ধির খেলায়।

তবু কিন্তু, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুদ্ধ অকূল দরিয়ায় পরম নিষ্ঠা ও অবিশ্বাস্য নির্ভীকতার পরিচয় দিলেন বিপ্লবী মহানায়ক, বাংলা-মায়ের দুর্লভ সন্তান রাসবিহারী বসু।

ফ্যাট্‌ বাবু ওরফে রাসবিহারী লাহোরে উপস্থিত সঙ্গীদের অভয় দিয়ে বললেন ঃ—

ঠিক আছে। নিরাশ হয়ো না। আমরা সশস্ত্র অভ্যুত্থান করবই। তবে, নির্ধারিত দিনে নয়। তার দুই দিন আগে।

অর্থাৎ ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে। তবু হায়! শেষরক্ষা হল না।

সতীন্দর চন্দর ওরফে রাসবিহারীকে বিপ্লবের আশা ছেড়ে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য লাহোর পরিত্যাগের চিন্তা করতে হল।

বিঃ দ্রঃ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতের ইংরেজ সামরিক শক্তি সম্পর্কে বিপ্লবীদের হাতে যে সংবাদ ছিল তা যে কতটা অভ্রান্ত, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে তখনকার ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জের জবানীতে ঃ—

"রেমিনেসেন্স অব লর্ড হার্ডিঞ্জ, দি ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে ঃ—

"একথা সত্য যে, বিলেত থেকে কিছু অশিক্ষিত টেরিটোরিয়েল ব্যাটালিয়ান না আসা পর্যন্ত ভারতের ইংরেজ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৫,০০০।"

কিন্তু এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অংশ হিসেবে নির্ধারিত দিবস অর্থাৎ ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে "সিঙ্গাপুরের" বীর-বিপ্লবীগণ সামরিক অভ্যুত্থানে পরিপূর্ণ সাফল্যলাভ করলেন।

সাত দিন পর্যন্ত সমগ্র "সিঙ্গাপুর" ছিল বিপ্লবীদের দখলে।

এই ১৯১৫-এর ১১ই মে তারিখে লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর ওপর বোমা নিক্ষেপের মামলায় ফাঁসিতে আত্মাহুতি দিলেন—

আমিরচাঁদ, বালমুকুন্দ, অবাধবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাস।

স্থান: আম্বালা কারাগার।

* * * *

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর বাংলাদেশের বিপ্লবীদের গোপনকেন্দ্রে অপ্রত্যাশিতভাবে এক শুভসংবাদ প্রবেশ করলো। সেটা ১৯১৫-এর মার্চ মাসের গোড়ার দিকে।

জার্মানীর রাজধানী "বার্লিন" প্রত্যাগত বিপ্লবী জিতেন লাহিড়ী* ভারত উদ্ধারে বিদেশে গঠিত বার্লিন কমিটির সংবাদ দিলেন। জানালেন, জার্মান সরকার থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও টাকা-কড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যোগাযোগ করতে হবে। প্রেরিত হল ২৪ পরগণার নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, সি. এ. মার্টিনের † ছদ্মনামে, ছদ্মবেশে। সুদূর বাটাভিয়ায়!

সরাসরি যুক্ত হল বাংলার বিপ্লবী দল, জার্মানীতে গঠিত "বার্লিন-কমিটি" আর জার্মান সরকারের গুপ্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে।

---

*শ্রীরামপুর

†পরবর্তীকালের বিখ্যাত এম. এন. রায়

স্থির হল জার্মান জাহাজ "এস. এস. মাভারিক" ভারতের কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে অস্ত্রশস্ত্র ও টাকা-কড়ি পৌঁছে দেবে। তারপর সুরু হবে দিকে দিকে অভিযান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এবারও বিধি হল বাম। উকিল কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায় ফাঁস করে দিলেন বিপ্লবীদের পরিকল্পনার কথা ইংরেজের কাছে। সেইসূত্রে ভারতের জন্য অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই জার্মান জাহাজ "মাভারিক" অতর্কিতে বন্দী হল ২২শে জুলাই, ১৯১৫। "যাভা"-তে।

দ্বিতীয় জার্মান জাহাজ "এনি-লারসেন" ওয়াশিংটনে আটক থাকতে বাধ্য হল। ভারতের জন্য ক্রীত সেই জাহাজের অস্ত্রশস্ত্র হল বাজেয়াপ্ত।

তৃতীয় জাহাজ "হেনরী-এস" ম্যানিলাতে পড়ল ধরা। বাধ্য হল জাহাজের কাপ্টেন জাহাজ-ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র ম্যানিলার বন্দরে নামিয়ে দিতে।

তারপর ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে চললো দেশে। অকৃতকার্য হয়ে। ওদের দোষে নয়, বিশ্বাসঘাতক যাভার উকিল কুমুদনাথের ঘৃণিত স্বার্থপরতায়। এবারকার সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সর্বপ্রধান নায়ক ছিলেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পুলিস তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে একটি চিঠির টুকরোর সূত্র ধরে উপস্থিত হল ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের এক গভীর বন আর শ্বাপদসংকুল পর্বত আবেষ্টনীর মধ্যে। জায়গাটার নাম "কাপ্তি পোতা"। বালেশ্বর সহর থেকে ৩৫ মাইল দূরে।

কিন্তু ধরেও ধরতে পারলেন না তাঁকে। ফস্‌কে গেল "শিকার"। শেষ পর্যন্ত সাক্ষাৎ হল পুলিসের সঙ্গে—নায়ক যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গী চতুষ্টয়ের। বালেশ্বর সহর থেকে মাইল কয়েক দূরে "চাষখণ্ডে"। সেটা হল এক উন্মুক্ত ও বিস্তীর্ণ শস্যভূমি।

তবু জীবন থাকতে ধরা দিতে রাজী হলেন না কেউ-ই। সুরু হল সম্মুখ-যুদ্ধ। ভর দুপুরে। সহস্র গ্রামবাসীর শ্বাসরুদ্ধ উদ্বিগ্নতার সুমুখে। ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে। সেদিন

একদিকে রয়েছে সশস্ত্র পুলিস আর সামরিক বাহিনীর মিলিত শক্তি। অপরদিকে মাত্র ৫টি বাঙালী যুবক। জীবনকে যাঁরা হাতের মুঠোতে রেখে স্পর্ধার সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন দেশ-মাতৃকার মহান যজ্ঞে উৎসর্গীত হবার আকাঙ্ক্ষায়। সারা দেশময় এক উজ্জ্বল সাহসের দৃষ্টান্ত রেখে যেতে। হাতে তাঁদের রডা কোং-র থেকে অপহৃত শক্তিশালী মাউজার পিস্তল। বুকে অফুরন্ত সাহস আর আনন্দ। প্রায় একঘণ্টা উভয়পক্ষে হল বেপরোয়া গুলি বিনিময়। তারপর এই অবিস্মরণীয় যুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রাণ দিলেন শহীদ চিত্তপ্রিয় রায়। সাংঘাতিকভাবে আহত হলেন বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ নিজে।

পরদিন ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫। যতীন্দ্রনাথ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে জাতির জীবনে রেখে গেলেন এক অসীম প্রেরণা আর বীরত্ব-পূর্ণ কাহিনীর ইতিবৃত্ত।

যুদ্ধের অপর দুই বীর মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত আর নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বালেশ্বর জেলের ফাঁসি-মঞ্চে আত্মদান করলেন ২১শে নভেম্বর, ১৯১৫। জাতির জীবনে হলেন অমর। অবশিষ্ট বিপ্লবী যতীশ পালের হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড*। "কালাপানি"-তে কারাদণ্ড ভোগের সময় দেখা গেল তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ।

ফিরিয়ে নিয়ে আশা হল বাংলাদেশে। রক্ষিত হলেন বহরমপুর কারাগারে।

অবশেষে ১৯২৪-এর ৪ঠা ডিসেম্বর সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ হল ঘোষিত।

এমনিভাবে একে একে মুছে গেল বাংলা-মায়ের পঞ্চ-বীর।

সারা ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় প্রচেষ্টার পরিকল্পনানুসারে স্থির ছিল :

---

* আন্দামান সেলুলার কারাগার.

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	মাদ্রাজের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবেন বালেশ্বর থেকে।
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	চক্রধরপুর থেকে বি. এন. আর. রেলপথ নষ্ট করে দিয়ে রেলগাড়ি চলাচল করবেন বন্ধ।
সতীশ চক্রবর্তী	অজয় নদীর মুখে বিচ্ছিন্ন করবেন ই. আই. আর. রেলে-র সংযোগ ব্যবস্থা।
নরেন ঘোষচৌধুরী ও ফণীন্দ্র চক্রবর্তী	চট্টগ্রামের হাতিয়া দ্বীপে জার্মান সরকারের জাহাজে প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র করবেন গ্রহণ।
বিপিন গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র ভট্টাচার্য,	কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম আক্রমণ করে দখল করবেন "কেল্লা"।

তারপর সুরু হবে সহর কলকাতার উপর আধিপত্য বিস্তার। বিপ্লবী পতাকার রঙ নির্দিষ্ট ছিল যথাক্রমে সবুজ, সাদা ও হলুদ।

* * *

১৯১৫ সালের ৫ই মার্চ মতিচাঁদ ফাঁসিতে আত্মবিসর্জন করে হলেন শহীদ, রাজনৈতিক হত্যার অভিযোগে।

তিনি ছিলেন দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম শহীদ আমিরচাঁদের বন্ধু।

* * *

এদিকে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারীর নেতৃত্বে ভারতের প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংবাদ পুলিশের হস্তগত হল গুপ্তচর কৃপাল সিং-এর মারফতে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সচকিত হয়ে দলে দলে সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে লাগল।

চিহ্নিত বিপ্লবীদের তো কথাই নেই।

পুলিশের সঙ্গে থেকে গুপ্তচর বিভাগ পাঞ্জাবের প্রতিটি গৃহে সকল কাগজপত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল। কোথাও

কোন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংশে কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর বা ষড়যন্ত্রের কোন ইশারা পাওয়া যায় কিনা।

সেই মর্মে ১৯শে ফেব্রুয়ারি লাহোরের "মোচী গেটে" পুলিস হাজির হল খানাতল্লাশি করতে। ব্যর্থ হল না তাদের হানা। পেল বোমা, রিভলভার, ছোরা।

২০ তারিখে পাওয়া গেল বিভিন্ন ধরনের রিভলবারের কার্তুজ, টুপি, ফাইল, ডুপ্লিকেটর যন্ত্র, গুলি, লাঠি, পতাকা ও রাজদ্রোহকর পুস্তিকা।

২৪ তারিখে লাহোরের "গুমতি বাজার" ওয়াচিওয়ালি মহল্লা ঘেরাও করে পুলিস পেল ৪টি বাংলাদেশে প্রস্তুত বোমা, একটি পিস্তল, বিভিন্ন ধরনের কার্তুজ, বোমা তৈয়াবীর সলিউসন, গ্রীক্-ফায়ারের ও বোমা তৈয়ারীর অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য।

স্পেশাল ট্রিবিউনালের কাছে এক বিরাট ষড়যন্ত্রের মামলা খাড়া করা হল। সুরু হল বিচার—লাহোর কারাগারে।

সেদিন ২৭শে এপ্রিল, ১৯১৫।

৬২ জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল।

এই সংখ্যা শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াল ৮০-তে।

তার মধ্যে ১৬ জন বেপাত্তা।

* * *

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫—লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার দেওয়া হল রায়।

২৪ জনের প্রতি হল ফাঁসির আদেশ। ২৬ জনের হল যাবজ্জীবন

এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ফলে ১৯১৫ সালের ১৪ই নভেম্বর ১৭ জনের মৃত্যুদণ্ড রহিত হল। অবশিষ্ট ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রইল।

তাঁদের নাম :

১। বখশিশ সিং গিলওয়ালি (অমৃতসর)

২। বিষ্ণু-গণেশ পিংলে (পুনা)

৩। সুরাইন সিং গিলওয়ালি (ইশার সিং-এর পুত্র, অমৃতসর)

৪। হরনাম সিং গিলওয়ালি (শিয়ালকোট)

৫। জগৎ সিং-সুর সিং (লাহোর)

৬। কর্তার সিং সরাবা (লুধিয়ানা)

৭। সুরাইন সিং গিলওয়ালি (বুর সিং-এর পুত্র, অমৃতসর)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সপ্ত-বীরের ফাঁসি হয়ে গেল লাহোর কারাগারে। সেদিন ছিল ১৭ই নভেম্বর ,১৯১৫।

বিচারের সময় এঁদের বিরুদ্ধে যখন ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয় তখন ওঁরা সমস্বরে বলেছেন :—

ষড়যন্ত্র কেন ? আমরা তো প্রকাশ্যেই বিদেশী রাজশক্তিকে অস্বীকার করছি।

এঁদের অন্যতম বিপ্লবী বীর কর্তার সিং সরাবা বলে উঠলেন :—

আমি যা করেছি তার জন্য মোটেই অনুতপ্ত নই। বরং আমি যে এই সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করতে পেরেছি সেজন্য গৌরব বোধ করছি। দুঃখ শুধু যে, কাজটা শেষ করে যেতে পারলেম না।

তাছাড়া পরাধীন দেশের প্রতিটি দাসের বিদ্রোহ করার অধিকার পূর্ণ মাত্রায় আছে বলে আমি মনে করি। আর মানুষের মতো বেঁচে থাকার প্রাথমিক অধিকার রক্ষার জন্য চেষ্টা করা আত্মরক্ষারই সমান। আর সেই চেষ্টা মোটেই অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না।

তাঁকে যখন বলা হল যে, তিনি এই দণ্ডাদানের বিরুদ্ধে আপিল করবেন কিনা, তখন উত্তরে তিনি বললেন : কেন আপিল করব ? যদি আমার একটির বেশি প্রাণ থাকতো তবে আমি সেই সবক'টি প্রাণই উৎসর্গ করতাম দেশের জন্য।

* * *

এই হলেন গদর দলের সেই কর্তার সিং সরাবা। যাঁর ছবি সব সময় ভগৎ সিং কাছে কাছে রাখতেন। এই সেই বীরপুরুষ, যিনি

মৃত্যুদণ্ড ভয়ে ভীত কম্পিত না হয়ে বারংবার দেশের কাজে মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এই সেই ত্যাগনিষ্ঠ বিপ্লবী, যিনি শত প্রহরী বেষ্টিত ইংরেজ বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে—সগৌরবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি রাজদ্রোহের জন্য দুঃখিত নন। অনুতপ্তও নন।

তাঁর দুঃখ শুধু আরব্ধ কর্তব্য পালন করতে না পারার জন্য। তখন কর্তার সিং সরাবার বয়স হবে মাত্র ১৮ কি ১৯!

* * *

এদিকে—নেতা রাসবিহারী যে জাতীয় সরকার নিজ দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হলেন না—কর্তার সিং সরাবা ও তাঁর সঙ্গীগণ যে মহান দায়িত্ব পালনের মুখে প্রাণ বিসর্জন দিলেন—সেই স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সরকার অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হল বিদেশ ভূমিতে।

আফগানিস্তানের রাজভ্রাতা ও প্রধানমন্ত্রী সর্দার নসরুল্লা খানের আনুকূল্যে, রাজা অমানুল্লার সানুগ্রহ স্বীকৃতিতে ১৯১৫ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে কাবুল সহরে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতের প্রথম অস্থায়ী জাতীয় সরকার * বার্লিন-কমিটির উদ্যোগে। জার্মান ও তুর্কী সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থ সাহায্যে।

জার্মানীতে বন্দী ভারতীয়দের নিয়ে গড়ে উঠলো "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ফোর্স"। পরে যার নাম হল "আর্জি হুকুমৎ"। হাত-রাসের কুমার স্বদেশ-প্রেমিক মহেন্দ্রপ্রতাপ হলেন সভাপতি। গদর দলের মৌলবী বরকতুল্লা হলেন অর্থমন্ত্রী।

বিপ্লবী ওবেদুল্লা সিন্ধী হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এসব কিছুর নেতৃত্ব দিলেন জার্মান সরকারের সর্বাধিনায়ক সম্রাট দ্বিতীয় কাইজার উইল হেলেম।

---

* লেখকের কাছে লিখিত রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের চিঠি—২৮শে অক্টোবর, ১৯৬৭ ; দ্রষ্টব্য।

Freedom Fighters Unite

RAJA MAHENDRA PRATAP
Aryan Peshwa

Rajpur, Dehra Dun

Dharma, 93, Rajpur Road, Dehra Dun.

Dated 28 Oct 1967

You have yet to fight—

To get India out of Commonwealth

•••

To reunite India in Aryan
Aryan is Iran to Assam
Aryan is a district of Asia,
Province of World State

•••

To bring Swaraj to every village and town

•••

To abolish the present system of elections. Near unanimous agreement should prevail

•••

Party system creates friction

•••

All should work for all to make all happy

•••

Honesty should rule society

Dear Shri Lokendra Kumar Sen Gupta ji, I am glad to hear from you. I am, however, painfully astonishat that a man of your position does not know that I founded Provisional Government of India on the 1st of December 1915 at Kabul and that I was its president. With the help of H. E. Sardar Nasrullah Khan, younger brother of the King and Prime Minister of Afghanistan we could raise twelve thousand Pathan troops who fought against the British in early 1916. Yours sincerely M. Pratap

Raja Mahendra Pratap
Aryan Peshwa.

93, Rajpur Road
Dehra Dun
28 Oct. 1967

Dear Shri Lokendra Kumar Senguptaji,

I am glad to hear from you. I am, however painfully astonished that a man of your position does not know that I founded Provisional Government of India on 1st day of December, 1915 at Kabul and that I was its president. With the help of H. E. Sardar

Nasrullah Khan, younger brother of the King and Prime Minister of Afganistan we could raise twelve thousand pathan troops who fought against the British in early 1916.

Yours sincerey

M. Pratap.

To, Sri Lokendra Kumar Senguptaji
8 D, Ekdalia place, Ballygunge,
Calcutta-19.

ভাবানুবাদ

প্রিয় শ্রীলোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তজী :

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। কিন্তু আফগানিস্তানের বাদশাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মহামান্যবর সর্দার নসরুল্লা খানের সহায়তায় বিগত ১৯১৫ সালের ১লা ডিসেম্বর আমি ভারতের যে অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করিয়াছিলাম—এবং সেই সরকারের সভাপতি ছিলাম, সেকথা আপনার মত বিশিষ্ট ব্যক্তি অবগত না থাকায় যুগপৎ ব্যথিত ও বিস্মিত বোধ করিতেছি।

১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে আমাদের গঠিত জাতীয় সেনার অন্তর্ভুক্ত দ্বাদশ সহস্র পাঠান বাহিনী ইংরেজদের সহিত সম্মুখসমরে লিপ্ত ছিল।

ভবদীয়

এম. প্রতাপ

* * * *

ভগৎ সিং-এর কথা বলতে গিয়ে আমাদের আর একবার যেতে হবে ১৯০৬ সালে।

অরবিন্দের সাথী—বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বাংলাদেশে সতীর্থ বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে ঠিক একমতে চলতে

পারছেন না। তাই স্থির করলেন বাংলা ছেড়ে একটু বাইরে যাবেন।

এই পথ-পরিক্রমার ক্রমপর্যায়ে ঘুরতে ঘুরতে তিনি উপস্থিত হলেন পাঞ্জাবে। মিলিত হলেন একটি ছোট দলের সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন লালচাঁদ ফালক, কিষেন সিং, লালা লাজপত রায়, সর্দার অজিত সিং, ডাঃ হরিচরণ মুখোপাধ্যায় (আম্বালা), চারুচন্দ্র ঘোষ (পেশোয়ার) ও লালা অমরদাস (শিয়ালকোট)। এই তরুণ গোষ্ঠীর সঙ্গে কয়েকদিন ধরে চললো দেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা। ফলে কিষেণ সিং হলেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত। এই কিষেণ সিং-এর অন্যতম পুত্রের নাম ভগৎ সিং।*

এবার সর্দার অজিত সিং-এর সঙ্গে যুক্ত হলেন দুই ভাই, সর্দার কিষেণ সিং ও সর্দার শরণ সিং। এগিয়ে এলেন মেহতা আনন্দ কিশোর, সুফী অম্বাপ্রসাদ ও ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ।

স্থির হল প্রকাশ্য ও গুপ্ত এই উভয় আন্দোলনে সবাই সম্মিলিত-ভাবে যাবেন এগিয়ে।

ঠিক এমনি সময় পাঞ্জাব সরকার চাষীদের বিরুদ্ধে এক আইন প্রণয়ন করে তাদের কিছু ক্ষতি করার চেষ্টা করলো।

সর্দার অজিত সিং চাষীদের হয়ে নেমে গেলেন তাদের কাজে, প্রকাশ্যে। জাতিতে তিনি ছিলেন জাঠ। তাই তাঁর কাজের সুবিধে হল সেদিক থেকে। তদুপরি তিনি ছিলেন ভালো সংগঠক। ছিল ভাষণ ক্ষমতা। ছিল লিখন পারদর্শিতা।

ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগলো আন্দোলন। লয়ালপুরে এক দীপ্ত ভাষণে তিনি জনসাধারণের কাছে ইংরেজের শোষণ ও কুশাসনের কয়েকটি দিক বেশ স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। জনতা গেল বিগড়ে। হল স্বাধীনতা-পিপাসু। চাইল ব্রিটিশ অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে। তাদের নিঃশেষে তাড়াতে। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা

---

* টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভলিউসনারি : উমা মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১০১
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি : ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৩০১

তখন ডেনিয়েল ইবটসন। তিনি চুপ করে বসে থাকার পাত্র নন। চললো পুলিসী নির্যাতন। আর উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে গেল গোপন মতামত।

রাজ্যপাল-এর সেই সংবাদের ভিত্তিতে তৎকালীন ভারতের রাজ-প্রতিনিধি তাঁর "ডেসপাচে" লিখলেন বিলেতে ভারত সচিবকে, লালা লাজপত রায় ও সর্দার অজিত সিং-এর কাজকর্ম সম্পর্কে :

"The Viceroy added that the propaganda was originated and directed by a secret committee of Arya Samaj, a society which was originally religious but had in the Panjab 'a strong political tendency'. He was convinced that the head and centre of the movement was Lajpat Roy and his most prominent agent in disseminating sedition is Ajit Singh; formerly a school master, employed last year by the supposed Russian spy Lesself."

(How India struggled for Freedom, Ramgopal P. 181)

"এসব আন্দোলন আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি গোপন সমিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই আর্য সমাজ গোড়াতে ছিল ধর্মীয় সংস্থা। কিন্তু পরে এই সংস্থাকে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক ব্যাপারে বিশেষ-ভাবে আগ্রহশীল হতে দেখা গেছে। আমি এ বিষয়ে লিখছি যে, ওই আন্দোলনের মস্তিষ্ক ও প্রধান ব্যক্তি হল লালা লাজপত রায়। রাজদ্রোহের বীজ ছড়াবার পক্ষে তাঁর সবচাইতে কার্যকরী ও প্রধান সহকারী হল অজিত সিং। এই অজিত সিং বিদ্যালয়ের একজন ভূতপূর্ব শিক্ষক। রাশিয়ান গুপ্তচর হিসেবে চিহ্নিত 'লেসেফ' একে গতবছর কাজে নিযুক্ত করেছিল।"

এর ফলে ১৯০৭-এর ৯ই মে লালা লাজপত রায় হলেন গ্রেপ্তার। তার দু'দিন পর অজিত সিং। তারপর উভয়ে প্রেরিত হলেন সুদূর বার্মাদেশের মান্দালয় কারাগারে।

এই মান্দালয় থাকাকালীন—একই গৃহে বন্দী জীবন-যাপন করতে বাধ্য হলেও লালাজী কথা বলতে পারতেন না সর্দার অজিত সিং-এর সঙ্গে। কারণঃ ইংরেজের প্রতিহিংসা মূলক অদ্ভুত আদেশ। অবশেষে দেশে ও বিদেশে এঁদের মুক্তির বিষয় নিয়ে আন্দোলন হওয়াতে ওঁরা ছ'মাস পরে পেলেন মুক্তি।

মুক্তির পর অজিত সিং-এর ব্যক্তিগত জীবন হয়ে উঠলো অতিষ্ঠ, পুলিসের হয়রানির চোটে। বাধ্য হলেন লাহোর ছাড়তে।

পাড়ি জমালেন "ইরানে"—অনেক চড়াই-উৎরাই ভেঙে। সেই দুর্দিনের সাথী ছিলেন সুফী অম্বাপ্রসাদ, যাঁকে তখন পুলিস চেয়েছিল গ্রেপ্তার করতে :—

"Sirdar Ajit Singh, who absconded to Persia in 1909, left that country in 1911 and settled at Lausanne, after a short visit to the Paris group of revolutionaries as a teacher of oriental languages under the Persian alias of Mirza Hassan Khan. He again went to Persia in 1912 and left it for Rio-de-Janero in November 1914. From there he sent Jodh Singh Mahajan to Berlin in 1915.

"সর্দার অজিত সিং ১৯০৯-এ পারস্যে পলায়ন করেন। ১৯১১ সালে পারস্য পরিত্যাগ করে উপনীত হন "লসনে"। ইতিমধ্যে প্যারিসের স্বল্পকালীন উপস্থিতিকালে বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেখানে প্রাচ্য ভাষার শিক্ষক হিসেবেও কিছুদিন কাটান। তখন তাঁর ছদ্মনাম ছিল মির্জা হাসান খাঁন।

১৯১৩ সালে আবার তিনি গোপনে পারস্যে যান। সেখান থেকে রাইও-ডি-জেনেরা যান ১৯১৪ সালে।

এই রাইও-ডি-জেনেরা থেকে যোধ সিং মহাজনকে পাঠান বার্লিনে, ১৯১৫ সালে।"

(টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভলিউসনারিজ : উমা মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৩)

এই অজিত সিং-এর অন্যতম ভাই শরণ সিং। ব্রিটিশ কারাগারের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে অবশেষে ব্রিটিশ কারাগারের বাইরে শেষনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

ওদিকে ভগৎ সিং-এর পিতা কিষাণ সিং পুত্র ভগৎকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামে, গুরু যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদধূলি নিতে। তখন ১৯২৭।

ভগৎ-এর পিতা কিষাণ সিং ছিলেন তাঁদের দলের একজন বিশ্বস্ত সেবক। অর্থ দিয়েও তিনি দলকে সাহায্য করতেন।

১৯১৫ সালের লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সময় একথা প্রবাশ হয়ে পড়ে যে, রাজদ্রোহী অজিত সিং-এর ভাই-এর কাছ থেকে কর্তার সিং সরাবা রীতিমত আর্থিক সাহায্য লাভ করেছেন।

এবার ভগৎ সিং-এর কথায় ফিরে এলে দেখতে পাই যে,—

ভগৎ সিং-এর বয়স যখন সাত—তখন তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল কর্তার সিং সরাবা, ভাই পরমানন্দ প্রমুখ স্বাধীনতা যোদ্ধাদের নিজের চোখে দেখবার। কারণ, কিষাণ সিং-এর "বাঙ্গা" গ্রামে ওঁরা সদা-সর্বদা যাতায়াত করতেন।

ভগৎ সিং-এর বয়স যখন নয়, তখন ১৯ বছরের কর্তার সিং সরাবা ফাঁসিতে প্রাণ দেন। দু'দিন আগে চোখের ওপর দেখা লোকটির জন্য ভগৎ সিং মনে খুবই আঘাত পান। সেই দুঃখে মুহ্যমান হয়ে তিনি অশ্রুপাতও করেছেন।*

এছাড়া সে সময়ে অনবরত চলতে থাকে এমন সব স্বদেশী মামলা, যাতে অভিযুক্তদের বরাতে জুটতো অনিবার্য রূপে

---

* গদর দল ও শহীদ ভগৎ সিং : ডাঃ জি-এস-দিওল :—
পিউপিলস পাথ, মার্চ, ১৯৫৭, পৃঃ ৫৪।

ফাঁসি, দ্বীপান্তর, দীর্ঘ কারাবাস ও সেই সঙ্গে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার নিষ্করুণ আদেশ।

এমনি পরিবেশের মধ্যে তাঁর মনে স্বতঃই দেশের স্বাধীনতার চিন্তা ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে পড়তে সাহায্য করে।

সরকারও ১৯০৮ সাল থেকে সুরু করে চতুর্দিকের বোমা, পিস্তল ও ষড়যন্ত্র মামলায় অস্থির হয়ে এর একটা বিহিত করার জন্য অগ্রসর হন।

গঠন করেন হাইকোর্টের বিচারক সিডনী রাউলাটকে কেন্দ্র করে "রাউলাট কমিটি"। এরই আর এক নাম হল "সিডিসন কমিটি"।

তখন ১৯১৭। এর অপর দুই সভ্যের নাম হল কুমার স্বামী শাস্ত্রী ও প্রভাসচন্দ্র মিত্র। এই কমিটির সুপারিশ আইনে পরিণত করতে ইংরেজ সরকার হলেন আগ্রহান্বিত। পরবর্তীকালে ইংরেজ ভক্ত প্রভাস মিত্রের নাম হল দেশের কাছে রাউলাট মিত্তির বলে।

এগিয়ে এল ১৯১৮।

এই ১৯১৮ সালের ১৫ই জুন পূর্ববঙ্গের ঢাকা সহরের বুকে কলতা-বাজারে ফেরারী রাজনৈতিক কর্মীদের গোপনকেন্দ্রে পুলিশ এসে হল উপস্থিত। হল সম্মুখ যুদ্ধ।

সে যুদ্ধে অসীম বীরত্বে সংগ্রাম করে গুরুতর আহত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন নলিনী বাগচী, ১৬ই জুন তারিখে মিটফোর্ড হাসপাতালে। সঙ্গী তারিণীপ্রসন্ন মজুমদার মৃত্যুবরণ করলেন তার আগের দিন, ১৫ই জুন তারিখে।

এই ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবী সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী—"বন্দেমাতরম" ধ্বনি উচ্চারণ করে ফাঁসির রজ্জুতে করলেন আত্মবিসর্জন—বিশ্বাসঘাতক দলভ্রষ্ট সঙ্গী বিনায়করাও কাপ্‌লেকে হত্যা করার অভিযোগে।

১৯১৯-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারি, গান্ধীজী রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে জানালেন প্রতিবাদ।

১৯১৯-এর মার্চ মাসের ১৮ তারিখে অহিংসা মন্ত্রের উদ্গাতা গান্ধীজীর প্রতিবাদ এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে ভারত সরকার স্যার সিডনী রাউলাটের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের উচ্ছেদকল্পে যে আইন পাশ করালেন, তাতে প্রাদেশিক সরকারকে নিম্নলিখিত ভাষায় ক্ষমতা দেওয়া হয়ঃ—

"Were given powers to arrest persons reasonably beleived to be connected with certain offences, the commission of which threatened public safety and to confine them in such places and under such conditions as were prescribed. Further, dangerous characters, already under control or in confinement could be continuosly detained under the Act."

ভাবানুবাদ

"প্রাদেশিক সরকারকে ঢালোয়া ক্ষমতা দেওয়া হল সেই সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী আটক রাখতে—যারা সরকারী বিশ্বাস মতে এমন সকল অপরাধে অপরাধী যা কিনা জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে বিপদজনক বলে বিবেচিত।

এছাড়া যে সকল সাংঘাতিক চরিত্রের ব্যক্তিগণকে ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে কিংবা যাদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে, তাদেরকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আবদ্ধ রাখবার ক্ষমতাও উক্ত আইনের বলে প্রাদেশিক সরকারকে দেওয়া হল।"

সমগ্র দেশের কল্যাণের পরিপন্থী এই বিলটি আইনে পরিণত হওয়ায় গান্ধীজী ২৪শে মার্চ ২৪ ঘণ্টার জন্য করলেন উপবাস।

১৯১৯-এর ৩০শে মার্চ নির্দিষ্ট হল "শোক দিবস" পালন দিবস।

১লা এপ্রিল দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সুরু হল। সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ১৯১৯-এর ৯ই এপ্রিল তারিখে গান্ধীজী বরণ করলেন সত্যাগ্রহীর পুরস্কারস্বরূপ—গ্রেপ্তার।

প্রতিবাদে ১০ই এপ্রিল দিল্লী নগরী পালন করলো হরতাল।

অপরদিকে, দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ২৫০ মাইল দূরে শিখদের সর্বতীর্থসার পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের ছোট্ট একটি উন্মুক্ত স্থানে স্থানীয় জনসাধারণ এই কালা আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে করলেন সংকল্প। সেদিন ছিল ১লা বৈশাখ, ইংরেজী ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯। কিন্তু সে বৈশাখ যে কী বীভৎস ও নারকীয় হতে পারে তার খবর তখন পর্যন্ত কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।

দেশের এমনি চঞ্চল ও জটিল পরিস্থিতির মধ্যে অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে সহরের শাসনভার গ্রহণ করলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড হ্যারী ডায়ার।

তারপর এগিয়ে চললেন সদর্পে জালিয়ানওয়ালাবাগের দিকে।

সঙ্গে রইলো ৯০ জন গুর্খা-সৈন্য, কিছু বালুচি সৈন্য আর দুটি সাঁজোয়া গাড়ি।

সজ্জিত করলেন নিজের অভিসন্ধি অনুযায়ী সৈন্য-সামন্ত।

বাগের মুখ বন্ধ করে নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে।

তারপর যারা রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এসেছে, সেই জমায়েতের উদ্দেশ্যে কোনরূপ সাবধানী বাক্য উচ্চারণ না করে রাইফেল হাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান সৈন্যদের হুকুম দিলেন: "ফায়ার"!

মুহূর্ত মধ্যে শতাধিক রাইফেলের মুখ থেকে অগ্নিবৃষ্টি হতে লাগলো। আর আতঙ্কিত সভা-মণ্ডপের নিরস্ত্র, নিরীহ জনসাধারণ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হতে লাগলো একের পর এক। '৩০৩ রাইফেল থেকে দশ মিনিট ছ'শো পঞ্চাশ রাউণ্ড

গুলি ছোড়া হল। নিহতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো তিন হাজারের ওপর। আহত হল দেড় হাজার নর-নারী। তাদের আকুল ক্রন্দনে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার করুণ চিৎকারে, আর মৃতদেহের স্তূপে, জালিয়ানওয়ালাবাগ হয়ে উঠলো এক বীভৎস শ্মশানভূমি।

তদুপরি "সান্ধ্য আইন" বলবৎ থাকায় আহতের চিকিৎসা, কি তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে একবিন্দু জল দেবার জন্য কেউ এগিয়ে আসতে পারলো না। সেদিনের সেই নিদারুণ অসহায়তা কল্পনাও করা যায় না।

* * * *

অন্যদিকে বলবৎ হল ডায়ারের জঘন্য "হামাগুড়ি হুকুম"।

জেনারেল ক্যাম্পবেলের ও কর্নেল ব্রায়ানের বর্বর "সরকার সেলাম!" কর্নেল জনসনের ছাত্র ও পথিকদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার। ক্যাপ্টেন ডাডটনের জনসাধারণের ওপর প্রকাশ্য বেত্রদণ্ড।

আর গুজরানওয়ালাতে ক্যাপ্টেন কারবেরির উড়োজাহাজ থেকে নিরীহ জনসাধারণের ওপর বোমা-নিক্ষেপ ও মেসিনগানের গুলিবর্ষণ।

প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "স্যার" উপাধি পরিত্যাগ করে এক চিঠিতে ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড চেমস্ ফোর্ডকে লিখলেন ২৯শে মে, ১৯১৯ :

"নিরস্ত্র ও নিঃসহায় জাতির উপরে মনুষ্যঘাতী অস্ত্র-শস্ত্রে বলীয়ান শক্তি যে অত্যাচার করিল, তাহার তুলনা কোন সভ্য সরকারের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশবাসীর পুঞ্জীকৃত মর্মবেদনা শাসক সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়াছে।

অ্যাংলোইণ্ডিয়ান পত্রসমূহ সেই উপেক্ষায় প্রশংসমান হইয়াছে এবং জনগণের ঐ বেদনায় উপহাস করিয়াছে।

আজ আমি আমার কোটি কোটি দেশবাসীর পক্ষ হইতে প্রতিবাদ জানানো কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি।

আজ আমি দেখিতেছি যে, সম্মানের নিদর্শন আমার এই উপাধিটি পূর্বোক্ত অপমান ও লজ্জাকে আরও প্রকট করিয়া তুলিতেছে। আজ আমি এই সম্মানের পদটির ভারমুক্ত হইয়া অপমানিত, লজ্জিত মানুষের প্রতি অযোগ্য ব্যবহার ও প্রপীড়িত দেশবাসীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে চাই।

তাই আমি আপনার পূর্বগামী বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রদত্ত "নাইট" উপাধি হইতে আমাকে মুক্ত করিতে আপনার নিকট অনুরোধ জানাইতেছি।"

সমগ্র দেশ যখন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্যে পূর্ণ হতে লাগলো, তখন মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লিখলেন:

"I do not want to embarass the Government now."

"এ সময়ে সরকারকে বিব্রত করতে চাইনে"।*

রবীন্দ্রনাথের "স্যার" উপাধি পরিত্যাগ-এব দৃষ্টান্তে উদ্বোধিত হয়ে রাজ-প্রতিনিধির পরিষদ সভ্য স্যাব শঙ্করণ আয়ার নিজের "নাইট" উপাধিসহ পরিষদ সভ্যপদও পরিত্যাগ করলেন। তারপর চিঠিতে জানালেন বড়লাটকে: "বিচাবের নামে যারা আমার দেশের অসহায় নর-নারীকে এমন নির্বিচারে হত্যা করতে পারে, তাদের দেওয়া সম্মানের বোঝা আমি আর বইতে চাইনে।"

* * * *

ভগৎ সিং-এর বয়স তখন মাত্র বারো। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংবাদে বাবো বৎসরের সেই কিশোর বালক হয়ে উঠলো অস্থির চঞ্চল।

---

*যদিও প্রতিবাদের চিহ্নস্বরূপ—ফিরিয়ে দিলেন ইংরেজ-প্রদত্ত "কাইজার-হিন্দ"পদক।

বেরিয়ে পড়লো লাহোর ছেড়ে অমৃতসরের পথে।

উপস্থিত হল জালিয়ানওয়ালাবাগে। সেখানকার যে ধূলি হল পবিত্র শত-শহীদের আত্ম-বলিদানে, সেখানে হাঁটু গেড়ে বসলেন। তারপর মাথা নিচু করে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে চুম্বন করলেন সেই পূত-মৃত্তিকা।

বাগে-র শহীদদের অশরীরী আত্মা, তাদের রক্ত-সিক্ত মাটি, সবাই যেন কথা কয়ে উঠলো। ভগৎ সিং-এর কানে কানে বললো তারা :—

শুনছো? আমরা তৃষ্ণার্ত।

ঐ পিপাসা, ঐ জ্বালা মিটবে না—"জলে"! মিটবে—ঘাতক ইংরেজের তপ্ত রক্তে!

পারবে তুমি দিতে!

সেদিন অমৃতসরের সেই এক মুঠো রক্ত-রাঙা মাটি হাতে তুলে নিয়ে ভগৎ সিং বলে উঠলো, হ্যাঁ, পারব এর প্রতিশোধ নিতে।

আর, পরাধীনতার হীনতা চূর্ণ করে ইংরেজ তাড়িয়ে দেশকে করব স্বাধীন। করব সমৃদ্ধ।

সেই আত্ম-প্রতিজ্ঞার সময় কিশোর ভগৎ সিং-এর চোখ দিয়ে অঝোরে ঝরে পড়তে লাগলো মুক্তোসম অশ্রুবিন্দু রাশি।*

তারপর জালিয়ানওয়ালাবাগের পবিত্র লালমাটি বোতলে পুরে নিয়ে ঘরে ফিরলেন ভগৎ সিং। রাখলেন যত্ন করে তুলে, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যেমন করে রাখেন গঙ্গা মৃত্তিকা।

সারা দেশের ওপর ইংরেজের এই যে আকাশ ছোঁয়া অপমান, অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার—সেই কথা চিন্তা করতে করতে জালিয়ানওয়ালাবাগের লালমাটি চোখে পড়লেই তিনি পেতে লাগলেন দেশের কাছে আত্ম-নিবেদনের সাহস ও অনুপ্রেরণা।

---

*পিউপিলস্ পাথ, মার্চ, ৫৮ইং, পৃঃ ৫৫

জালিয়ানওয়ালাবাগের ক্ষত শুকাতে না শুকাতে ১৯২১-এর জুলাই মাসে ঘটলো "মোপালা" বিদ্রোহ।*

সেই বিদ্রোহ দমন করতে ইংরেজ সরকার যে দমননীতি চালালো তার তুলনা বোধহয় খুব কমই আছে।

সেদিনের সেই ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর "মহাত্মা গান্ধী" গ্রন্থে বলেছেন (পৃঃ ১৫০-১৫৪):

"মোপালা কয়েদীদের গ্রীষ্মকালে মালগাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতে না ছিল হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা, না ছিল তাদের জন্য কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা। তৃষ্ণার যন্ত্রণায় অস্থির। গাড়ি কোন বড় স্টেশনে দাঁড়ালে কয়েদীদের চিৎকারে দরজা খোলা হয়। সে এক বীভৎস দৃশ্য। বেশ কিছু কয়েদী মৃত। সিরাজ-দ্দৌলার অন্ধকূপ হত্যা কাল্পনিক। এখানে ঘটলো বিংশ শতাব্দীতে সত্যিকার অন্ধকূপ হত্যা।"

ফলে, ১৯২০ সালে সারা ভারতে খিলাফত কমিটির ব্রিটিশ বিরোধী আহ্বান ছড়িয়ে যায়। তারপর ক্রমশঃ সেই আহ্বানের ঢেউ ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের মালাবার সমুদ্র তটভূমিতে এসে আছড়ে পড়ে।

এই মালাবার উপকূলে উনবিংশ শতাব্দী থেকে কিছু আরব দেশীয় লোক বসবাস সুরু করেছিল।

কালক্রমে তারা দ্রাবিড় ও নিম্নবর্ণের হিন্দু রমণীদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় যে সন্তান গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় তাদের

---

*বিগত মহাযুদ্ধের সময় তুর্কীর সুলতান-এর ক্ষমতা খর্ব করার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডের ইংরেজ সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ভারতের মুসলমানগণ শঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ হন। কারণ, তুর্কীর সুলতান কেবল যে তাঁদের স্বধর্মী ছিলেন এমন নয়। উপরন্তু, তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর মুসলমানদের ধর্মীয় প্রধান। উপাধি "খলিফা"।

বলা হল "মোপালা"। এই দুরন্ত মোপালাদের চরিত্র ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হচ্ছে :—

"The Moplas were bitter; bitterly anti-Hindu, bitterly anti-British, bitter against the world that gave them only misery. Their ardour was the ardour of religious fanaticism destroying sin and establishing a kingdom of good."

(W. C. Smith, Modern Indian in India P. 235)*

এই দুর্ধর্ষ মোপালারা ছিল সাংঘাতিকভাবে হিন্দু ও ইংরেজ বিদ্বেষী। এমন কি, যে পৃথিবী থেকে তারা পেল না কোন সহানুভূতি, সুখ ও আনন্দ সেই পৃথিবীর প্রতিও তাদের বিদ্বেষ-বহ্নি ছিল অক্ষুণ্ণ। তারা কেবলমাত্র উৎসাহী ছিল ধর্মান্ধতার প্রজ্বলিত হোমশিখায় সকল পাপ বা সকল অবিচার নিষ্করুণ-ভাবে ভস্মীভূত করে সুখ-শান্তি ও আনন্দের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে।

* * * *

১৯২৪-এর ১লা মার্চ তারিখে বাংলার রক্ত-পাগল তরুণ দলের মুখপাত্র বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা চুম্বন করলেন ফাঁসির রজ্জু।

স্থান : কলকাতার প্রেসিডেন্সী কারাগার।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট মনে করে মিঃ ই. ডে নামে এক ইংরেজকে কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করার অভিযোগে।

মৃত্যুর আগে তিনি বললেন :

"যতদিন পর্যন্ত দেশে চাঁদপুর ও জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যা-চারের তীব্র স্রোতধারা ইংরেজ সরকার চালিয়ে যাবেন ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের হত্যাকাণ্ড বন্ধ হবে না।"

---

*হাউ ইণ্ডিয়া স্টাগলড ফর ফ্রীডম, পৃ ৩২৫।২৬ (রামগোপাল)

বীর গোপীনাথের ফাঁসির পর সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে শহীদ গোপীনাথের সাহস ও ত্যাগের প্রশংসা করে গৃহীত হল এক প্রস্তাব।

সভাপতি ছিলেন আক্রাম খাঁ।

উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস ও আলিপুর বোমার মামলার আসামী ইন্দ্রনাথ নন্দী।

* * * *

এই ১৯২৪-এ স্থাপিত হল হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসন—বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের উদ্যোগে—কলকাতায়।

(জেলে ত্রিশ বৎসর, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী)

* * * *

এই ১৯২৪-এর ২৫শে অক্টোবর কলকাতার পৌরসভার প্রধান কর্মসচিব সুভাষচন্দ্র হলেন তিন আইনে ধৃত। মান্দালয়ে নির্বাসিত হলেন। (ইতিপূর্বে ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আইন-অমান্য আন্দোলনে ধৃত হয়েছিলেন।)

এই নির্বাসন কালে তাঁর স্বাস্থ্যের ঘটে অবনতি। প্রকাশ পায় ক্ষয়রোগের লক্ষণ !

সুভাষের গ্রেপ্তার উপলক্ষ্যে—"স্টেটস্‌ম্যান" ও "ইংলিশম্যান" লিখলেন :—

"সুভাষচন্দ্র বৈপ্লবিক চক্রান্তের মস্তিষ্ক স্বরূপ।"

কলকাতার পৌর পিতা তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।

সুভাষ সম্পর্কে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান কাগজের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি পৌরসভার অধিবেশন কালে বললেন :—

"দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয়, তবে আমি অপরাধী। কলকাতার পৌরসভার প্রধান সচিব যদি অপরাধী হন তবে আমিও ঘোষণা করছি যে, পৌরসভার নায়কও একজন অপরাধী।"

"If love of country is a crime, I am a criminal. If the chief executive officer is criminal, then I declare that the Mayor is also a criminal."

১৯২৬ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বাবর্ আকালি-দল বা চক্রবর্তী মামলায় ৫০ জন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হন। তার মধ্যে পাঁচজনার হয় ফাঁসির আদেশ। এগারো জনার হয় দ্বীপান্তর।

যাঁদের ফাঁসির আদেশ হয় তাঁরা হলেন :—

কিষাণ সিং, করম সিং, নন্দা সিং, শান্তা সিং, দলীপ সিং।

জলন্ধরের ২।৩৫ সংখ্যক শিখ-সৈন্য বাহিনীর প্রাক্তন হাবিলদার কিষাণ সিং গদগাজ-এর নেতৃত্বে যে বিদ্রোহী দল গঠিত হয় ১৯২১ সালে, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল : ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া। ব্রিটিশ শক্তির উচ্ছেদ সাধন করা আর মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা।

এই দুরন্ত শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কানপুরের "প্রতাপ" পত্রিকায় ভগৎ সিং লিখেছিলেন ১৫-৩-২৬ তারিখে :

"হোলির দিনে রক্ত আরও রক্ত চাই !"

"Blood, Blood on the holi-day !"

* * * *

ভগৎ সিং যখন লাহোরের জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন সেই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন জয়চাঁদ বিদ্যালঙ্কার। যিনি ছিলেন বিপ্লবী শচীন সান্যালের সতীর্থ। তিনিই ভগৎ সিং-কে বিপ্লবী দলে দীক্ষিত করেন। এখানেই ভগৎ সিং ভাই পরমানন্দের ন্যায় আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষকের স্পর্শ লাভ করেন।

১৯২৪-এর মার্চ-এপ্রিল মাসে যখন তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেন তার প্রিয় আত্মীয়-স্বজন—তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো।

কিন্তু যিনি দেশের জন্য আত্মসমর্পিত, উৎসর্গীকৃত, তিনি কী করে ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির ক্ষুদ্র গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ করবেন ?

না, তাঁর কোন নৈতিক অধিকার নেই বিবাহিত জীবনের সস্তা-বিলাসের। অধিকার নেই একটি অচেনা মেয়েকে তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের অনিশ্চিত পদক্ষেপের মধ্যে টেনে আনার।

ভগৎ সিং ভাবলেন বিপ্লবীর এই ক্ষুরধার বিপদসঙ্কুল পথে মরতে তো একদিন হবেই হবে।

তবে আর এসব কেন ?

তবু পরামর্শ চাইলেন অধ্যাপক জয়চাঁদের।

আলোচনা করলেন অধ্যাপকের সতীর্থ শচীন্দ্র সান্যালের সঙ্গে।

তারপর বিপ্লবী শচীন্দ্র সান্যালের এক চিঠি নিয়ে মনস্থির করে তিনি লাহোর ছেড়ে উপস্থিত হলেন কানপুরে। দেখা করলেন যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

সেখানে প্রথমে রইলেন এক "বাঙালী" মেসে।

তাতে লোকের চোখে পড়ার বেশি সম্ভাবনা থাকায়—স্থান পরিত্যাগ করে উঠলেন গিয়ে কানপুরের "প্রতাপ" পত্রিকার কার্যালয়ে।

যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতা ও বিপ্লবীদের দুর্দিনের বন্ধু গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর পৃষ্ঠপোষকতায়, সক্রিয় সহায়তায়।

এমনিভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন স্থায়িভাবে। দেশের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিতে।

এলো ১৯২৬।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদ্বয় অনন্ত হরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী গোয়েন্দা সর্দার ভূপেন চ্যাটার্জীকে আলিপুর জেলের ভেতরে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে হত্যা করার অভিযোগে হলেন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত।

১৯২৬-এর ২৮শে সেপ্টেম্বর ওরা খুশি মনে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করে জীবন দিলেন "বন্দেমাতরম" বলে।

* ॰ * *

এবার ঘরছাড়া ভগৎ সিং-এর সেদিনের সেই নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারার তরুণ প্রাণের উচ্ছ্বাস, উদ্বেগ, আকাঙ্ক্ষা, আশা ও দুরন্ত আবেগধারার দিকে তাকালে দেখি যে, কবি রবীন্দ্রনাথের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতায় উচ্চারিত মর্মর ধ্বনির সঙ্গে যেন কোথায় একটা প্রচ্ছন্ন মিল রয়েছে, যেখানে কবি বলেছেন :—

"আমি যাব, আমি যাব কোথায় সে কোন দেশ
জগতে ঢালিব প্রাণ, গাহিব করুণা গান
উদ্বেগ অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।
ওরে চারিদিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর।
ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, ভাঙ্গ কারা, আঘাতে
আঘাত কর।"

এই, ১৯২৬-এ গঠিত হল নব-জীবন ভারত সভা, সশস্ত্র বিপ্লবের "বীজ" বপন করতে। ভগবতী চরণ ভোরা হলেন দিবা-রাত্রির সাথী।

তখন ভগৎ সিং-এর বয়েস হবে ১৯। স্নান-আহার-বেশভূষা গেল চুলোয়।

কেবল ম্যাজিক ল্যানটার্নে আর স্লাইডের সাহায্যে দেশের বাণী দেশের কাছে উপস্থিত করার কাজ চললো পুরোদমে।

ওঁরা বলতে লাগলেন সভায়-সমিতিতে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শত শহীদের অমর আত্মবলিদানের কথা। হীন, বর্বর, শোষক ইংরেজের অত্যাচারের অমানুষিক কাহিনী।

শোনাতে লাগলেন : শহীদ কর্তার সিং সরাবার শেষ ভাষণের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। সেদিনের কর্মকেন্দ্রগুলির অন্যতম ছিল লাহোর খাদী ভাণ্ডার, পরিমহল, পাঞ্জাব ন্যাশনাল কলেজ।

দেশের কাজে আত্মসমর্পিত ভগৎ সিং এমনি একসময়ে মা বিদ্যাবতীকে একটি চিঠি লেখেন

Dear Mother,

My country needs me. My country's work is calling me. The country is in slavery. Slavery has given rise to hunger & starvation. Due to the existence of British imperialism Indians are not regarded as human beings. To win the country's freedom, we have to embark upon big projects. The country is to be made free and after freedom a new India is to be built, palatial buildings are to be constructed in place of huts. When the country will be free, I shall marry.

ভাবানুবাদ

মা-মণি,

আমাকে আজ দেশের বড় প্রয়োজন। যে দেশ আজ পর-পদানত তার আহ্বান আমি শুনতে পাচ্ছি। জানো মা, আমাদের সোনার দেশের বুভুক্ষু ও অনাহারের মূলে রয়েছে এই পরাধীনতার হীনতা। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা আমাদের তো মানুষ বলেই গণ্য করে না। তাই পরাধীন ভারতের শৃঙ্খলতার মুক্ত করতে আমাদের অনেক অনেক বড় কাজ করতে হবে।

আগে দেশকে স্বাধীন করি, তারপর গড়ে উঠবে নব-ভারত।

তখন দেশের মাটিতে কুড়েঘরগুলির বদলে দেখতে পাবে দাঁড়িয়ে আছে চোখ জুড়ানো প্রাসাদ—একটির পর একটি।

আর সেই স্বাধীন ভারতের স্বাধীন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে তোমার ভগৎ-এর বিয়ে।

তার আগে নয়।

ইতি—

তোমার ভগৎ।

কাকোরী ট্রেন ডাকাতি বা ষড়যন্ত্রের মামলার আসামী ও দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবী রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ১৯২৭-এর ১৭ই ডিসেম্বর গোণ্ডা কারাগারে ফাঁসিতে দিলেন জীবন বিসর্জন।

বিপ্লবী আসফাকুউল্লা ফয়জাবাদ কারাগারে, আর বিপ্লবী রামপ্রসাদ বিসমিল গাইলেন ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গোরক্ষপুর কারাগারে। ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৭।*

ঠাকুর রোশন সিং নিজেকে ফাঁসি-রজ্জুতে আহুতি দিলেন ভারত উদ্ধারের চেষ্টায় নাইনি কারাগারে। ২১শে ডিসেম্বর, ১৯২৭।

এগিয়ে এল ১৯২৮।

১৯২৪ সালে গড়া হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের তখন শোচনীয় অবস্থা।

ইতিমধ্যে কাকোরী ট্রেন ডাকাতি ও অন্যান্য রাজনৈতিক মামলা উপলক্ষে বহু কর্মী ও নেতা হয়েছেন গ্রেপ্তার।

সুতরাং কমিটির অভাব চতুর্দিকে।

* ১৯ ডিসেম্বর, ১৯২৭ (শ্রীনরেন্দ্র কুমার যোশী সম্পাদক, পিউপিলস্ পাথ, জলন্ধর)

অভাব পরিচালনায়, অভাব কর্মীর, অভাব সংগঠনের, অভাব অর্থের, আর অভাব দুর্দমনীয় সাহসের।

১৯২৪ সালে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের যে উদ্বোধন বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছিল.এই শ্বেত-পত্রে :—

"White-Paper"

"The object of the Association is to establish a federated Republic of the states of India by an organised and armed revolution, that the final form of constitution of the Republic be framed and declared by representatives of the people at the time when they will be in a position to enforce their decision that the basic principle of the Republic shall be universal sufferage & the abolition of all systems which make exploitation of man by man possible."

॥ হিন্দুস্থান প্রজাতান্ত্রিক সমিতি ॥

"সুগঠিত সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই হল এই সমিতির উদ্দেশ্য।

ভারতীয় জনসাধারণ যখন তাদের প্রতিনিধিদের . মারফৎ নিজেদের মতামত রূপায়িত করতে সক্ষম হবে, তখন রচিত হবে এর মূল শাসনতন্ত্র।,

এই শাসনতন্ত্রের আসল ভিত্তি হবে সর্বপ্রকার মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং বর্তমানে প্রচলিত মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন।"

এই হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাম্যবাদী নেতা সৌকত ওসমানি বলেছেন :—(৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬৭, কম্পাস, সাপ্তাহিক পত্রিকা)

"১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কানপুরে বোলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা চলার সময় সর্বপ্রথম হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি (এসোসিয়েসন্) সোভিয়েট বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হয়।

কানপুরে পরলোকগত রাধেমোহন গোকুলজীর বাড়িতে উত্তর প্রদেশের বিপ্লবীরা মাঝে মাঝে বৈঠকে মিলিত হতেন। হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মির কানপুর শাখার সদস্যরা এ সময়ে তাঁদের সংস্থার নামের সঙ্গে সোসালিস্ট শব্দটি জুড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ সংস্থা সামরিক কায়দায় গড়ে উঠেছিল। তাই এ সংস্থার নামকরণে সোসালিস্ট এবং আর্মি শব্দটিও পাশাপাশি সংযোজন করা হয়েছিল।······সে সময় কানপুরে থাকাকালে আমি রোজ বিকেলের দিকে গোকুলজীর বাড়িতে যেতাম—আর সেখানে সমবেত তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে সাম্যবাদ সম্পর্কিত নানা রকমের তত্ত্বগত আলোচনা হত। এ আলোচনার সময় কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক বিপ্লবীরাও উপস্থিত থাকতেন।"

এ যুগে ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে কার্ল মার্ক্সের কমিউনিস্ট "ম্যানিফেস্টো" পথবর্তিকা হয়ে ওঠে।

বিপ্লবীরা ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পথ ছেড়ে দিয়ে গণ-সংগ্রামের পথ অনুসরণের কথা ভাবতে সুরু করলেন। এ ভাবনা ও চিন্তা থেকেই তাঁরা হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মির নাম বদলে "হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি" রাখেন।

বিভিন্ন সময়ে বিজয়কুমার সিনহার মাধ্যমে এই গোকুলজীর বাড়িতেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়—বটুকেশ্বর দত্ত, অজয়কুমার ঘোষ, সুধীন্দ্রনাথ পাণ্ডে, চন্দ্রশেখর আজাদ, সর্দার ভগৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে।

এরপর তিনি বলেছেন : "কমিনটার্ণের ষষ্ঠ কংগ্রেসে যোগদানের প্রাক্কালে বিজয়কুমার সিনহা আমাকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা সোভিয়েটের কাছে অস্ত্র-শস্ত্র চান।"

শ্রীওসমানি আরও বলেছেন : "সে সময় মৌঃ মহম্মদ আলি, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার উভয়েই তাঁকে বলেছিলেন যে—ওঁরা সোভিয়েট সামরিক সাহায্য পেতে আগ্রহশীল।"

শ্রদ্ধেয় মদনমোহন মালব্য পর্যন্ত আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁকে বলেছিলেন : "যদি এই অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে রুশ বাহিনী ভারতে প্রবেশ করে তবে আমি পেশোয়ারে উপস্থিত হয়ে তাকে স্বাগত জানাব।" "I shall go to Peswar to receive the Russian Army if it comes to India & rescues us from this tyranny."

"কম্পাসে" প্রকাশিত ১৯২৭-এর ২রা ডিসেম্বর তারিখে তিনি আরও বলেছেন :—

"১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসের দিকে কমরেড স্টালিনের* সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার ঘটে। ভারতে বিপ্লবীদের সাহায্য দান ও সহায়তার ব্যাপারে ইতিপূর্বে সোভিয়েট সেনানীদের ও বুখারিনের সঙ্গে আলোচনা হয়ে গেছে।......তবে সোভিয়েট সেনানীরা আমাকে এই মর্মে আশ্বাস দিলেন যে, যদি ব্রিটেন আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে তুর্কীস্তানের দিকে অভিযান করে, তাহলে সোভিয়েট বাহিনী পামীরের দিকে এগিয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত খাইবার গিরিপথে প্রবেশ করবে।

আমাকে বলা হল, সেই সময় যেন ভারতীয় বিপ্লবীরা তাঁদের স্বাধীনতা আন্দোলন আরও জোরদার করেন।

সেই সময় ও সেই মুহূর্তের জন্য যেন ভারতীয় বিপ্লবীরা প্রস্তুত

---

*রাশিয়ার সর্বময় কর্তা

থাকেন। একথাটা আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন সেদিনকার সোভিয়েট সেনানীরা।

সোভিয়েট সেনানীরা আমাকে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তা ভারতে ফিরে এসে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি সংগঠনের সদস্যদের জানাবার সুযোগ আমি পাইনি।

আমার ভারতে উপস্থিত হবার পর থেকে ৮৭ দিনের মধ্যে (অর্থাৎ ১৯২৮ সালের ২২শে নভেম্বর থেকে ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ পর্যন্ত) আমি কিছুতেই বিজয়কুমার সিনহা ও ভগৎ সিং-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারিনি।

তারপর……১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়।"

এ হেন হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের চরম দুর্দিনে একদিক থেকে এগিয়ে এলেন কাকোরী ট্রেন ডাকাতি মামলার ফেরারী দুর্ধর্ষ বিপ্লবী নায়ক চন্দ্রশেখর আজাদ। অপরদিকে, আদর্শবাদী, গৃহত্যাগী, ন্যায়নিষ্ঠ, বিপ্লবী ভগৎ সিং।

পরস্পর মেলালেন হাতে হাত।

এই মণি-কাঞ্চনের সংযোগে সমিতির ভাঙা হাড় লাগলো জোড়া।

হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসন আবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

তার পরিণতিতে ১৯২৮-এর আগষ্ট মাসে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সমিতি হল পুনর্গঠিত। নব-উৎসাহে, প্রেরণায় ও সাহসে।

সমিতির নামেরও হল কিছু সংশোধন। কিছু পরিবর্তন। কিছু পরিবর্ধন। হল "হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েসন"।

তারপর বিভিন্ন প্রদেশের কাজের সুবিধে ও পরস্পারের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার আনুকূল্যে স্থির হল :—

ভগৎ সিং ও শুকদেব ভারপ্রাপ্ত হলেন পাঞ্জাব প্রদেশের। চন্দ্রশেখর আজাদ ও শিব বর্মাকে দেওয়া হল যুক্তপ্রদেশের দায়িত্ব। বিহার, উড়িষ্যা, রাজপুতানা ও অন্যান্য জায়গার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন অন্যান্য সব বিপ্লবী বন্ধুগণ।

সৈন্যাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন চন্দ্রশেখর আজাদ।

ভগবতীচরণ ভোরা হলেন ভগৎ সিং-এর প্রধান সহকারী।

এসব ভারপ্রাপ্ত কর্মীগণ যাঁর-যাঁর এলাকার জন্য দায়ী থাকবেন বলে স্থির হল। এলাকার বাইরে কিছু করতে হলে কেন্দ্রীয় সমিতির অনুমতি ছাড়া করা যাবে না। আর সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র জমা থাকবে কেন্দ্রীয় সমিতির কাছে। প্রয়োজনমত সেখান থেকে যথাস্থানে সেগুলি পাঠান হবে।

আর্থিক ব্যাপারের দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় সমিতির।

এ সময় ইংরেজ সরকার "সাইমন-কমিশন" নামে একটি কমিটি গঠন করলেন। তাদের কাজ হল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ঘুরে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির হাল-চাল প্রত্যক্ষ করা। আর তার ভিত্তিতে সরকারকে শাসনতন্ত্রের সংশোধনের জন্য পরামর্শ দেওয়া। সভ্যদের নাম হল :

১। স্যার জন সাইমন (সভাপতি)

২। ভিসকাউন্ট বার্নহাম

৩। লর্ড ষ্ট্রাথকোনা

৪। মাননীয় এডওয়ার্ড কেডোগান

৫। মিঃ ষ্টিফেন ওয়ালস্

৬। মেজর ক্লেমণ্ট এটিলি*

৭। কর্নেল লেন ফকস।

পরে কমিটির পঞ্চম সভ্য মিঃ ওয়ালস পদত্যাগ করলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন মিঃ ভারনন হারতসোর্ণ।

এই "কমিশনে" ভারতের কোন রাজনৈতিক সংস্থার প্রতিনিধি না থাকায় এর কার্যকারিতা সম্পর্কে হতাশ হলেন জাতীয় কংগ্রেস।

তাই তাঁরা স্থির করলেন একে বর্জন করবেন।

সেই মর্মে সর্বত্র প্রেরিত হল গোপন নির্দেশ।

স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে কমিশন যেদিন লাহোরে উপস্থিত হল, সেদিন ৩০শে অক্টোবর, ১৯২৮।

সমগ্র লাহোরবাসী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পতাকা তুলে হাজির হলেন লাহোর রেল স্টেশনে।

হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের নওজোয়ান বিপ্লবী সভ্যবৃন্দও ছিলেন এই বিক্ষোভ মিছিলের পুরোভাগে।

সত্যি করে বলতে গেলে তাঁরাই ছিলেন ভেতরে ভেতরে প্রধান উদ্যোক্তা। তাই রিপাবলিকান পার্টির নবীন সভ্যদের কর্মতৎপরতায় সহরে চমৎকারভাবে "হরতাল" পালিত হল। "সাইমন ফিরে যাও" ধ্বনিতে সমগ্র সহর মুখরিত হল।

সেদিন পাঞ্জাব তথা ভারতের শ্রদ্ধেয় নেতা লালা লাজপত রায়ও ছিলেন মিছিলের পুরোভাগে। পুলিস যখন সাইমন বিরোধী মিছিলের জনসমুদ্রের মধ্যে দিয়ে সাইমন কমিটির সভ্যদের নিয়ে যেতে অসমর্থ হল তখন জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য চালনা করা হল লাঠি। কোন বিচার না করে, কোন বিবেচনা না করে। কিন্তু আশ্চর্য! তবু জনতাকে হটান গেল না।

---

*পরে যিনি ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হন এবং ভারতকে স্বাধীনতা দেন
ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল : সুভাষচন্দ্র বসু

পুলিসের স্থপারিনটেনডেণ্ট মিঃ স্কট দূর থেকে লক্ষ্য করলেন যে, লালাজীকে ঘিরে রেখেছে এক দল তরুণ স্বেচ্ছাসেবক দল। আর তিনিই পরিচালনা করছেন সমগ্র বে-আইনী জনতাকে। তাই মুহূর্তে জ্বলে উঠলেন মিঃ স্কট। ইঙ্গিত করলেন অন্যতম পুলিস প্রধানকে সেই দিক লক্ষ্য করে লাঠি চালাতে।

সেই ইঙ্গিতের মর্ম গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের ডেপুটি স্থপারিনটেনডেণ্ট মিঃ স্যাণ্ডার্স দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে পুলিসকে লাঠি চালাবার হুকুম দিলেন। তারপর নিজে লালাজীর বুকে, মুখে চালালেন বেপরোয়া ঘুষি। মাথায়ও পড়লো লাঠি।

বৃদ্ধ লালাজী, নিজের অক্ষম দেহের ওপর ব্রিটিশ পশুশক্তির এই অমানুষিক বর্বরতা প্রত্যক্ষ করে, নিরীহ জনসাধারণকে এই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার তাগিদে নিরীহ ও অহিংস জনতাকে ছত্রভঙ্গ হতে অনুরোধ জানালেন।

সেদিন সন্ধ্যায় কংগ্রেসের ত্বরিত আহ্বানে এক মহতী জন-সভায় পুলিসের এই জঘন্য আচরণের প্রতিবাদ জানান হল।

আহত লাজপত রায় সেখানে উপস্থিত হয়ে লাহোরের অন্যতম ডেপুটি পুলিস স্থপার মিঃ নিলকে দেখে বললেন ঃ

"যে সরকার নিরীহ প্রজাসাধারাণকে বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ করে, তাদের আর যাই হোক, সভ্যতার বড়াই করা সাজে না। আর কেবলমাত্র অত্যাচারের শাসন দ্বারা কোন সরকারই বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। আমার ওপর যে বর্বর আক্রমণ চালান হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের সূচনা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাছি।"

লালাজীর ভাষণ শুনে ডেপুটি পুলিস স্থপার মিঃ নিল, সেদিন খোলা ময়দানে হোঃ হোঃ শব্দ করে খুব বিদ্রূপের হাসি হেসেছিলেন। মদগর্বী পুলিস কর্মচারীর পক্ষে তাই ছিল স্বাভাবিক। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্তমিত হয় না—সেই প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ সরকারের অন্তিম দশা ঘনিয়ে উঠতে পারে মাত্র কয়েকজন অহিংস

সত্যাগ্রহীর উপস্থিতিতে কিংবা প্রতিবাদে, এমন কথা সুস্থমস্তিষ্কের পরিচায়ক নয়। তাই মিঃ নিলের ঐ অট্টহাসি!

দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন ৩০শে অক্টোবর লালাজীর ওপর যে জঘন্য ও কাপুরুষোচিত আক্রমণ চালনা করা হয়েছিল, তার পরিণামে ১৯২৮-এর ১৭শে নভেম্বর তারিখে লালাজীর হঠাৎ মৃত্যু ঘটলো।

মিঃ জিন্না এই সাইমন কমিশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে একসময় বলেছিলেন যে, "জালিয়ানওয়ালাবাগ ছিল কসাই-এর হত্যাকাণ্ড, আর কমিশন হল "আত্মার হননকারী"।

ওদিকে লালাজীর মৃত্যুসংবাদে সমগ্র দেশ, বিশেষ করে, পাঞ্জাবের জনসাধারণ শোকে-দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লো। কিন্তু প্রতিকারে অসমর্থ জনগণের এই বেদনাবোধ কোন পথের সন্ধান না পেয়ে ব্যর্থ আক্রোশে গুমরে মরতে লাগলো প্রত্যেকের হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে লক্ষ লোকের সমাবেশে লালাজীর অন্তিম-যাত্রা চললো দাহস্থানের দিকে। তারপর দাহকার্যের পূর্বে আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি পালন করার পর শত-কণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে তাঁর নির্জীব দেহ তুলে দেওয়া হল সুসজ্জিত চিতায়। অগ্নি-সংযোগে সেই মরদেহ যখন ভস্মীভূত হচ্ছিল তখন সেই জ্বলন্ত চিতা-বহ্নির পাশে উপবেশন করে বিপ্লবী দলের নবীন সভ্যগণ সারা রাত ধরে শুধু এই কথা ভাবলেন :—কেন এমন হল? কেন এমন সাধু ও সজ্জন ব্যক্তির এমনি পরিণাম হল? কেন জনগণের আদর্শ নেতা এমনিভাবে অপমানে দগ্ধ হলেন? কোন দোষে? কোন অপরাধে?

রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই যে উত্তর তাঁরা পেলেন তাতে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, পরাধীন দেশের মানুষের মান-সম্ভ্রম, ইজ্জত বলে কিছু নেই। থাকে না। আর স্বাধীনতা হারানোই পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অপরাধ।

তখন তাঁরা আবার ভাবতে সুরু করলেন, এর উপায় কী? এই অত্যাচারের প্রতিকার কী? এই কঠিন সমস্যার সমাধান কোথায়?

এর একমাত্র সমাধান তাঁরা মৃত লালাজীর জ্বলন্ত চিতার লেলিহান অগ্নিশিখার ভেতর যেন ফুটে উঠতে দেখলেন। সে আর কিছু নয়, সে হল প্রতিশোধ গ্রহণ। আর তা সশস্ত্র পন্থায়।

সেই চিতা-বহ্নির উজ্জ্বল দীপ্তিতে যে জ্বলন্ত অক্ষর তাঁরা খুঁজে পড়তে পারলেন তাতে পরিষ্কার দেখা গেল, লেখা রয়েছে, বর্বর ইংরেজের পশুশক্তির কাছে যুক্তি নিষ্ফল। তাদের কাছে মনুষ্যত্বের নৈতিক শক্তির আত্মপ্রকাশ, মহান অভিব্যক্তি, দুর্বলের অক্ষমতার পরিচয় বহন করে মাত্র। শক্তিশালী বিদেশী শোষকদের কাছে অহিংসা নীতির মূল্য ছেলেখেলার সমান। হাস্যকর ঘটনা।

এই সকল পরিস্থিতির ভিতর রজনী প্রভাতে—সেদিন পবিত্র রাবি নদীর তীরে বিপ্লবীরা স্থির করলেন "স্কট" ও "স্যাণ্ডার্স" এই উভয় শত্রুকে নিঃশেষে সরিয়ে দিতে হবে এই ধূলার ধরণী থেকে। মুছে ফেলতে হবে তাদের নাম-ধাম-পরিচয় চিরতরে। তবেই লালাজীর আত্মা পাবে শান্তি, হবে সন্তুষ্ট।

দেশবাসীর প্রাণে জাগবে আশা ও বল-ভরসা। পরাধীনতার হীনতা থেকে আসবে এক নব প্রেরণা। ভীরুতা থেকে বেরিয়ে আসবে সাহস, শক্তি, বল। একটির পর একটি।

এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনার সার্থক পরিণতিতে বিপ্লবী সৈন্যাধ্যক্ষ চন্দ্রশেখর আজাদের উপস্থিতিতে হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিক আর্মির গুপ্তকেন্দ্র মোজাং* সদন-এর বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯২৮-এর ১০ই ডিসেম্বর তারিখে যে গোপন আলোচনা-চক্র বসে, তার ফলে মিঃ স্কট ও মিঃ স্যাণ্ডার্সের উপর মৃত্যু-দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হল। আর এই আদেশকে কার্যকরী করার জন্য চন্দ্রশেখর, শুকদেব, রাজগুরু, ভগৎ সিং ও জয়গোপাল গোপনে মিলিত হলেন। স্থির হল, জয়গোপাল শত্রুর গতিবিধির ওপর নিয়মিত লক্ষ্য রেখে অপরাপর বন্ধুদের খবর দেবেন।

---

*Mozang

১১ই ডিসেম্বর ও তারপর হু'দিন স্ক'টের যাওয়া-আসার ওপর রাখা হল তীক্ষ্ণ নজর। মৃত্যুদণ্ডাদেশ কাজে পরিণত করার জন্য ১৪ই ডিসেম্বর তারিখ হল চিহ্নিত। সময়ঃ বিকেল চারটে।

কিন্তু পরে এই তারিখ পরিবর্তন করে করা হল ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৮। সময় ঠিক থাকলো। আর স্থির হল যে, জয়গোপালের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে রাজগুরু ছুঁড়বেন রিভলবারের প্রথম গুলি।

ভগৎ সিং করবেন প্রয়োজনবোধে সাহায্য। সবার অলক্ষ্যে থেকে শত্রুর পাল্টা-আক্রমণের মোকাবিলা করবেন সৈন্যাধ্যক্ষ স্বয়ং চন্দ্রশেখর আজাদঃ কাকোরী ট্রেন ডাকাতি মামলার ফেরারী আসামী—দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও সেনাপতি।

আজাদের হাতে রইল শক্তিশালী মাউজার পিস্তল। ভগৎ সিং-এর কাছে থাকলো অটোমেটিক রিভলবার। রাজগুরুর পকেটেও তাই।

ক্রমে এগিয়ে এল ১৭ই ডিসেম্বর। সেই নির্ধারিত দিন।

লাহোর পুলিসের প্রধান ঘাঁটি ছিল লাহোরের প্রধান সড়কের ওপর। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড—দয়ানন্দ বৈদিক মহাবিদ্যালয়ের কাছে।

রাজগুরু সাইকেল চড়তে জানেন না বলে নির্দিষ্ট স্থানটিতে একটু আগেই এসে হাজির হলেন পায়ে হেঁটে।

অপর তিনজন এলেন ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। সময় তখন বেলা চারটে।

আজাদ দয়ানন্দ বৈদিক মহাবিদ্যালয়ের ভেতর রইলেন লুকিয়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মোটর সাইকেলে পুলিসের ডেপুটি সুপার মিঃ স্যাণ্ডার্সকে পুলিস ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে তক্ষুণি মহারাষ্ট্রীয় বীর রাজগুরু বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে স্যাণ্ডার্সের ঘাড় লক্ষ্য করে চালালেন রিভলবারের গুলি। সেই অব্যর্থ গুলির আঘাতে শত্রু স্যাণ্ডার্স

মাত্র একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ করার অবকাশ পেল জীবনের অন্তিম মুহূর্তে। তারপর ঢলে পড়লো সেখানেই।

ভগৎ সিং স্যাণ্ডার্সের মৃত্যু সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবার জন্য পর পর আরও পাঁচটি গুলি ছুঁড়লেন আহতের দেহ লক্ষ্য করে। এমনিভাবে বিপ্লবী পরিষদের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডাদেশ পালিত হল অক্ষরে অক্ষরে। নেওয়া হল শ্রদ্ধেয় নেতা লালাজীর হত্যার প্রতিশোধ।

পুলিস চৌকির নাকের ওপর ঘটে যাওয়া এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডে পুলিসেরা সদলে সচকিত হয়ে সাহায্যের জন্য সমস্বরে চিৎকার করতে লাগলো। ভ্রমণরত পুলিস সার্জেন্ট বা ইন্‌সপেক্টার মিঃ ফেরেনি ভূলুণ্ঠিত মিঃ স্যাণ্ডার্সের দেহরক্ষী চন্দন সিং সহ আততায়ীদের পশ্চাৎধাবন করলে ভগৎ সিং ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর ফেরেনির দিকে রিভলবারের অব্যর্থ তাক করলেন। আহত ফেরেনি মৃত্যুভয়ে নীল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে গেল পড়ে। এই জীবন নিয়ে খেলার মধ্যেও ভগৎ সিং-এর মুখে হাসি ফুটে উঠলো ভীত-সন্ত্রস্ত ফেরেনির হাল-চাল দেখে।

যাক, কাজ শেষ করে রাজগুরু ও ভগৎ সিং প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সাধারণ মানুষের চলার গতিতে সহজ পদক্ষেপে দয়ানন্দ বৈদিক মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে গেলেন এগিয়ে। কিন্তু তখনও ওঁরা শত্রুর নাগালের বাইরে যেতে পারেননি। তাই হেড কনষ্টেবল চন্দন সিংকে আরও পুলিস নিয়ে ভগৎ সিং ও রাজগুরুর পশ্চাৎধাবন করতে দেখা গেল।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী চন্দ্রশেখর আজাদ ধীরমস্তিষ্কে চন্দন সিং-এর অগ্রগতি লক্ষ্য করছিলেন। হাতে দুর্নিবার মাউজার পিস্তল।

পুলিসের দল পিস্তলের লক্ষ্যভেদের আঁওতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে সহসা আজাদ গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন : Halt!

সাধারণ পুলিসের দল শত্রুর এই আওয়াজ শুনে থমকে

দাঁড়ালো। চন্দন সিং কিন্তু নিষেধ না শুনে এগিয়ে এলো আরও এক পা। আর সঙ্গে সঙ্গে আজাদের পিস্তল গর্জে উঠলো—ক্রুম্, ক্রুম্!

আজাদের হাতের নিশানার তারিফ করে শত্রুপক্ষীয় লোকেরাও। কারণ, প্রতিটি গুলি নাকি তাঁর অব্যর্থ। একটিও বিফলে যায় না। একেবারে স্থির লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে তার নিজের কাজটি সমাধা করে।

বেচারা চন্দন সিং জানতো না কার হুকুম সে লঙ্ঘন করতে সাহসী হয়েছে। জানবে কী করে? সাহেবদের দেহরক্ষী হয়ে নিজেকে তাদের একজন বলে ধরে নিয়েছিল সে। তাই তার এই বিয়োগান্ত পরিণতি। সুতরাং ইষ্টদেবের নাম উচ্চারণ করে চন্দন সিং পিস্তলের গুলির সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো পথের মাঝে।

পর পর দুজন—মানুষের ভাগ্য এত সহজে বিপর্যস্ত হতে দেখে হেড কনষ্টেবল চন্দন সিং-এর সঙ্গী-সাথীরা আর কালবিলম্ব না করে দিল ছুট, একটি বারও পেছনে না তাকিয়ে। আর ভগৎ সিং, রাজগুরু ও আজাদ দয়ানন্দ বৈদিক মহাবিদ্যালয় হোস্টেলের ছাত্রদের সঙ্গে মিশে বেশ গল্প জমিয়ে বসলেন। তারপর সুযোগ বুঝে যে-যাঁর গুপ্ত আস্তানায় ফিরে গেলেন সহজভাবে। পথে রাজগুরুকে সাইকেলে করে কিছুটা পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন দুর্জয় বিপ্লবী বীর চন্দ্রশেখর আজাদ।

এই হত্যাকাণ্ড ঘটবার পূর্বাহ্নে দলের কাছ থেকে ভগৎ সিং একটি গোলাপী রঙের ইস্তাহার পেয়েছিলেন। তিনি তা সাধারণের মধ্যে যথারীতি বিলিও করে দিয়েছিলেন।

আততায়ীরা চলে যেতে না যেতেই পুলিস গোটা দয়ানন্দ বৈদিক মহাবিদ্যালয়ই ঘিরে ফেললো। আর চলাফেরার অন্য সকল রাস্তাও দিল বন্ধ করে। সারভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রত্যেককে খানাতল্লাশী করে দেখা হল।

দয়ানন্দ বৈদিক মহাবিদ্যালয় হোস্টেল এবং দৈনিক "প্রতাপ"

পত্রিকার কার্যালয় খুঁটে খুঁটে অনুসন্ধান করা হল। কিন্তু কোথাও কোন সূত্র পাওয়া গেল না।

রেল স্টেশনের আসা-যাওয়ার পথে সকল যাত্রীকে পুলিসের সম্মুখীন হতে হল। রেলগাড়িগুলি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। সহরে ঢোকার ও বাইরে যাবার পথে কড়া পুলিস পাহারা বসলো। সারা সহর গুপ্তচরে গেল ছেয়ে। রাবি নদীতীরের বিস্তীর্ণ বনভূমি পর্যন্ত পুলিস ফেরারী আসামী, কি তাঁদের সামান্য এক-আধটা গুপ্ত অস্ত্র-শস্ত্রের সন্ধানে তছনছ করে ফেললো। কিন্তু না, কোথাও শত্রুর কিছুমাত্র চিহ্ন নেই।

এ যেন এক ভৌতিক ব্যাপার! কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল, কিছুই ধরা যাচ্ছে না। ধরা গেল না। তবু ঘটনার তিন দিনের ভেতর ২০শে ডিসেম্বর, ১৯২৮ পর্যন্ত ২০ জনার মত নাগরিক পুলিসের সন্দেহে গ্রেপ্তার বরণ করলেন। তার মধ্যে অধিকাংশই স্কুল-কলেজের নিরীহ ছাত্র।

এই দুঃসাহসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু লাহোর কেন, সারা ভারতের পুলিস বাহিনীর মধ্যে এক অস্বস্তিকর শঙ্কা আর বিষাদের স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো।

সাধারণ লোক ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পারলেও ইংরেজের মৃত্যু ঘটায়—মোটের উপর আনন্দিত হল। কিন্তু সে আনন্দ প্রকাশ হলেই তো বিপদ! তাই নিঃশব্দে সেই আনন্দকে নিয়ে নিজেদের মনে মনে নাড়াচাড়া করা ছাড়া তখনকার মত তাদের আর কোন উপায় ছিল না।

এদিকে লোক-শিক্ষার জন্য, জনসাধারণের অবগতির জন্য, বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে এ ঘটনার আরও আভাষ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল। কারণ, দেশের লোক যদি জানতে না পারে তবে তারা কী করে এ পথের দিকে আকৃষ্ট হবে? কেন বিপ্লবীদের জানাবে সহানুভূতি? সুতরাং, বিপ্লবীদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা জানাতে হবে, বোঝাতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্যাণ্ডার্স ও চন্দন সিং-এর হত্যার চার দিনের মধ্যে লাল ইস্তাহারে লাহোর সহর লালে লাল হয়ে গেল।

— বিজ্ঞপ্তি —

আমলাতন্ত্র সাবধান

লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ হিসেবে জে. পি. স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করা হয়েছে। বৃদ্ধ লাজপত রায় ৩৫ কোটি লোকের পূজনীয় ব্যক্তি। সেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির বক্ষে আঘাত করার যে ঔদ্ধত্য কাপুরুষ স্যাণ্ডার্স দেখিয়েছে, তার চেয়ে দুঃখের ও লজ্জার ঘটনা আর কিছু হতে পারে না। বস্তুতপক্ষে, ও রকম ঘৃণিত অত্যাচারের দৃষ্টান্ত সারা ভারতের কলঙ্ক বই আর কিছু নয়। এই অপমান ভারতের প্রতিটি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও ভারতমাতার বীর সন্তানদের প্রতি যুদ্ধে লিপ্ত হবার আহ্বান স্বরূপ। সেই আহ্বানের যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, আশা করি, তাতে এতদিনে ইংরেজ রাজপুরুষগণ বুঝতে পেরেছে যে, ভারত তার অপমানের যথোচিত উত্তরদানে সম্পূর্ণ সক্ষম।

আর জাতি হিসাবে ভারত এখন মৃত বা হীনবীর্য নয়। ভারতের জনগণের ধমনীতে নূতন রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। নব-ভারত জাগ্রত হয়েছে। প্রয়োজনবোধে জীবন দিয়েও জাতির সম্মান রক্ষার জন্য সে বদ্ধপরিকর।

হে অত্যাচারী শাসক, এখনও সাবধান হও! অদূর ভবিষ্যতে জনগণের ভাবাবেগে আর আঘাত করার দুঃসাহস দেখিও না। তোমার কলুষিত হস্ত যেন এখানেই চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

মনে রেখো যে, ভারতকে চিরকালের জন্য নিরস্ত্র করে রাখার নিখুঁত পরিকল্পনা কায়েম থাকা সত্ত্বেও পিস্তল, রিভলবারের অভাব আমাদের হবে না। সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে যে পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্রের

প্রয়োজন হয়, আমাদের সংগৃহীত পিস্তল, রিভলবার সেই তুলনায় যথেষ্ট না হলেও আইন ও শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে তোমরা প্রায়ই যে ধরনের অপমানে জাতিকে অপমানিত করতে অভ্যস্ত রয়েছো, সাহসী হয়েছো, সেইসব অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার পক্ষে আমাদের অস্ত্র-ভাণ্ডারের পিস্তল, রিভলবার-এর সংখ্যা যথেষ্টই বলতে হবে।

ভারতের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ আমাদের আদর্শকে প্রকাশ্য-ভাবে যতই না-নিন্দা করুক, অথবা বিদেশী শাসক তার সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের সংগঠনকে যতই চূর্ণ করতে চেষ্টা করুক না কেন, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। কারণ, শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ হবেই।

তবে একথা আমরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে, এখন থেকে জাতির অসম্মান হতে পারে এমন যে কোন ঘটনার প্রতিবিধানে আমরা সদা-সর্বদা সজাগ ও যত্নবান থাকব। আর চারিদিকের দমননীতির বন্ধনহীন স্রোত কিংবা সীমাহীন অত্যাচারের মধ্যেও বিপ্লবের বহ্নিশিখাকে অনির্বাণ রাখতে পারব।

স্মরণ রেখো যে, কোমল সুগন্ধি ফুলের মালার মত সাদরে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে "বন্দেমাতরম্" বলে ঝুলে পড়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা বলে যাব "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্!"

মানুষকে হত্যা করতে হল বলে আমরা সত্যি দুঃখিত। কিন্তু যাকে আমরা "মৃত্যুদণ্ডে" দণ্ডিত করেছি, সে তো সেই নিষ্ঠুর, নীচ ও অন্যায় বিদেশী শাসন তথা শোষণযন্ত্রের একটি হাতিয়ার মাত্র। সুতরাং সেই হাতিয়ারকে ভেঙে চুরমার করা ছাড়া আমাদের সম্মুখে আর দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিল না।

ব্রিটিশশক্তি আজ নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সব চাইতে অত্যাচারী শক্তি। আর সে শক্তিকে আমরা চূর্ণ করবই।

পরিশেষে আমরা আবার বলছি যে, মানুষের রক্তপাত ঘটেছে বলে আমরা সত্যি দুঃখিত। কিন্তু যে বিপ্লব মানুষের প্রতি

মানুষের শোষণ চিরতরে মুছে দেয়, সেই বিপ্লবের কাজে এই রক্তপাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।"

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

স্বাক্ষর—বলরাজ।

অধিনায়ক, হিন্দুস্থান সোসালিস্ট

রিপাবলিক এসোসিয়েশন

পাঞ্জাব

* * *

ইতিমধ্যে লাহোর "ট্রিবিউন" পত্রিকা-সম্পাদক, ভারতের বিপ্লবী সংস্থার প্রধান সেনাপতি বলে কথিত এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। সেই চিঠিতে তাকে জানানো হল যে, তিনি আর তাঁর বিপ্লবী সাথীরা পুলিসী গ্রেপ্তার এড়িয়ে বহাল-তবিয়তে আছেন। তাঁদের কাছে প্রচুর পরিমাণে গোলা-বারুদ ও অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে। সুতরাং তিনি তাঁর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ যথারীতি চালিয়ে যেতে মনস্থ করেছেন।

১৯২৮-এর ২১শে ডিসেম্বর লাহোর ও শালিমার গেটের দেয়াল হাতে-লেখা ইস্তাহারে ইস্তাহারে ছেয়ে গেল। সেই ইস্তাহার মারফৎ তিনি জানালেন যে, তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য ইংরেজ সরকার যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, তিনি সেই পরিমাণ পুরস্কার ঘোষণার টাকার সঙ্গে আরও পাঁচ হাজার টাকা যোগ করতে চাইছেন।

যে বা যারা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হবে, এই অতিরিক্ত পাঁচ হাজার টাকা তিনি তাকে দিতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

তিনি আরও বললেন যে, বেচারী চন্দন সিংকে হত্যা করার ইচ্ছে তাঁদের ছিল না। কিন্তু সে তাঁর হুকুম অমান্য করেছিল বলে তাকে হত্যা না করে কোন উপায় ছিল না।

ভারতের বিপ্লবী-সংস্থার সেনানায়ক বললেন যে, রক্তের তৃষ্ণা তাঁর মেটেনি। আরও পাঁচদিন তিনি লাহোরে থাকার সঙ্কল্প করেছেন। পুলিসের সাধ্য থাকে তো তাঁকে ধরুক।

এ ধরনের ইস্তাহার পরবর্তী দু'সপ্তাহের ভেতর লাহোরের এখানে-সেখানে আরও দেখতে পাওয়া গেল।

*   *   *

স্যাণ্ডার্সের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করতে না পারার দরুন পুলিসী-তৎপরতা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগলো। তারপর সেই অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়াল যে, আজাদ, ভগৎ সিং ও রাজগুরুর সহর ত্যাগ না করলে গ্রেপ্তার এড়ানো অসম্ভব হয়ে উঠবে বলে প্রতীয়মান হল।

স্যাণ্ডার্স-হত্যার প্রথম কয়েকদিন পর্যন্ত সরকার হত্যাকারীদের পরিচয় সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছিল না। কিন্তু এই ইস্তাহারগুলি প্রকাশিত হওয়ায় কি সরকার, কি জনসাধারণ, সকলেই এবার বেশ বুঝতে পারলো, কে বা কারা হত্যাকাণ্ডের পেছনে আছে? ইস্তাহার-ই বা আসছে কোথা থেকে?

ক্রমবর্ধমান ইংরেজ-অত্যাচার ও ভারত-শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অন্তরে যে নিষ্ফল বেদনা থেকে থেকে গুমরে মরছিল, এবার সেখানে এক স্বস্তির লক্ষণ দেখতে পাওয়া গেল। সংগ্রামী দিগন্তে আশার ছায়াপাত হল যেন।

ওদিকে পুলিসের হাতে যাঁরা ধরা পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিপ্লবী শুকদেবের ভাগ্নে হংসরাজ ভোরাও একজন ছিলেন। তিনি প্রায় সব কথাই জানতেন। কিন্তু সাত দিন পরে তারা তাঁকে মুক্তি দিলেন। শ্রদ্ধেয় লালা লাজপত রায়ের হত্যাকারীদের একজনকে অন্তত পাল্টা হত্যা করতে বিপ্লবীরা সমর্থ হয়েছেন দেখে লোকের মনে যে সন্তোষ, যে খুশির জোয়ার উপচে পড়তে লাগলো, তার ফলে বিপ্লবীরা জনসাধারণের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেতে লাগলেন। এমন কি, গান্ধীজীর অহিংস নীতির প্রবল সমর্থক ডাক্তার গোপীচাদ ভার্গব পর্যন্ত বিপ্লবীদের অর্থভাণ্ডারে দু'শ টাকা চাঁদা পাঠিয়ে দিলেন।

এই বিপ্লবীদলের তখনকার প্রধান সেনানায়ক চন্দ্রশেখর

আজাদ ছিলেন বহুগুণের সমাবেশে পূর্ণ এক বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তি। সাহস ছিল তাঁর দুর্জয়। বুদ্ধি ছিল তাঁর শাণিত-তীক্ষ্ণ তরবারির মতো। অন্তরে ছিল দেশ-সেবার জ্বলন্ত বহ্নিশিখা।

লাহোর যখন পুলিসের গুপ্তচরে ছেয়ে গেছে, তখন সেখান থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠলো দেখে মনে মনে তিনি এক অভিনব ফন্দি আঁটলেন। ফলে, দেখা গেল কিছু প্রবীণ ব্যক্তি মথুরার পথে তীর্থযাত্রী হিসেবে চলেছেন।

পাণ্ডা হলেন ফেরারী বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ।

এই সাজানো ধর্মভীরু ব্যক্তিটি তীর্থযাত্রীদের প্রধান পুরোহিত হিসেবে কিন্তু দিব্যি পুলিসের চোখের ওপর দিয়ে সহর ছেড়ে নূতন গুপ্ত আশ্রয়ে পালাতে সক্ষম হলেন।

কিন্তু ভগৎ সিং তখনও লাহোরে।

তিনি এক বিপ্লবী পরিবারের লোক ছিলেন বলে বহু লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তার ওপর একজন শিখ হিসেবে রয়েছে তাঁর লম্বা চুল আর গাল-ভরা দাড়ি। সুতরাং গোপনে পলায়িত জীবন যাপন কালে তিনি নিজে নিজের কাছেই হয়ে উঠলেন মহা সমস্যা বিশেষ।

কিন্তু বিপ্লবাদের কাছে কোন সমস্যাই সমস্যা নয়।

তাই তিনি অবিলম্বে তাঁর সহজ চিহ্নিত বেশভূষা পাল্টিয়ে ফেললেন।

চুল-দাড়ির মায়া-মোহ কাটালেন।

মূল্যবান সাহেবি পোশাক পরলেন। চুল ছাটলেন ছোট করে সাহেবি কায়দায়। গলায় রঙীন টাই আঁটলেন। হয়ে গেলেন অভিজাত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের একজন।

কিন্তু তারপর?

এতে কি পার পাওয়া যাবে?

যাবে হয়তো।

কিন্তু যদি না যায়?

তাই আরও সতর্ক হলেন। আরও সাবধানী হলেন।

পরিকল্পনা তৈরি হল সেই পথ ধরে।

তখন দেখা গেল তাঁর সাথী হয়েছেন একজন মহিয়সী নারী।

তিনি আর কেউ নন। তাঁর বিপ্লব-জীবনের সহকারী ভগবতী চরণের স্ত্রী।

তিনি এগিয়ে এলেন সহাস্যমুখে। বিপদের ঝুঁকি পুরোপুরি মাথায় নিয়ে। স্ত্রী সাজতে—স্ত্রীর অভিনয় করতে। কর্তব্যের খাতিরে। বিপ্লবের প্রয়োজনে। সঙ্গে চললো ভগবতী চরণের শিশুপুত্র। আর নিজে হলেন ছায়াসঙ্গিনী। ছেলেকেও বলা হল অভিনয় করতে। শেখান হল ভগৎ সিংকে "পিতা" বলে সম্বোধন করতে। কিন্তু রাজগুরু?

তাঁর কি হবে? তিনি পুলিসের ব্যূহ ভেদ করবেন কি করে?

ঠিক আছে। রাজগুরু হবেন অনুগত "ভৃত্য"।

এমনি করে শত পুলিসের সন্ধানী দৃষ্টির সম্মুখে ওঁরা সকলে মিলে চললেন লাহোর রেল স্টেশনে। পকেটে রইলো টোটা ভরা রিভলবার।

লাহোর থেকে এলেন লক্ষ্ণৌ রেল স্টেশনে।

সেখানকার বিশ্রামাগারে কিছুটা সময় কাটিয়ে ভগৎ সিং উঠলেন কলকাতাগামী ট্রেনে। আর রাজগুরু গেলেন অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে।

* * * *

দুর্গাদেবী ভোরা যখন সাগ্রহে ভগৎ সিং-এর স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করতে এগিয়ে এসেছিলেন তখন ভগৎ সিং তাঁকে সতর্ক করার জন্য বললেন যে, দুর্গাদেবী কি এর সাংঘাতিক পরিণতির কথা স্থির-মস্তিষ্কে ভেবে দেখেছেন? ভেবে দেখেছেন কি, তিনি কী ভয়ানক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে যাচ্ছেন? ভেবেছেন কি শিশুপুত্রের ভবিষ্যৎ?

ভেবেছেন কি পুলিসী জুলুম, অত্যাচার আর কারাগারের কথা?

দুর্গাদেবী উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি সব জেনে-শুনেই এ কাজে পা বাড়িয়েছেন। সন্তানের কথাও ভেবেছেন।

তাছাড়া ভগৎ সিং নিজেও তো একজন মায়েরই ছেলে।

আর তা সত্ত্বেও তিনি নিজে যদি দেশের জন্য সব কিছুর মায়া পরিত্যাগ করে এগিয়ে যেতে পারেন, তবে অন্য ছেলের মা-ই বা কেন পারবেন না ?

দুর্গাদেবীর এই উত্তরে ভগৎ সিং খুশি হয়ে তাকে সঙ্গিনী করে নিতে আর আপত্তি জানাননি।

তারপর ওঁরা যখন সতর্ক পুলিসী দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে নির্বিঘ্নে কলকাতা পৌঁছলেন তখন খানিকটা অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেলেন যে, স্বয়ং ভগবতী চরণ ভোরা তাঁদের স্বাগত জানাতে নিজে রেল স্টেশনে উপস্থিত হয়েছেন।

এদিকে স্বামী ভগবতী চরণ স্ত্রী দুর্গাদেবীর এই অসম সাহসিক কাজ নির্বিঘ্নে শেষ করতে পারার জন্য সগর্বে বলে উঠলেন,

"আজ সত্যি সত্যি তোমাকে আমার বিয়ে করা সার্থক হল।"

এরপর হাওড়া রেল স্টেশন থেকে ওঁরা চলে গেলেন সেণ্ট্রাল এভেনিউর ওপরে দাঁড়ানো স্যার সাজুরামের প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। সেখানকার গৃহ-শিক্ষিকা আর দলের সুশীলাদির নিরাপদ আশ্রয়ে। পুরো নাম যাঁর সুশীলা মোহন।

* * *

লাহোর ছেড়ে কলকাতায় এসে সঙ্গী রামশরণ দাসকে নিয়ে ফেরারী বিপ্লবী ভগৎ সিং দেখা করলেন অনুশীলন দলের নেতা ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও রবি সেনের সঙ্গে। ৭৯-বি, আপার সার্কুলার রোডে—নির্ধারিত সময়ে। ওঁরা কিন্তু ভগৎ সিং-এর কার্য-পদ্ধতির প্রতি তেমন উৎসাহ দেখালেন না।*

---

* (১) অনুশীলন দলের নেতা শ্রীরবীন্দ্রমোহন সেনের সঙ্গে লেখকের ও ও কিরণ দাসের।

এতে নিরাশ না হয়ে ভগৎ সিং দেখা করলেন প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে। মিলিত হলেন তরুণ বিপ্লবী কমল তেওয়ারি ও নীরব-কর্মী বৈজনাথ বিনোদের সঙ্গে। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট-এর আর্য সমাজের গৃহ-মন্দিরের চিলে কোঠায়। এঁরা দু'জনেই বিহারের লোক। আর দু'জনেই তখন বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। সেই সঙ্গে পরামর্শ হল যতীন দাসের সঙ্গে। এই দেখা-সাক্ষাতের ফলে সংগৃহীত হল আগ্নেয়াস্ত্র। স্থির হল বোমা তৈরি করার উপায়। সেই মর্মে বোমা তৈরি-বিশারদ বিপ্লবী যতীন দাসকে বলা হল আগ্রায় যেতে।

* * * *

এই ১৯২৯ সালে ভগৎ সিং গিয়েছিলেন বিজয় বসন্ত বসাকের বরানগরের বাড়িতে। পিতার অগ্নিযুগের বিপ্লবী-গুরু যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের পদধূলি নিতে।*

ভগৎ সিং কলকাতা থেকে ফিরলে পর দিল্লীতে হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের কেন্দ্রীয় সমিতির গোপন সভা বসলো। প্রস্তাব উঠলো যে, নিদ্রিত দেশকে জাগ্রত করার জন্য চমকপ্রদ কিছু করা দরকার।

প্রস্তাব শুনে কেউ কেউ উত্তরে বললো, "বেশ তো, সে না হয় করা যাবে। কিন্তু কাজটি কি? কিভাবে সারা দেশে সাড়া জাগানো যাবে?"

কেন? কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় "বোমা" নিক্ষেপ করে!

কথাটা "চমক" দেবার মত কথা বটে।

সুতরাং আলোচনার পর এই অভিনব প্রস্তাব গৃহীত হল। এবার প্রশ্ন হল কে যাবে এই দুঃসাহসিক কাজে?

একজন প্রস্তাব করলো রাজগুরুর নাম।

---

* (২) টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভলিউসনারিজ, উমা মুখোপাধ্যায়

ভগৎ সিং সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বললেন যে, এ কাজের সুদূরপ্রসারী প্রচার-সাফল্যের কথা চিন্তা করে মনে হচ্ছে রাজগুরু এর উপযুক্ত নন।

তবে কে ? প্রশ্ন হল। উত্তরে ভগৎ সিং বললেন, "কেন আমি ?"

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হল ভগৎ সিং-ই যাবেন এমন অসম সাহসিক কাজে।

চন্দ্রশেখর আজাদ বললেন যে, বোমা বিস্ফোরণের পর ব্যবস্থাপক সভার ভেতরে যে নিবিড় ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি হবে, তার মধ্য দিয়ে ভগৎ সিং অনায়াসে বেড়িয়ে আসতে পারবেন।

আর তাঁকে স্বয়ং আজাদ সাহায্য করবেন মোটরগাড়িতে পালিয়ে যেতে।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে ভগৎ সিং বললেন, 'না পালাবো না, স্বেচ্ছায় ধরা দেবো।"

এই স্বেচ্ছায় ধরা দেবার সাংঘাতিক পরিণতির কথা ভেবে সবাই এ-ওর মুখের দিকে তাকালেন বিস্ফারিত নয়নে।

না, এবারও শেষ পর্যন্ত কারো আপত্তি টিকলো না ভগৎ সিং-এর কঠোর সঙ্কল্পের কাছে।

প্রশ্ন হল ক'জন যাবেন ? আর কে কে ?

ভগৎ সিং আবার সবাইকে হতবাক করে বললেন, 'কেন, আমি ? হ্যাঁ, আমি একা !"

সেদিনের সেই গুপ্ত সভায় অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে ছিলেন বিজয় কুমার সিন্‌হা ও শিব বর্মা।

*　*　*　*

সভার শেষে বটুকেশ্বর যখন শুনলেন, ভগৎ সিং একাই যাচ্ছেন এক দুঃসাহসিক অভিযানে তখন তিনি বেঁকে বসলেন।

বললেন, "সে হতে পারে না। সর্দার একা যাবেন না। আমিও হবো তাঁর সঙ্গী।"

কানপুরে বটুকেশ্বর দত্তর ভেতর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বুদ্ধির দীপ্তি ও প্রতিভার স্বাক্ষর ভগৎ সিং দেখেছিলেন।

বলা যায়—সেই সঙ্গে দেখেছিলেন নিজেকে বটুকের দর্পণে।

কাজেই বেশি সময় লাগলো না উভয়কে—চিন্তায়, কর্মে, আচরণে এক হ্‌য়ে যেতে।

এ দু'য়ের মিলনে কেউ কেউ আড়ালে তখন বলতো, এ যেন বজ্র ও বিদ্যুতের সম্মিলিত শক্তি। দ্যুতি। যেখানে যাবেন সেখানে জয় এঁদের সুনিশ্চিত্।

কেন্দ্রীয় সমিতির কাছে শেষ পর্যন্ত বটুকেশ্বর নিজে আবেদন পেশ করলেন, ভগৎ সিং-এর অভিযানের সাথী হতে।

ওঁরা মৃদু হেসে জানালেন তাঁদের মৌন সম্মতি।

ভগৎ সিং এবার বটুককে ফেরাতে পারলেন না।

* * * *

প্রস্তুত হতে লাগলেন ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত। এক অভিনব পন্থায় দেশ-মাতৃকার সেবা করতে। নিঃশব্দ চিত্তে ব্রিটিশ সিংহের বিবরে ঢুকতে। মিথ্যে ভয়ের টুঁটি চেপে ধরতে। কেউ যা স্বপ্নেও ভাবেনি এর আগে—কোন দিন, কোন রাত্রে।

ব্যবস্থাপক সভায় যে বোমা বিস্ফোরণ করা হবে সেটা তৈরি হতে লাগলো আগ্রায়। বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিং সেখানে উপস্থিত হয়ে একটি ঘর ভাড়া করলেন। একই উনুনে রান্না চললো। কেনা হল কিছু মাটির বাসন। তাও ভেঙে দু' টুকরো করা হল। খাওয়ার পর সেই ভাঙা বাসন ওঁরা ফেলে না দিয়ে ধুয়ে রাখতেন। আর একবার খাবার সময় ব্যবহার করবেন বলে। কারণ, যতদূর সম্ভব খরচ কমানো। তারপর পিস্তল হাতে সারা রাত জেগে পাহারা চলতো পুলিসের ভয়ে। শোয়ার সময় পালা করে শোয়া হত। চারপায়া দূরের কথা একটি মাদুরও ছিল না সে ঘরে। নিজেদের পরবার কাপড় বিছিয়ে তারই এক কোণে ঘুমের কাজ

শেষ হত। সেখানে একে একে হাজির হলেন যতীন দাস, বিজয়কুমার সিন্‌হা, সদাশিব বর্মা, ললিত মুখার্জী*। দেখতে দেখতে যতীন দাসের [redacted]মা প্রস্তুত হয়ে গেল। হল নিখুঁত।

* * * *

একদিকে যখন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলছে আর অন্যদিকে যখন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আভাষ দেখা যাচ্ছে, তখন ইংরেজ সরকার ১৯২৯-এর ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য একটি নূতন আইনের খসড়া আনলেন। কংগ্রেস দলের নেতা সে আইনের খসড়া দেখে বললেন, "এটি যেন ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও কংগ্রেসকে ধ্বংস করার জন্যই বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।" কেউ ভাবলেন বিপ্লববাদী বলশোভিক ও সাম্রাজ্যবাদীদের দমন করার জন্যই এ "বিল" আনা হয়েছে। বিলটি সংশোধনের জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হল।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই বিলটিকে স্থগিত রাখার সুপারিশ করলেন ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি বিঠল ভাই প্যাটেল।

সেদিন ২রা এপ্রিল, ১৯২৯।

এই ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শ্রীপ্যাটেল যেইমাত্র বলেছেন, "এবার আমি পাবলিক সেফ্‌টি বিল সম্পর্কে আমি আমার রুলিং দিচ্ছি" ঠিক সেই মুহূর্তে দুম্‌ দুম্‌ করে পর পর দু'টি বোমা সহসা ব্যবস্থাপক সভার ছাদ ফুঁড়ে যেন ফেটে পড়লো সভার মধ্যে। তাজ্জব কাণ্ড!

সেই সঙ্গে শোনা গেল দু'টি রিভলবারের গুলির আওয়াজ।

এক বিস্ময়ের ঘোর না কাটতে কাটতে আর এক বিস্ময়!

---

* ভগৎ সিং ও দত্তর অমর কাহিনী সম্পাদনায়ঃ চমনলাল আজাদ

স্বভাবতই আতঙ্কিত সভ্যবৃন্দ ও দর্শকশ্রেণীর মধ্যে হুলস্থুল পড়ে গেল। কে কার আগে পালাবে, কোন পথ দিয়ে? সে এক অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য!

প্রথম ব্যক্তির হাত থেকে ছোঁড়া বোমা দু'টি মেঝেতে ফেটে যাবার পর দেখা গেল দু' একটি বেঞ্চির সামান্য ক্ষতি হয়েছে। মেঝেরও তাই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন এগিয়ে পর পর দু'টি গুলি ছুড়লেন শূন্যে।

তারপর ওপর থেকে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার দর্শকদের বসবার জায়গা থেকে ছড়িয়ে দিল সোসালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির ইস্তাহার, একটির পর একটি।

একজন বলে উঠলেন, "আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।"

তারপর তিনি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তাঁর হাতের রিভলবার।

সঙ্গীটিও ফেলে দিলেন নিজের হাতিয়ার।

সান্ত্রী, পুলিস ও সার্জেণ্ট দ্রুত এগিয়ে এসে ওঁদের গ্রেপ্তার করলো।

ওঁরা কোনরকম আপত্তি বা প্রতিবাদ না করে সহজভাবে ধরা দিলেন। পুলিসের কাছে যুবক দু'টি তাঁদের নিজেদের নাম বললেন। তাতে জানা গেল, একজনের নাম ভগৎ সিং। বয়স—এই ২৩।২৪। বাড়ি—পাঞ্জাব। আর একজনের নাম হল বটুকেশ্বর দত্ত। বয়স—এই ২২।২৩ হবে। বাঙালী। কিন্তু বাসিন্দা পাঞ্জাবের।

পুলিস একটু পরেই বুঝতে পারলো যে, এই ভগৎ সিং একটি সাংঘাতিক ধরনের মামলার ফেরারী আসামী। এতদিন পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি তাঁর বৈপ্লবিক জীবন-যাপন করছিলেন, নির্বিঘ্নে। নিশ্চিন্তে।

এবার পুলিসের জেরার উত্তরে ভগৎ সিং বললেন, "তথাকথিত ভারতীয় সংসদের মাধ্যমে ইংরেজ সরকার জাতির প্রতি অনবরত

যে অপমানের বোঝা স্তূপীকৃত করছে, তার তীব্র প্রতিবাদ না জানিয়ে উপায় নেই।

এজন্য আমরা ঠিক করেছি যে, জীবন দিয়ে হলেও এই প্রহসনের শেষ করতে হবে। আর তাহলেই আমলাতন্ত্রের আসল চেহারা দেশের লোকের কাছে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে।"

গ্রেপ্তারের পর দু'জনের মধ্যে কোন চাঞ্চল্যের ভাব দেখা গেল না।

তাঁদের সহজ চলাফেরায় মনে হচ্ছিল যে, একটু আগে যেন কিছুই ঘটেনি। ওঁদের কোমরে দড়ি বেঁধে, হাত পেছনে বেঁধে পৃথকভাবে পুলিস গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হল। বটুকেশ্বর দত্তকে নেওয়া হল নয়াদিল্লীর থানাতে। ভগৎ সিংকে চাঁদনীচকের সামনে কোতোয়ালিতে।

ইতিমধ্যে এপ্রিলের ১৫ তারিখে লাহোরি গেটে এই ইস্তাহারটি দেখা গেল :

॥ বধির কর্ণকে শোনাবার জন্য উচ্চ শব্দ ॥

৭ই এপ্রিল তারিখে পুলিস যে অন্যায় করেছে, সেজন্য আমরা আর একটি কর্তব্য সম্পন্ন করতে যাচ্ছি। সুতরাং সিমলায় অবস্থিত রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ অনুসারে জানান হচ্ছে যে, লাহোর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগার বরাতে স্যাণ্ডার্সের ন্যায় মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

২০৩ ও ১৮২ সংখ্যার সৈন্যদ্বয়কে অবিলম্বে তার কর্তব্য সম্পাদন করতে আদেশ দেওয়া হল।

পুলিস সশস্ত্র বিপ্লবীদলের আর সবাইকে খুঁজতে লাগলো মরিয়া হয়ে। চারদিকে জাল ছড়ালো। অতি সন্তর্পণে। নিঃশব্দে। মাথা খাটিয়ে।

সেই সূত্রে এপ্রিলের (১৯২৯) ৯ তারিখে পুলিস একজন সন্দেহভাজন লোকের গতিবিধির সংবাদ পেল। স্থান : লাহোর। লোহা ঢালাইয়ের একটি ছোট্ট কারখানা।

কে যেন চুপি চুপি একজন আসে—যায়। ফিস ফিস করে কথা বলে। আড়চোখে এদিক-ওদিক দেখে। আবার চলে যায়।

কি কথা বলে আর কি কাজ করে, [illegible] বলা দুষ্কর। আবার "ডিমের" মতো দেখতে একটা "খোল" নাকি দিয়েছে বানাতে। লোহা পিটিয়ে না গালিয়ে তা কে জানে!

সুতরাং গুপ্তচর-বিভাগ আরও তৎপর হল।

অনুসরণ করে দেখা গেল এই লোকটি আব কেউ নন; সন্দিগ্ধ শুকদেব। বিপ্লবীদলের পাণ্ডা। কাশ্মীরী বিল্ডিং থেকে তিনি যাতায়াত করেন। সুতরাং আর দেরি না করে ১৯২৯-এর ১৫ই এপ্রিল পুলিস ৬৯নং ম্যাকলিয়ড রোডের কাশ্মীরী বিল্ডিং ঘিরে ফেললো।

জানা গেল, ভগবতী চরণ ভোরা এই ঘর ভাড়া করেছেন মাসিক ১৩ টাকা ভাড়া দিয়ে। প্রায় একমাস হতে চললো।

প্রথম দশদিন খালিই পড়ে ছিল। কেউ আসেনি।

এরপর কিছু ছাত্রদের টিকির সন্ধান পাওয়া গেল।

ওরা সকাল ১০টায় বেরিয়ে যেত। ফিরত দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেলের দিকে।

আবার কোন কোন সময় কেউ আসতও না।

প্রতিবেশীদের কাছে এ এক হেঁয়ালী।

যা হোক, খানাতল্লাশ করে পুলিস এখানে পেলো; একটি নয় এগারটি বোমা। চব্বিশটি টোটা। আর দু'টি পিস্তল।

ভাড়াটে ভগবতী চরণ একদম নিরুদ্দেশ।

অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও পাওয়া গেল না তাঁকে।

যে তিনজনকে পুলিস ধরতে পারলো শুকদেব তাঁর মধ্যে একজন।*

---

*রোল-অব-অনার: কে. সি. ঘোষ।

একই তারিখে বিলাসপুর রেল স্টেশনে ধরা পড়লো আর একজন ব্যক্তি। তার সঙ্গে পাওয়া গেল সাতটি তাজা·বোমা।

১৯২৯-এর ১৩ই মে সাহারানপুরের এক জায়গায় খানাতল্লাশ চালিয়ে মিলে গেল আরও ৫টি বোমা ও ৫টি রিভলবার।

দু'জন লোক ধরা পড়লো সেই সঙ্গে।

১৯২৯-এর ৬ই জুন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত বিচারকের কাছে বিবৃতিতে জানালেন ঃ

"The attack was not directed towards any individual, but against an institution itself······we are next to none in our love for humanity and as such far from having any malice against any individual; we hold human life sacred beyond words. We humbly claim to the no more than serious students of history and conditions of our country and human aspirations and we despise hypocrecy."

"আক্রমণ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ছিল না। ছিল প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে···মানবিকতার প্রতি আমাদের মমত্ব বোধ অপরের চাইতে কোন অংশে কম নেই। সুতরাং কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্বেষ ভাব থাকতেই পারে না। আমাদের কাছে মানব জীবন এত পবিত্র ও মহান যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইতিহাসের ন্যায়নিষ্ঠ ছাত্র হিসেবে আমরা দাবি করি যে, আমরা আমাদের দেশের অবস্থা এবং মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

আমরা মিথ্যাচারকে ঘৃণা করি।"

"We have been convinced that, it exists only to demonstrate to the world, India's humiliation and helplessness and it symbolises the overridding domination of an irresponsible and autocratic rule."

"আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, পৃথিবীর কাছে ভারতের অসহায়তা ঢাক পিটিয়ে দেখাতে এবং ভারতকে প্রতিদিন অপমানে জর্জরিত করার উদ্দেশ্যেই এই সংসদকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

আর এটা একটা দায়িত্ব-জ্ঞানহীন স্বৈরাচারী এবং সর্বময় প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক শাসনের প্রতীক ছাড়া কিছু নয়।"

"The mentality of public leaders who help to squander public time and money on the so manifestly a stage managed exhibition of India's helpless subjection was incomprehensible to them.

The wholesale arrests of leaders of the labour movement only served to confirm their conviction that, the labouring millions of India have nothing to expect from an institution that stood as a menacing monument to the Strangling powers of exploiters and the serfdom of the helpless labourers."

"দেশের যে সকল নেতৃবর্গ জনসাধারণের বিপুল অর্থ এবং অমূল্য সময়ের অসীম অপচয়ে অভ্যস্ত তাঁরা মঞ্চ-পরিচালিত আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শনীর দ্বারা যে জনসাধারণের অপূরণীয় ক্ষতি এবং পরাধীনতার অসহায়তা নিত্য প্রকাশিত হচ্ছে, সেকথা ভাবতেই পারেন না।

নিরুপায় শ্রমিকদের দাসত্ব এবং শোষকশ্রেণীর সর্বনাশা ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে যে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভীতিজনক সৌধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, তার কাছ থেকে যে ভারতের অগণিত শ্রমিকদের কোন কিছু প্রত্যাশা করার নেই, সেকথা শ্রমিক

আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের যথেচ্ছাচার গ্রেপ্তার দ্বারা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয়।"

"Our sole purpose was 'to make the deaf hear' and 'to give the heedless a timely warning.' As they keenly felt that, from under the seeming stillness of the sea of Indian humanity a veritable storm is about to breakout.

We have only hoisted a danger signal to warn those who are speeding along without heeding the grave dangers ahead."

"আমাদের আসল উদ্দেশ্য হল বিরাট শব্দ দ্বারা বধিরকে সচকিত করা; এবং ভারতীয় জনসমুদ্রের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে যে আগামী দিনের দুর্নিবার ঝড়ের সঙ্কেতবার্তা বিদ্যমান, সেকথা মাথা-মোটাদের বুঝিয়ে দেওয়া।

আমরা কেবলমাত্র তাদের উদ্দেশ্যে বিপদ-সঙ্কেতের পতাকা উড্ডীন করেছি যারা তাদের আশু গভীর বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।"

* * *

নিম্ন আদালতে বিপ্লবের সংজ্ঞা জানতে চাইলে ভগৎ সিং দীপ্ত পৌরুষে বললেন নির্ভয়-নিশ্চিন্তে :—

"Revolution ?"

Revolution does not necessarily involve sanguinary strife nor is there any place in it for an individual vendetta.

---

* Vendetta :—ভূমধ্যসাগরের নিকটে কর্শিকা, সার্দিনিয়া প্রভৃতি দ্বীপে কেউ কাউকে হত্যা করলে তার আত্মীয়-বন্ধু হত্যাকারীর অন্বেষণে থেকে সুযোগমত তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত শান্ত হয় না। একে বলা হয় কৌলিক প্রতিহিংসা। আর ওটাই ওদের সামাজিক প্রথা।

It is not the cult of the bomb and pistol.

By revolution we mean that, the present order of things which is based on manifest injustice, must change. Producers and labourers inspite of being a most necessary element of society, are robbed by their exploiters of the fruits of their labour and deprived of their elementary right and this must stop."

"বিপ্লব ?

বিপ্লব মাত্রেই কিন্তু রক্তের বিভীষিকা নয়। কিংবা নয় ব্যক্তির প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। বিপ্লব কিন্তু কেবল বোমা-পিস্তল ছোঁড়ার নীতিও নয়। বিপ্লব বলতে আমরা বুঝি জাজ্বল্যমান অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।

উৎপাদকশ্রেণী অথবা শ্রমজীবীরা সমাজের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ হওয়া সত্বেও শোষকশ্রেণী দ্বারা বঞ্চিত হচ্ছে। আর প্রতারিত হচ্ছে ওদের শ্রমলব্ধ ফলের প্রাথমিক অধিকার থেকে। আমরা চাইছি যে, অবিলম্বে এই শোষণ-ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ হোক।'

"The capitalist exploiters squander millions on their whims. These terrible inequalitics and forced disparity of chances are heeding to world chaos. The present order of society is merry making on the brink of a vulcano and innocent children of the exploiters no less than millions of the exploited are walking on the edge of dangerous precipice."

"ধনতান্ত্রিক শোষণকারিগণ তাদের খেয়াল চরিতার্থ করতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অপচয় করেন। এই ভয়াবহ অসাম্য এবং সুযোগের বাধ্যতামূলক বৈষম্য পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান সমাজব্যবস্থা আগ্নেয়গিরির পাশে বসে আনন্দ-উৎসবে মত্ত। আর শোষিত শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ নিরীহ শিশু সন্তানগোষ্ঠী এবং অগণিত শোষিত জনগণ সর্বনাশের গিরিচূড়ার বিপজ্জনক প্রান্তদেশ ধরে হেঁটে চলেছেন।

জবানবন্দীতে তাঁরা বললেন :

"Revolution is the inalienable right of mankind. Freedom is the imperishable birth right of all. The labour is the real sustainer of society. Sovereignty of the people is the ultimate destiny of the workers.

For these ideals and for this faith we shall welcome any suffering to which we may be condemned.

To the alter of this revolution we have brought our youth as incense, for no sacrifice is too great for so magnificent a cause.

We are content. We await the advent of Revolution.

Long live Revolution. !'

"বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়া মনুষ্য-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। স্বাধীনতা মানুষের চিরকালের জন্মগত অধিকার। শ্রমিকশ্রেণী সমাজকে ধারণ করে আছে তার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে। আর জনসাধারণের হাতে সকল ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল শ্রমিক সমাজের মূল উদ্দেশ্য।

এই আদর্শ ও বিশ্বাসের জন্য আমরা যে কোন প্রকার দুঃখকেই বরণ করে নিতে প্রস্তুত।

---

*ইনক্লাব জিন্দাবাদ

তাই বিপ্লবের এই বেদীমূলে আমরা আমাদের অম্লান যৌবনকে ধূপের ন্যায় নিবেদন করছি।

কারণ, এমন মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন ত্যাগকেই আমরা অধিক বলে মনে করিনে।

আজ আমরা সত্যই সুখী।

আমরা অনাগত বিপ্লবের জন্য কান পেতে আছি।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্!"

*　　　*　　　*

ভগৎ সিং জবানবন্দীতে আরও বললেন :

...."He had seen the European viceroy's palace towering high side by side of the huts of the poor, famished Indians. As revolutionaries they stood for abolition of "exploitation of man by man" and to that end the establishment of a socialist regime in India."

"দরিদ্র ও অনশনক্লিষ্ট ভারতবাসীদের পর্ণ কুটিরের পাশে ইংরেজ রাজ-প্রতিনিধির আকাশছোঁয়া প্রাসাদ তিনি দেখেছেন। বিপ্লব-বাদের পথিক হিসেবে তাঁদের কাজ হল—'মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ব্যবস্থার' পরিবর্তে ভারতের মাটিতে একটি সাম্যের রাষ্ট্র স্থাপন করা।"*

প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে পুলিস এবার ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্তর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইন ও নরহত্যার চেষ্টা, এই দুইটি অভিযোগ আনলেন।

---

* মারটার হুজ মেসেজ ইজ আনডাইং...বিজয়কুমার সিন্‌হা, পেট্রিয়ট, ১৭।৩।৬৮।

সুরু হল বিচার।

সেদিন—৭ই মে, ১৯২৯।

স্থান : দিল্লী—কেন্দ্রীয় কারাগার।

অভিযুক্ত ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত বিচারকের সামনে উপস্থিত হয়ে সগর্বে বলে উঠলেন :

"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্!"

ক্রুদ্ধ ও বিব্রত বিচারকের নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের হাতে পড়লো লোহার মোটা হাত-কড়া।

পরদিন—৮ই মে, তাঁদের সোপর্দ করা হল দায়রা বিচারালয়ে।

তার পরের পরদিন, অর্থাৎ—১০ই মে (১৯২৯) জুরীগণ অভিযুক্তদের অপরাধ সম্পর্কে একমত হতে পারলেন না।

১২ই জুন (১৯২৯) ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তর হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। অস্বাভাবিক দ্রুতলয়ে বিচারের নামে অবিচারের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হল।

পরদিন—১৩ই জুন (১৯২৯) দিল্লী থেকে যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী ভগৎ সিংকে স্থানান্তরিত করা হল পাঞ্জাবের কুখ্যাত মিয়ান-ওয়ালি জেলে, লাহোর থেকে অনেক দূরে।

একই দিনে একই সঙ্গে বটুকেশ্বর দত্ত প্রেরিত হলেন লাহোর কারাগারে।

সেখানে তাঁদের দেওয়া হল কঠিন দৈহিক পরিশ্রমের কাজ, যা নাকি জেলের মধ্যে সাধারণ চোর-ডাকাতের দল করতো।

সেই সঙ্গে কারা-কর্তৃপক্ষ ওঁদের ওপর চালিয়ে যেতে লাগলো নানাভাবে লাঞ্ছনা আর অপমান।

ভগৎ সিং-এর প্রতিবাদ নিষ্ফল হল। লিখিত বক্তব্য বিফলে গেল।

সুরু হল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। যুগপৎ লাহোর ও মিয়ানওয়ালি কারাগার থেকে পেশ করা হল নিম্নলিখিত দাবি :

১। রাজনৈতিক কয়েদীর জন্য একটি পৃথক শ্রেণী গঠন, যার মর্যাদা কোনক্রমেই কোন ইংরেজ কয়েদীর মর্যাদার নিচে হবে না।

২। সাধারণ চোর বা ডাকাত কয়েদীর ন্যায় রাজনৈতিক বন্দীদের দ্বারা কঠিন কায়িক পরিশ্রমের কাজ করাবার প্রচলিত প্রথা রহিত করতে হবে।

৩। সংবাদপত্র, বই ও সাহিত্য পুস্তক দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

৪। নিকৃষ্ট আহার্য দেবার পরিবর্তে উৎকৃষ্ট আহার্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। বন্দীদের অপমানজনক পোশাক-পরিচ্ছদেরও পরিবর্তন করতে হবে।

* * *

এসব উদ্ধত দাবি পেশ করার জন্য উভয়কে কারাগার-আইন লঙ্ঘনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি স্বরূপ পায়ে দেওয়া হল লোহার বেড়ি।

* * *

কর্তৃপক্ষের এই অন্যায় সাজা ও দৈনন্দিন রূঢ় আচরণ এবং পূর্বের পেশ-করা দাবি আদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ওঁরা সকল প্রকার কারাগারের নিয়ম পালন করতে অস্বীকার করে সুরু করলেন আমৃত্যু অনশন ধর্মঘট। সেদিন ১৫ই জুন, ১৯২৯।

* * *

কর্তৃপক্ষের হাজার কঠোরতা সত্ত্বেও ২৩শে জুন তারিখে হঠাৎ একথা প্রকাশ হয়ে পড়লো যে, গত ৯দিন ধরে বটুকেশ্বর দত্ত লাহোর জেলে অনশন ধর্মঘট করে আছেন।

*　　　*　　　*

১৯২৯-এর ৯ই জুলাই তারিখে ভগৎ সিংকে পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালি কারাগার থেকে আনা হল লাহোর কারাগারে। হাতে-পায়ে লোহার বেড়ি দিয়ে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ভগৎ সিং-এর অনশন ধর্মঘটের সেদিন ২৫ দিন উত্তীর্ণ হতে চলেছে।

১১ই জুলাই (১৯২৯) অন্যান্য অভিযুক্ত আসামীর সঙ্গে অনশনী ভগৎ সিং 'কোর্ট' থেকে লাহোর জেলে ফিরে এলে, কিছু জোয়ান পাঠান সান্ত্রী তাঁর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলো অনশনীকে জোর করে যাহোক কিছু খাওয়াতে।

ভগৎ সিং আপত্তি জানালেন। চললো দু'পক্ষের লড়াই।

একদিকে ২৭ দিনের অনশনী বিপ্লবী বন্দী বীর ভগৎ সিং, অপরদিকে ৮জন সুস্থ পাঠান সান্ত্রী আর ডাক্তার নিজে।

ভগৎ সিং সেদিন লড়তে গিয়ে হলেন নির্মমভাবে প্রহৃত ও বিপর্যস্ত। আর তার পরদিন বৃথাই দেখালেন দেহের সেই আহত চিহ্ন সুসভ্য ইংরেজ সরকারের ঢাক-পেটান বিচারালয়ে।

*　　　*　　　*

একই কারণে দুর্বল অনশনী বন্দী বটুকেশ্বরকে কারাগারের পিশাচ-প্রহরীদল জোর করে খাওয়াতে যাওয়ার ফলে বটুকেশ্বর হলেন অচৈতন্য।

ফলে, ১৩ই জুলাই (১৯২৯) অনশনী বটুকেশ্বরকে স্ট্রেচারে করে আনতে হল 'কোর্টে'।

আসামী কাঠগড়ায় এসে বলে উঠলেন :

"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!
সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্!"

১৪ই জুন তারিখে কলকাতায় ধৃত এবং ১৬ই জুন লাহোর কারাগারে পুলিস পাহারায় আনীত যতীন্দ্রনাথ দাস ১৩ই জুলাই

(১৯২৯) লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে বন্দী হিসেবে সুরু করলেন সহানুভূতি সূচক অনশন ধর্মঘট।

এবার লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম বন্দী অমর যতীন দাসের অন্তিমযাত্রার বর্ণনা দিচ্ছেন তাঁর সহ-বন্দী বিজয়কুমার সিন্‌হা : (পিউপিলস্ পাথ, ১৯২৯, সেপ্টেম্বর সংখ্যায়)*।

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তর আমৃত্যু অনশন ধর্মঘটকে আরও বলিষ্ঠ ও কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ১৩ই জুলাই (১৯২৯) তারিখে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য বন্দীগণ সহ বিপ্লবী যতীন দাস অনশন ধর্মঘটে যোগদান করলে শাসকশ্রেণী বিশেষভাবে চিন্তিত হলেন। সরকার মত পরিবর্তনের আভাষ দিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই মর্মে এক সপ্তাহের মধ্যে সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ করলেন।

ইস্তাহারে জানালেন যে, "ফর দি রিজন অব হেলথ্" তাঁরা অনশনীদের দাবি-দাওয়া মেনে নিতে প্রস্তুত। এই বিবৃতিতে ছিল অমর্যাদাসূচক সর্তের লিখিত ইঙ্গিত। কূট কৌশলের ঘৃণিত খেলা। তাই সরকারী ভাষ্যের চাতুরিটুকু ধরতে পেরে অনশনীগণ এই সর্তাধীন স্বীকৃতি সরোষে প্রত্যাখ্যান করলেন। সেই সঙ্গে বন্দীগণ সরকারকে জানালেন যে, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের বিনাসর্তে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত না করা পর্যন্ত তাঁরা অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন।

গোষ্ঠীবদ্ধ অনশন ধর্মঘট

এই অনশন সুরু-করার আগে লাহোর জেলে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ গোপন আলোচনার বৈঠক বসে সেখানে যতীন দাস এরূপ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে অনশন ধর্মঘটের সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

---

*বাংলা ভাবানুবাদ লেখকের

তাঁর সহযোগী বন্দীগণ তখন বয়সে সবাই তরুণ ছিলেন। রক্তও গরম। উন্মাদনায় অস্থির, চঞ্চল। সুতরাং বেপরোয়া ভাবের পরিবর্তে ধীর-স্থির কোন যুক্তিকে সেদিন—সেই মুহূর্তে আমল দিতে রাজী ছিলেন না। এমন কি, যতীন দাসের অনশন ধর্মঘট সম্পর্কের সেই যুক্তি-নির্ভর সাবধানী উক্তি শুনে কেউ- কেউ এতটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে, সেদিন তাঁরা তাঁকে ভীরুর পর্যায়ে ফেলতেও কুণ্ঠিত হননি।

কিন্তু অনশন ধর্মঘটের মাত্র কয়েকটা দিন যেতে না যেতে ওঁরা বেশ ভালভাবেই ওঁদের ভুল বুঝতে পারলেন। সেই সঙ্গে উপলব্ধি করলেন যতীন দাসের উক্তির সারমর্ম। তদুপরি দেখলেন যে, তিনি কী ধাতুতে তৈরি আর কেমন জাতের ছেলে!

তখন সুরু হল তাঁদের বিস্মিত হবার পালা, লজ্জিত হবার প্রশ্ন।

এদিকে যতীন দাসের অনশন ধর্মঘট সাত দিন চলতে না চলতে লাহোর কারাগারের চিকিৎসক অনশনী যতীন দাসকে জোর করে জলীয় আহার্য গিলিয়ে তাঁর ধর্মঘটের পবিত্রতা ক্ষুন্ন করতে গোপনে সরকারী নির্দেশ পেলেন।

সেই সূত্রে হঠাৎ একদিন উনি সাত-আটজন বলিষ্ঠ পাঠান রক্ষী নিয়ে যতীন দাসের সামনে এসে হাজির হলেন। ইঙ্গিতমাত্র পুলিস বাহিনী অনশনব্রতীর ওপর হিংস্র পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো। আক্রমণের কারণটা বুঝতে পেরে বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী পালোয়ান যতীন দাস একাকী সেই সাত-আটজন পাঠান সান্ত্রীর সঙ্গে যুঝতে লাগলেন আপ্রাণ শক্তি দিয়ে। জোর করে অনশন ভাঙাবার সরকারী হীন কৌশলকে ব্যর্থ করতে। কিন্তু একজন মানুষ, তাও অনশনী, সে কতক্ষণ আর সাত-আটজন শক্তিশালী বেটন-ধারী পুলিসের সঙ্গে লড়তে পারে? তাই কিছুক্ষণের মধ্যে যতীন দাস বাধ্য হলেন মাটিতে শুয়ে পড়তে। তখন ওঁরা চড়ে বসল ওর বুকের ওপর। কেউ চেপে ধরল হাত, কেউ পা, কেউ নাক, কেউ মুখ।

তবু, এতগুলি পাঠান মিলে একটিমাত্র স্বদেশী বাবুকে কাবু করতে এতটা সময় নিচ্ছিল দেখে চিকিৎসক মনে মনে খুবই বিরক্ত হচ্ছিলেন। এবার শিকার ধরাশায়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে যতীন দাসের নাকের মধ্যে দিলেন রবারের নল ঢুকিয়ে। তারপর ঠেলে দিলেন সেটাকে পাকস্থলীর দিকে। সেই সঙ্গে নলের মধ্যে ঢালতে লাগলেন দুধ।

যতীন দাস এর আগে রাজবন্দী অবস্থায় ছিলেন বাংলা দেশের ভিন্ন দু'-একটি জেলে। যার মধ্যে ছিল ঢাকা ও ময়মনসিং কারাগার। তখন সেই কারা-জীবনে যতীন দাসকে কোন মর্যাদার লড়াইয়ে নেমে অনশন ধর্মঘট শুরু করতে হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে যতীন দাস সহসা ভয়ানকভাবে কেশে উঠলেন। আর নাকের ভেতর দিয়ে ঢোকান নলের শেষের দিকটাকে পাকস্থলীর দিক থেকে সরিয়ে শ্বাসনালীতে পাঠাতে সক্ষম হলেন।

ওদিকে চিকিৎসকও বসে নেই। অনশনীদের অনশন ভাঙাতে তাঁরও রয়েছে অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞতা। তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেখলেন যে, নলের মধ্য দিয়ে দুধ যাচ্ছে না। এতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ধৈর্য হারালেন, আর তার ফলে, চিকিৎসক এবার একটা মোটা ও শক্ত রবারের নল জোর করে যতীন দাসের মুখের ভেতর পুরে দিলেন। এমনিভাবে নাকে ও মুখের উভয় দিক থেকে দু' জাতীয় দুটো রবারের নল ঢুকিয়ে জোর করে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা হওয়াতে যতীন দাসের দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। তাঁর শ্বাসরোধ হয়ে এল প্রায়। ফুসফুসের মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের অভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্তিমিত হল। স্তব্ধ হল। ফলে, শ্বাসকষ্টের মরণ-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বীর বিপ্লবী চৈতন্য হারালেন। শেষ পর্যন্ত জ্ঞানহীন স্বদেশী কয়েদীকে আচ্ছা রকম জব্দ করতে পেরেছে ভেবে জেলের মনুষ্যত্বহীন কসাই ডাক্তার পাঠান সান্ত্রীদের নিয়ে বীর পদক্ষেপে বন্দিশালার পথ-ঘাট কাঁপিয়ে প্রস্থান করলেন।

সেই সঙ্গে মিলিয়ে গেল অনেক জোড়া বুটের স্পর্ধিত শব্দ আর কুচকাওয়াজের হাঁক-ডাক।

ডাক্তার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যতীন দাসের অপরাপর অনশনী সহ-বন্দীগণ ঘিরে দাঁড়ালেন যতীন দাসের দেহ বেষ্টন করে।

কিছুক্ষণ সংশয় আর অস্থির উদ্বিগ্নতার মধ্যে সময় কাটলো। তারপর মনে হল, যতীন দাসের বাহ্যজ্ঞান যেন ধীরে ধীরে ফিরে আসছে।

ঠোঁটে যেন একটু মলিন হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। চোখের পাতা যেন একটু একটু করে স্বাভাবিক হচ্ছে।

যদিও তখন নিঃশ্বাস নিতে ও নিঃশ্বাস ফেলতে যতীন দাসের খুবই কষ্ট হচ্ছিল, তবু তিনি যেন বন্ধুদের কাছে কিছু বলতে চাইছেন বলে মনে হল। সবাই চকিত হয়ে রইলেন কান পেতে শুনতে। তিনি কী বলেন! কী বলতে চাইছেন! কী বলছেন! শেষটায় তাঁর ঠোঁট দুটি দু'ভাগ হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল চিবুক নড়ার প্রচেষ্টা। আর সেই মুহূর্তে ঈষৎ মলিন হাসি হেসে তিনি প্রায় অস্ফুট স্বরে বললেন: "এবার আমাদের জয় সুনিশ্চিত।"

সেই অভাবিত সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে যতীন দাসের এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের অর্থ বুঝে উঠতে পারছিলেন না উপস্থিত বন্ধুগণের কেউ। ওঁরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নীরব বেদনায় দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে প্রশ্ন করলেন সবাইকে সবাই।

দেখতে দেখতে এরই মধ্যে আবার এসে পড়লো আরেক দল সরকারী চিকিৎসক।

ওরা যতীন দাসকে এবার সন্তর্পণে পরীক্ষা করলো।

কিন্তু ওদের গম্ভীর মুখ আর কুঞ্চিত ললাট-রেখা লক্ষ্য করে যতীন দাসের বন্ধুগণ মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ভীত, ত্রস্ত ও অজানা আশঙ্কায় ম্রিয়মান হলেন।

রোগীর কাছ থেকে সরে এসে চিকিৎসকগণ যতীন্দ্রনাথের

সহযোগীদের সসঙ্কোচে জানালো যে, অনশনী যতীন দাসের ফুসফুসে রবারের নল ঢুকে তাঁর ফুসফুসকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এ অবস্থায় তাঁর বাঁচার আশা নেই বললেই চলে।

এখন তাঁকে জোর করে আবার কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করা, মানে, মরণকে ডেকে আনা।

তাই এবার চিকিৎসকমণ্ডলী যতীন দাসের পাশে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ওঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাতে লাগলো, অন্তত: একটু অযুধ খেতে। কিন্তু মৃত্যুবরণে কৃতসঙ্কল্প বিপ্লবী শিয়রে মৃত্যুকে দেখতে পেয়ে মৃত্যু-ভয়ে ভীত হলেন না। তিনি যেন মরণকে, সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুকেই সাদর আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'তুহু মম শ্যাম সমান।'

অন্তিম যাত্রা

তবু চিকিৎসকমণ্ডলী আবার চেষ্টা করলেন অযুধ খাওয়াতে। আবার অনুরোধ জানালেন, অন্তত: এক চামচ গ্লুকোজের জল খেতে। কিন্তু হায়! সব বৃথা।

এবার যতীন দাস দেহে ও মনে সর্বশক্তি সঞ্চয় করে বললেন যে, বিশেষ উদ্দেশ্য ও আদর্শের জন্য তিনি অনশন ধর্মঘটব্রত সুরু করেছেন। সেই ব্রত উদ্‌যাপিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এর পবিত্রতা নষ্ট করতে পারবেন না। সুতরাং তাঁকে যেন আর এ বিষয়ে অনুরোধ না জানান হয়, বিরক্ত না করা হয়।

এভাবে তাঁর ঐতিহাসিক অন্তিম যাত্রা সুরু হলে তিনি বিজয়ী বীরের আনন্দ, সাহস ও বীর্য সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে সেই অভিষ্ঠ লাভের পথে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

এসময় একদিকে তাঁর বিপ্লবী মনোবল যত উঁচুতে উঠতে লাগলো, তেমনি দ্রুতবেগে তাঁর দৈহিক অবস্থার ঘটতে লাগলো ক্রম-অবনতি।

এমনি ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে যতীন দাসের দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ: ক্ষীণ হতে হতে একসময় হঠাৎ গেল বুঝি নষ্ট হয়ে।

যে ওষ্ঠাধর এতক্ষণ দুর্বলভাবে কাঁপছিল, যে কণ্ঠস্বর আসছিল জড়িয়ে তাও যেন গেল স্তব্ধ হয়ে।

পা দুটো আড়ষ্ট হতে হতে অবশ হয়ে গেল। হয়ে গেল অসাড়। এই নিষ্ঠুর অসাড়তা দেহের তলার দিক থেকে আরম্ভ করে নির্মমভাবে একটু একটু করে দেহের ওপরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো কল্পনাতীত নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে। সেই সঙ্গে শরীরের অবশিষ্ট যৎসামান্য মেদ-মাংস সঙ্কুচিত হয়ে কোথায় যেন যেতে লাগলো অদৃশ্য হয়ে। পড়ে রইল শুধু দেহের ভয়াবহ কঙ্কালসার খাঁচা।

এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য যেন আর দেখা যাচ্ছিল না। তবু তাঁর সঙ্গী-সাথীরা এই নির্ভীক বীরের পাশে অতন্দ্র প্রহরীর মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারাক্ষণ বসে ছিলেন এক অস্বাভাবিক জ্বালা-যন্ত্রণা আর গভীর মন-কষ্ট নিয়ে।

বাঙালী কেমন করে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে মৃত্যুর অমৃতলোকে অগ্রসর হতে পারে তারই মর্মান্তিক সাক্ষী হয়ে রইলেন বীর যতীন দাসের অনশনী সাথীবৃন্দ।

অপরদিকে দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে অনশনী যতীন দাসের স্বাস্থ্যের অবনতির খবর দেশবাসী আকুল আগ্রহ ও চরম উদ্বেগ নিয়ে পড়তে লাগলো।

ফলে, অনশন ধর্মঘটের আন্দোলন ক্রমে ক্রমে ভারতের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

ইংরেজ সরকারের এই সীমাহীন নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে সারা ভারতে প্রতিবাদ-দিবস পালনের জন্য চললো ব্যাপক উদ্যোগ-আয়োজন। এমনি দিনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অনশনী-দের দাবির পক্ষে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

তদুপরি স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল নেহরু প্রকাশ্য বিবৃতি মারফত সরকারকে জানালেন ধিক্কার। তাঁর প্রিয় পুত্র পণ্ডিত জওহরলাল লাহোরে উপস্থিত হয়ে কারাগারের ভেতর দেখা

করলেন অনশনরত বন্দীদের সঙ্গে। পরে সংবাদপত্রে দিলেন এক বিবৃতি। বীর বিপ্লবীদের দুঃখে সমবেদনা জানালেন। তিনি আরও বললেন যে, মনে হচ্ছে, অনশনী বন্দীগণ শেষপর্যন্ত দুরন্ত কাল-স্বরূপ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে কৃতসঙ্কল্প। এঁদের মধ্যে যতীন দাসের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তিনি যেন স্থির মৃত্যুর দিকে অবিচলিত চিত্তে অগ্রসর হচ্ছেন।

বিবৃতির উপসংহারে তিনি আশা পোষণ করলেন যে, অনশন ধর্মঘটিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে তাঁদের আন্দোলন হবে সাফল্য-মণ্ডিত। হবে গৌরবান্বিত। এরপর বিপ্লবীদের দুর্দিনের বন্ধু ও যুক্তপ্রদেশের অন্যতম সম্ভ্রান্ত নাগরিক শ্রীগণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী অনশনীদের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বন্দীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষ করে সরকারের সঙ্গেও কথাবার্তা চালাবেন। উদ্দেশ্য, উভয়দিকের গ্রহণযোগ্য কোন আপোস-মীমাংসার সূত্র আবিষ্কার।

কিন্তু বিপ্লবীদের প্রতি সরকারের ঘৃণিত ও প্রতিহিংসামূলক মনোভাব আর অনশনীদের মৃত্যুপণ অনশন সঙ্কল্পের রূপ দেখে সেই ধরনের আলোচনা থেকে তিনি নিবৃত্ত হলেন।

সংবাদপত্রে তিনি জানালেন যে, যতীন দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও কথা বলার সুযোগ পেয়ে তাঁর এক নব চেতনা লাভ হয়েছে। যতীন দাস যেন উদ্দীপীত আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নঃশঙ্কচিত্তে আরব্ধ ব্রতের সমাপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছেন।

ইতিমধ্যে যতীন দাসের অবস্থা আরও শোচনীয় পরিণতির দিকে অগ্রসর হল। বস্তুতপক্ষে, তখন তাঁর দুর্বল জীবন-প্রদীপ অস্থিরভাবে কাঁপছে। নিভে-আসা সেই শিখা কখন যে নিভে যাবে একেবারে, তার কোন স্থিরতা নেই।

ওদিকে, রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ইংরেজ রাজপুরুষদের এই বর্বরোচিত হিংস্র ব্যবহারে সারা দেশময় উঠলো ধিক্কার-ধ্বনি। উঠলো প্রতিবাদের ঝড়।

ইংরেজ সরকার এই প্রবল জনমতকে আর অগ্রাহ্য করতে সাহসী হলেন না। ফলে, একের পর এক ইস্তাহার জারী করে এতকাল যে প্রসঙ্গকে, যে সত্যকে, যে বিষয়কে মিথ্যার আবরণে ঢেকে রাখতে বৃথাই চেষ্টা করে আসছিল, এবার সেই সত্যের মুখোমুখি হলেন।

অর্থাৎ, বন্দিশালার রাজনৈতিক বন্দীদের বিশেষ মর্যাদা দেবার প্রশ্ন বিচার-বিবেচনা করে দেখতে রাজী হলেন; আর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কারাগারের বিষয় পরীক্ষা করে দেখবার জন্য তদন্ত কমিটি গঠনের সংবাদ ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব কারাগার তদন্ত কমিটির সভাপতি অনশনরত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের সঙ্গে কারাগারের ভেতর সাক্ষাৎ করলেন। সুরু হল আলোচনা। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অনশনী বন্দীগণ তাঁদের অনশনব্রত ভাঙতে রাজী হলেন। অনশন-কাতর মৃত-প্রায় যতীন দাস সম্পর্কে কমিটি সিদ্ধান্ত করলেন যে, তাঁকে বিনা সর্তে মুক্তি দেওয়া হবে।

কিন্তু একটু পরেই ইংরেজ সরকার সিদ্ধান্ত বদলালেন। করলেন মত পরিবর্তন। জানালেন যে, এই মুক্তি হবে সর্ত-সাপেক্ষ। অর্থাৎ, কাউকে না কাউকে জামিন হতে হবে। বিপ্লবী যতীন দাস সরকারের এই কাপুরোষিত ব্যবহারে ক্ষোভে ও অপমানে জ্বলে উঠলেন।

তিনি জানালেন যে, সর্তাধীন মুক্তিতে তিনি আগ্রহী হন। এর চাইতে মৃত্যুবরণই শ্রেয়।

এই হীন সরকারী চাতুরীর কথা ক্রমশঃ জানাজানি হয়ে গেল অন্যান্য বন্দীদের কাছেও। প্রতিবাদে ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, অজয়কুমার ঘোষ, জিতেন সান্যাল, শিব বর্মা ও বিজয়কুমার সিন্‌হা আবার অনশন ধর্মঘটের পথে পা বাড়ালেন।

কর্তৃপক্ষ এবার আশ্রয় নিলেন আর একটি কূট কৌশলের। ওঁরা

যতীন দাসের সেবারত তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকিরণ দাসকে ধরলেন। বললেন জামিন হতে।

কিরণ দাস সরাসরি এই সরকারী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। ইংরেজ সরকার এবার যতীন দাসের পিতা বঙ্কিম দাসকে অনুরোধ করলেন মরণোন্মুখ পুত্রের জামিন হতে।

তিনিও সরকারী ধূর্ততার কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজী হলেন না। তবু ইংরেজ সরকার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঘৃণিত চক্রান্তের পথ থেকে সরে এলেন না। এবার শেষ চেষ্টা করলেন ভিন্ন পথে। ভিন্ন পদ্ধতিতে। তাই সকলের অজ্ঞাতে চুপি চুপি একজন রাজভক্ত প্রজাকে দিয়ে যতীন দাসের মুক্তির পক্ষে জামিননামায় স্বাক্ষর করালেন। মামুলি আইনকে প্রাধান্য দিতে। আর সেইসূত্রে যতীন দাসকে কারাগার থেকে বাইরে আনার জন্য এক সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর সঙ্গে একটি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি জেল-হাসপাতালে পাঠালেন।

অনশনরত যতীন দাসের সহযোগীদের কাছে যখন এই গোপন তথ্য প্রকাশিত হল তখন তাঁরা সরকারের এই সীমাহীন নীচতায় অবাক-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

তারপর যতীন দাসের অনশনের পবিত্রতার মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য সমবেতভাবে ওয়ার্ডের (যতীন দাসের) দরজার মুখে একে একে লোহার খাটের ফ্রেম ও হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই জড়ো করে ওয়ার্ডের প্রবেশ-মুখ বন্ধ করে দিলেন।

ইতিমধ্যে পূর্ব-পরিকল্পনামত পুলিস ও অ্যাম্বুলেন্স এসে হাজির হল জেলের ভেতরে।

তখন যতীন দাসের বন্ধুবর্গ জেল কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে সোজা-সুজি বললেন যে, তাঁদের সকলের:মৃতদেহ না মাড়িয়ে তাঁদের প্রিয়-বন্ধু যতীনকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া চলবে না।

অর্থাৎ, যতীন দাসকে এখান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হলে ওঁরা মৃত্যুপণ করে বাধা দেবেন।

এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে চারিদিকের দেওয়ালের বাতাস পর্যন্ত যখন বিপন্ন হয়ে উঠলো, ভারী হয়ে ওঠলো তখন মৃত্যুপথ-যাত্রী যতীন দাস কী করে যেন ঘটনার আঁচ পেলেন। ইশারায় কাছে ডাকলেন অকৃত্রিম বন্ধুদের। তাঁদের কাছে শুনলেন সব কথা। তারপর ইঙ্গিত করলেন দরজার মুখে জড়ো করা সব লোহার ফ্রেম-ট্রেমগুলি সরিয়ে নিতে।

এমনি সময় সাহসে ভর করে অতি সন্তর্পণে ও বিনীত ভঙ্গীতে একজন পদস্থ পুলিস কর্মচারী এগিয়ে এলেন। বললেন যে, যতীন-বাবু হুকুম করলেই এখন সরকারী আদেশ অনুযায়ী তাঁকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে মুক্ত বায়ুতে। মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে।

যতীন দাস তখন যেন আবার একটু মুচকি হাসলেন। তারপর তাদের আভাষে জানিয়ে দিলেন যে, এখান থেকে তাঁকে সরিয়ে নেওয়া তো দূরের কথা, তাঁর দেহ পর্যন্ত ছুঁতে দিতে তিনি রাজী নন। মুমূর্ষু ব্যক্তির এই দুর্জয় সিদ্ধান্তের কথা শুনে উপস্থিত চিকিৎসক-মণ্ডলী শিউরে উঠলেন। মাথা নেড়ে জানালেন যে, এ অবস্থায় তাঁকে এখান থেকে সরাবার চেষ্টার অর্থ হল, তাঁকে সোজাসুজি হত্যা করার ঝুঁকি ঘাড়ে নেওয়া। ডাক্তারদের এই মত-প্রকাশের পর আর কেউ এগুতে সাহস করলেন না।

এমনি করে নমস্য বীর বিপ্লবী যতীন দাস ও তাঁর সতীর্থ বিপ্লবীদের প্রতিরোধে ইংরেজ সরকারের এক জঘন্যতম হীন প্রচেষ্টা শেষপর্যন্ত পরাভূত হল। হল বিপর্যস্ত। ফলে, মাথা নিচু করে ১৯২৯-এর ৭ই সেপ্টেম্বর পুলিস বাহিনী আর অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি কারাগার পরিত্যাগে বাধ্য হল।

সাত দিন পর শেষপর্যন্ত বিপ্লবী বীর যতীন দাসের জীবন দীপ-শিখা যখন দপ্ করে নিভে গেল, তখন তাঁর অনশন ধর্মঘটব্রতের ৬২ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। ৬৩ দিন চলছে। আর সেই ৬৩ দিনের নির্মল প্রভাতের পর প্রখর মধ্যাহ্ন বেলা যখন

পশ্চিম দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই তিনি ঢলে পড়লেন অন্তিমশয়নে। যে নিদ্রা ভাঙলো না আর ইহজীবনে। নিষ্করুণ ইতিহাসের কাল-পরিক্রমায় সেই রোদন-ভরা দিনটির তারিখ হল ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯।

সে সময়কার ভয়াবহ জটিল পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে পরবর্তীকালে ঐ মামলার অন্যতম বিচারাধীন বন্দী অজয় ঘোষ বলেছেন: "আমাদের অনশন ধর্মঘট ভাঙতে জেল-কর্তৃপক্ষ আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক প্রকোষ্ঠগুলির (সেল্) জলপাত্রের জল সরিয়ে সেখানে চুপি চুপি দুধ ঢেলে রাখতো।

এর পরিণতি ছিল অচিন্ত্যনীয়।

একদিন পর—

তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। নিজের দুর্বল দেহটাকে কোনরকমে টেনে নিয়ে এগিয়ে গেলাম জল-ভরা পাত্রের দিকে। মরুভূমির বুকে মরুদ্যান দেখে যেমনভাবে পথিক এগিয়ে যায়।

অবাক-বিস্ময়ে ভরপুর হয়ে দেখতে পেলাম সেখানে রয়েছে তৃষ্ণার জলের পরিবর্তে দুধ।

সঙ্কোচে, দ্বিধায়, ভয়ে পিছু হট্‌লাম।

তখন আমার অবস্থা বর্ণনার অতীত। কেবলমাত্র কোন উন্মত্ত প্রাণীর হিংসার সঙ্গে তার তুলনা চলে। আড়াল থেকে যে লোকটি আমাদের নিয়ে এই জঘন্য খেলা খেলছিল, তাকে যদি তখন কাছে পেতাম তবে তাকে আমি হত্যা করতাম।

ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের বাইরে নির্বাক কারা-রক্ষী চুপচাপ বসে। আমার প্রতিমুহূর্তের আচরণ স্থিরভাবে লক্ষ্য করে চলেছে। আমি যেন আর পারছিলাম না। ভয় হচ্ছিল, হয়তো বা, হয়তো বা এক্ষুণি ভেঙে পড়ব। পরাজয় স্বীকার করব। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম যে, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি আমার মহান অনশন ধর্মঘটের মর্যাদা লঙ্ঘন করব, আমাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হব। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে দুগ্ধপানে বাধ্য হব।

এদিকে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জিভ্ ফুলে গেছে। সব মিলিয়ে সে এক বীভৎস অবস্থা। কি মনের, কি দেহের! আমি বাইরের নির্বিকার রক্ষীটিকে কাছে ডাকলাম।

সে আমার সাড়া পেয়ে ইঙ্গিত মেনে নিয়ে সাগ্রহে এগিয়ে এল।

কাতরকণ্ঠে তাকে বললাম, 'সিপাইজী! জল, 'একটু জল দিতে পার?' সে গম্ভীর হয়ে মুখ ঘুরিয়ে শক্ত গলায় বলল, 'হুকুম নেহি'।

ক্রোধে, নিরাশয় ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে, লজ্জায় আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম। নিমেষে তুলে নিলাম সামনের দুধের লোভনীয় পাত্রটি। তারপর?—তারপর—? ঠিক জানিনে, কি হল। পর মুহূর্তে দেখলাম ওটা চূর্ণ হয়ে গেছে, খান খান হয়ে গেছে আমার সেলের লোহার শিকের গায়ে লেগে। তার কাছে পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সান্ত্রী। পাত্রের সমস্ত দুধ ছড়িয়ে পড়েছে ওর উর্দিতে, পোশাকে, নাকে-মুখে, সর্বত্র।

আমার এই সব কাণ্ড-কারখানা দেখে ও ভাবলো, আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি। কথাটা একেবারে মিথ্যা ভাবেনি।

সত্যিই কি তখন আমি আমার ভেতরে ছিলাম!

নাঃ—ছিলাম না। থাকতে পারিনি।

ঐ সময়টায় যেখানেই যত রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন, সেখানেই তাঁরা সহানুভূতি সূচক অনশন ধর্মঘট করেছিলেন।

আমাদের অনশন ধর্মঘটের সহায়তায় ও দাবির সমর্থনে বাইরে শক্তিশালী গণ-আন্দোলন ফেঁপে ফুলে উঠছিল।

আমাদের দাবির দিকে তাকিয়ে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরাও কিছুদিনের জন্য সহানুভূতিসূচক অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের অনশন ধর্মঘটের সংবাদ ভারত মহাসাগরের তরঙ্গ-ভেলায় ভাসতে ভাসতে একসময় হাজির হয়েছিল টেমস্ নদীর মোহনায়।

তাই খোদ ইংল্যাণ্ডেও আমাদের দাবি-দাওয়ার পক্ষে আন্দোলনের সৃষ্টি হল। এমন কি, সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ভারতীয় বন্দীদের প্রতি।"

"Determined to break us, the jail officials removed water from our cells and placed milk instead in the pitcher. This was the worst ordeal imaginable. After a day, thirst grew unbearable. I would drag myself to the pitcher, hoping everytime to find water but drew back at the sight of milk. It was maddening. If the man who had hit upon this device had been there before me, I would have killed him. Outside, the guard sat watching every moment, mute, impassive. I could not trust myself much longer. I knew that, in a few hours more I was bound to give way and drink the milk. My throat was parched, my tongue swollen.

I called the guard. As he stood outside the barred door I asked him to give a few drops of water at least. His reply was, 'I can't do it. I have no permission.'

Fury took possession of me. I snatched the pitcher and hurled it against the door, breaking it to pieces, spilling the milk on the guard. He thought I had gone mad. He was not far from right.

In the meantime sympathetic hunger strikes were taking place where ever there was political prisoners. A powerful mass movement had grown up to back our demands........The Meerut conspiracy case prisoners went on hunger strike after a few days. The news flashed across the seas. It created a stir in England.

World attention was focussed on conditions in Indian prisoners."

যতীন দাসের পরলোকগমনে একদিকে জাতির আকাশের বায়ুমণ্ডল কোটি কোটি নিপীড়িত জনগণের তপ্ত দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে ভারী হয়ে উঠলো। আর একদিকে উঠলো সহস্রকণ্ঠের উচ্চ ধিক্কার-ধ্বনি, ইংরেজ দুঃশাসনের চরম কুটিলতার মুখোস উন্মোচনে। আহত স্বদেশ-প্রেমী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন শান্তিনিকেতনে :

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত পানে চাহ॥
দূর করো মহারুদ্র যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ॥
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত,
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যু-ভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে নির্ঝরিয়া গলিবে যে,
প্রস্তর শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ॥

পত্র-পত্রিকায় লিখিত হল একাধিক সম্পাদকীয়। নেতৃবৃন্দ বিবৃতির পর বিবৃতি দিলেন। সেই সঙ্গে সুদূর আয়ারল্যাণ্ড থেকে প্রেরিত হল একটি আশ্চর্য তারবার্তা :

"Family Terence Mcswiny unites patriotic Indian in grief and pride on death of Jatindra Nath Das.

Freedom will come."

"যতীন্দ্রনাথ দাসের মহাপ্রয়াণে শোকাচ্ছন্ন ও স্বদেশ-প্রেমিক ভারতীয়দের সঙ্গে টেরেন্স ম্যাকসুইনির পরিবার যুক্ত করছেন তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা ও সমবেদনা। আর অংশগ্রহণ করছেন তাঁর বীরোচিত মৃত্যুর গৌরবে। স্বাধীনতা আসবেই।"

এই তারবার্তার "সেতু-বন্ধে" ভারত-আয়ারল্যাণ্ড এগিয়ে

এল আরো কাছে। আগামী দিনের বিপ্লবীরা পেলেন সার্থক অনুপ্রেরণা।

যতীন দাসের মহাপ্রয়াণের পরও ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত অনশন ধর্মঘট চালিয়ে গেলেন।

অবশেষে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বিশেষ অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করতে সম্মত হলেন। সেদিন ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৯।

এবার ফিরে যেতে হবে ফেলে-আসা দিনের বিশেষ একটি দিনে। সেদিন ২৬শে জুন (১৯২৯)। বিপ্লবীদের নিয়ে লাহোরে এক মামলা সুরু হয়েছে। নাম—লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। ধৃত ও পলাতক আসামীদের মধ্যে ছিলেন

১।	শুকদেব : ওরফে দয়াল, ওরফে স্বামী, ওরফে দেহাতি পিতা : রামলাল নিবাস : লয়ালপুর	লাহোর বোমার কারখানায় ১৫ই এপ্রিল (১৯২৯) ধৃত।
২।	যতীন্দ্রনাথ দাস পিতা : বঙ্কিমচন্দ্র দাস নিবাস : ভবানীপুর কলিকাতা।	কলকাতায় ১৪ই জুন (১৯২৯) ধৃত। পুলিস পাহারায় লাহোরে ১৬ই জুন (১৯২৯) আনীত। দক্ষিণ কলিকাতার কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক।
৩	ভগৎ সিং পিতা : কিষাণ সিং নিবাস : লাহোর।	দিল্লীতে ৮ই এপ্রিল (১৯২৯) গ্রেপ্তার। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বোমা ছোঁড়ার জন্য —১২ই জুন (১৯২৯) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

৪।	রঘুনাথ : ওরফে "এম", ওরফে শিবরাম রাজগুরু পিতা : হরি রাজগুরু নিবাস : সদাশিব পীঠ, পুণা।	
৫।	কিশোরীলাল রতন	পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর বোমার কারখানার সহিত যুক্ত।
৬।	শিব বর্মা	যুক্তপ্রদেশে সাহারানপুরে গ্রেপ্তার।
৭।	গয়াপ্রসাদ	কানপুর, সাহারানপুরে গ্রেপ্তার।
৮।	কমলনাথ তেওয়ারী	বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র, কলকাতায় গ্রেপ্তার।
৯।	জিতেন্দ্রনাথ সান্যাল	এলাহাবাদে গ্রেপ্তার ৪ঠা জুলাই (১৯২৯)।
১০।	অগ্ররাম	পাঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার লোক।
১১।	দেশরাজ	লাহোর, ডি. এ. ভি. কলেজের ছাত্র।
১২।	প্রেমদত্ত	গুজরাট, লাহোর ডি. এ. ভি. কলেজের ছাত্র।
১৩।	সুরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে	কানপুরে গ্রেপ্তার ৮ই জুলাই (১৯২৯)।
১৪।	মহাবীর সিং	যুক্তপ্রদেশের এটোয়ার জেলাবাসী।
১৫।	অজয়কুমার ঘোষ	কানপুরে গ্রেপ্তার, ৮ই জুলাই (১৯২৯)।

১৬।	বটুকেশ্বর দত্ত পিতা : জি. ডি. দত্ত	দিল্লী ব্যবস্থাপক সভায় বোমা নিক্ষেপের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

—পলাতকদের মধ্যে—

১৭। যশপাল

১৮। বিজয়কুমার সিন্‌হা—(কানপুর)

১৯। রঘুনাথ—(বেনারস)

২০। কৈলাস—(ঝাঁন্সী)

২১। চন্দ্রশেখর আজাদ—(বেনারস)

২১। ভগবতীচরণ ভোরা—(লাহোর)

২৩। সৎগুরু দয়াল (কানপুর, মে মাসে গ্রেপ্তার)

—রাজসাক্ষীদের মধ্যে—

১।	মনমোহন মুখার্জী	চম্পারণবাসী।
২।	জয়গোপাল	লাহোর বোমার কারখানায় ১৫ই এপ্রিল গ্রেপ্তার।
৩।	হংসরাজ ভোরা	লাহোর ফোরম্যান খ্রীষ্টান কলেজের ছাত্র।
৪।	রামশরণ দাস	কপূর্রতলা। লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর ওপর বোমা নিক্ষেপ মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত।
৫।	ললিত মুখার্জী	এলাহাবাদবাসী।
৬।	ব্রহ্মদত্ত	কানপুরে গ্রেপ্তার।
৭।	ফণীন্দ্র ঘোষ	বিহার (কলিকাতায় গ্রেপ্তার)।

১৯২৬ সালের দশেরা বোমা বিস্ফোরণ এবং ১৯২৮ সালে রোশেনারা গেটে দ্বিতীয় বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে মামলার অনুসন্ধান চালনা করার সময় পুলিস একটি লোকের বিবৃতি মারফত জানতে পারে যে, ভগৎ সিং ছোট পুলিস-সাহেব মিঃ স্যাণ্ডার্সের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে গভীরভাবে লিপ্ত ছিলেন।

একথাও জানা যায় যে, যে দালানে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল সেখানকার দোতলা ও তিনতলায় ওরিয়েন্টাল মহাবিদ্যালয়ের দুজন প্রাক্তন ছাত্র প্রায়ই যাতায়াত করতেন।

তাছাড়া, ১৯২৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে লাহোর-হত্যাকাণ্ডের সময় যে ধরনের রিভলবার ব্যবহার করা হয়েছিল দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভায় বোমা বিস্ফোরণের পর ঠিক সেই ধরনের রিভলবার ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং ভগৎ সিংকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করতে সরকারকে কোন বেগ পেতে হল না।

মোকদ্দমার মুখবন্ধে একথা বলা হল যে, ১৯২৪ সাল থেকে সুরু করে গ্রেপ্তার-বরণ করার পূর্ব পর্যন্ত আসামী ভগৎ সিং এবং অন্যান্য আসামীরা ব্রিটিশ-ভারতের বহু স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে রাজার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। রাজাকে ব্রিটিশ-ভারতের সার্বভৌমত্ব থেকে বঞ্চিত করে প্রতিষ্ঠিত আইনসম্মত সরকারকে গদীচ্যুত করতে এঁরা সতত তৎপর ছিলেন। এ সমস্ত কাজ সুচারু-রূপে সম্পন্ন করার জন্য অস্ত্র, গোলা-বারুদ ও মানুষ সংগ্রহ করা হয়।

দলের অর্থ-ভাণ্ডারের জন্য ব্যাঙ্ক ও সরকারী কোষাগার লুঠ করা হয়। প্রস্তুত করা হয় বোমা। ধ্বংস করা হয় রেলগাড়ি। রাজদ্রোহকর পুস্তিকা ও ইস্তাহার লেখা হয় ও বিলি করা হয়। দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদীদের পুলিসের হেফাজত থেকে অথবা কারাগার ধ্বংস করে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টাও করেন এঁরা।

বিরুদ্ধবাদী লোকদের হত্যা করা হয়। এঁরা এমন সব বিদেশী

সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেন যাঁরা ভারতের বিপ্লবের পক্ষে আগ্রহশীল।

এছাড়া তাঁদের উল্লিখিত অভিযান সিদ্ধির জন্য অন্যান্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় পন্থার আশ্রয় নিতে এঁরা কসুর করেননি।

আসামীরা—

১। ১৯২৮ সালের ১৩ই জানুয়ারি তারিখে বেনারসের গুপ্তচর বিভাগের ইনস্‌পেক্টারের (মিঃ ব্যানার্জীর) জীবননাশের চেষ্টা করেছিলেন।

২। দলের অর্থ-ভাণ্ডার পুষ্ট করতে ১৯২৮ সালের ২৬শে জুন তারিখে গোপালপুর জেলার বুরহানগঞ্জে ডাকঘর লুঠ করে ৩,১৯০ টাকা নিয়েছেন।

৩। ১৯২৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর মিঃ স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করেছেন।

৪। ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বোমা এবং পিস্তলের গুলি নিক্ষেপ করেছেন।

৫। ১৯২৯ সালের ৭ই জুন মৌলনিয়াতে ডাকাতি করেছেন।

৬। লাহোর, সাহারানপুর, বিলাসপুর, আগ্রা ও কলকাতায় বোমা প্রস্তুত করেছেন।

৭। সাইমন কমিশনের সভ্যগণের বম্বে থেকে পুণা অতিক্রম করার সময় পথে তাদের রেলগাড়ি "ডিনামাইট" দিয়ে ধ্বংস করার নিষ্ফল চেষ্টা করেছেন।

৮। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত যোগেশ চ্যাটার্জী ও শচীন সান্যালকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা করেছেন।

৯। পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে ডাকাতির চেষ্টা করেছেন।

১৯২৯ সালের ১০ই জুলাই তারিখে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীগণ 'কোর্টে' ঢুকেই বলে উঠলেন :

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্।

সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্।

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত বিচারশালায় উপস্থিত হতেই আবার সকলে সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে বললেন ঃ

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্।

সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্।

তারপর বহুদিন পর মিলনের আনন্দে একে অপরকে সাদরে আলিঙ্গন করলেন।

মামলার সুরুতে একজন আসামী তাঁর ওপর পুলিসী অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে এর প্রতিবিধান দাবি করেন।

তিনি আরও বলেন যে, "কোর্ট" যদি এর কোন বিহিত না করেন তবে তিনি নিজেই এর ব্যবস্থা করবেন।

মামলার আসামীদের মধ্যে যাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ছিল না তাঁদের সরকারী অর্থে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে সরকারী উকিল ১৯শে জুলাই তারিখে সরকারের কাছে এক দরখাস্ত পেশ করেন।

মহামান্য হাইকোর্ট ২৬শে জুলাই তারিখে সেই দরখাস্ত নামঞ্জুর করে জানান যে, অনশনী বন্দীদের সম্মতি ছাড়া তাঁদের পক্ষে উকিল নিযুক্ত করার ক্ষমতা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের নেই।

এদিকে দৈনন্দিন পুলিসী নির্যাতনের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলেন বন্দীরা।

তার ওপর যখন দেখলেন যে, বিচারক এর প্রতিকারে সম্পূর্ণ অক্ষম, অসম্মত, তখন তাঁরা বিচারের সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে, বিচারকের পক্ষে বিচারশালার কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠলো।

সেই পরিস্থিতিতে বিচারক প্রত্যেক আসামীর কোর্টে আসা-যাওয়ার সময় আলাদা আলাদা সিপাহীর হাতের সঙ্গে হাত-কড়া পড়াবার হুকুম দিলেন। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে এমন সব অবস্থার

উদ্ভব হতে লাগলো যে, "কোর্টের" পক্ষে বিচার চালনা করাই মুস্কিল হয়ে উঠলো। এর মধ্যে কোন কোন আসামী আবার "কোর্টে"ও অনুপস্থিত হতে থাকলেন। ইচ্ছা করে অথবা অবস্থার পীড়নে।

শেষ পর্যন্ত কাণাঘুষো হতে লাগলো যে, ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫৪০-বি ধারায় সংশোধন করে আসামীদের অনুপস্থিতিতে বিচার পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে।

গুজব সত্যি হল।

১৯২৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংশোধিত করতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের সভ্যমহোদয় তৎপর হলেন।

ওদিকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দীদের প্রতি সরকারী জুলুমের প্রতিবাদে সরকার-বিরোধী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর একটি মুলতুবী প্রস্তাব আনা হল।

সভা মুলতুবী রাখার পক্ষে ৪৪ জন সভ্য ভোট দিলেন।

বিপক্ষে সরকার-পক্ষে ভোট দিলেন ৫৫ জন।

সরকার-পক্ষ ১০ ভোটের ব্যবধানে পরাজয়ের হাত থেকে অল্পের জন্য অব্যাহতি পেলেন। কিন্তু বিরোধী শক্তির প্রতি সম্মান দেখিয়ে বিলটি পাশ করালেন না। পাঠালেন "সার্কুলেশনের" জন্য।

এদিকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চললো যেমন-তেমন ভাবে।

২১শে অক্টোবর (১৯২৯)—একজন আসামী রাজসাক্ষীর দিকে ছুঁড়ে মারলেন পায়ের চটি। জুতোর শক্ত ঘা খেয়ে রাজসাক্ষী ঢলে পড়লেন সাক্ষীর কাঠগড়ায়। আর দাঁড়ালেন না সেদিন।

যিনি রাজসাক্ষীকে লক্ষ্য করে জুতো ছুঁড়েছিলেন, বিচারক হুকুম দিলেন সেই আসামীর হাতে হাত-কড়া পরাতে।

পরদিন ২২শে অক্টোবর (১৯২৯), দু'হাতে হাত-কড়া পরা৽ অবস্থায় আসামীরা "কোর্টে" যেতে অস্বীকার করলেন।

কিন্তু ওঁদের আপত্তি গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে সিপাইরা ওঁদের সকলকে জোর করে বন্দী-গাড়িতে ভর্তি করে নিয়ে বিচারশালায় হাজির করলো।

২৩শে অক্টোবর আসামীরা বিচারকের কাছে অকথ্য পুলিসী অত্যাচারের শিহরিত কাহিনী নিবেদন করে প্রতিকার চাইলেন।

ওঁরা বললেন যে, কোর্টে আসার জন্য প্রস্তুত হলে ওঁদের যখন বন্দী-ব্যারাক থেকে বার করা হল, তখন সবাইকে হাতে হাত-কড়া পরাবার কথা উঠলো।

ওঁরা স্বভাবতঃই সমস্বরে প্রতিবাদ জানালে পুনরায় ফেরত পাঠান হল ব্যারাকে।

একঘণ্টা পর আবার তাঁদের "কোর্টে" আনার জন্য ডেকে পাঠান হল। তখন ওঁরা দেখলেন যে, পুলিস এক বিরাট বাহিনী নিয়ে হাজির হয়েছে। অন্তত শ'তিনেক সশস্ত্র পুলিসের সমাবেশ ঘটেছে। তার ওপর রয়েছে সমাজ বিরোধী দণ্ডে দণ্ডিত সাধারণ কয়েদীদল।

পুলিসদের হাবভাবে একথা পরিষ্কার জানা গেল যে, ওরা যে-কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওঁদের ওপর।

সাজ-সজ্জার ঘটা দেখে ওঁরা ভয় পেলেন। দু'হাতে হাত-কড়া পরিয়ে "কোর্টে" নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে ওঁরা আবার আপত্তি জানালেন। প্রতিবাদ করলেন।

তখন ক্ষুধিত পঙ্গপালের মতো পুলিস আর দণ্ডিত চোর-ডাকাত কয়েদীর দল ওঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল

সুরু হল অবর্ণনীয় অত্যাচার, প্রহার আর লাঞ্ছনা। বর্বর আক্রমণের সময় সবুট লাথি চালান হল ওঁদের পুরুষেন্দ্রিয়ের ওপর।

মাটিতে চিৎ করে শুইয়ে ফেলে মারতে মারতে গুহ্যদ্বারে আঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে দিল মৃত্যু-সম যন্ত্রণা দিতে, অপমান করতে আর জন্মের মতো শিক্ষা দিতে।

এমনিভাবে কাপুরুষ পুলিস-পশুর দল লাহোর কারাগারের বন্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে পুরো এক ঘণ্টা তাদের তাণ্ডবনৃত্য করলো কয়েকজন নিরস্ত্র অসহায় রাজনৈতিক বন্দীর ওপর, প্রচুর সংখ্যাধিক্যের জোরে আর অস্ত্র হাতে নিয়ে।

তারপর বিজয়গর্বে প্রস্থান করলো।

ঐ ধরনের জঘন্য এবং অভূতপূর্ব অত্যাচারের প্রতিবাদে ওঁরা "কোর্টকে" জানালেন যে, আগামী ২৪শে অক্টোবর থেকে ওঁরা আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন না।

এই মামলার পলাতক আসামীদের অন্যতম ভগবতীচরণ ভোরা ছিলেন হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টির অন্যতম স্তম্ভ। তিনি ছিলেন ভগৎ সিং-এর ডানহাত স্বরূপ। কেউ বা বলেন মস্তিষ্ক। ছায়ার মতো ঘোরেন তাঁর সঙ্গে। মনে হয় যেন চলেনও তাঁরই ইঙ্গিতে।

এই ভগবতীচরণ দলের জন্য কাশ্মীরী বিল্ডিং-এর ছ' নম্বর ঘর মাসিক ১৩৲ টাকা হারে ভাড়া নিয়েছিলেন। সেদিন ১৫ই মার্চ, ১৯২৯।

১৯২৯ সালের ১৫ই এপ্রিল যেদিন পুলিস এ বাড়ি ঘিরে বোমা, পিস্তল আর শুকদেবকে পায়, সেদিন ঘরের ভাড়াটিয়া ভগবতীচরণকে ধরা যায়নি।

তবু তাঁকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম প্রধান আসামীরূপে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

তার অনেক পরে, অর্থাৎ ১৯৩০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার একজন রাজসাক্ষীর মুখে পুলিস সর্বপ্রথম খবর পায় যে, ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে রাভি নদীর তীরে বোমা নিয়ে নাড়া-চাড়া করার সময় ভগবতীচরণ গুরুতররূপে আহত হন।

এবার সেদিনের সেই অবিস্মরণীয় দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে ফিরে গেলে জানা যায় যে, ভগৎ সিংকে লাহোর জেল থেকে মুক্ত করার পরি-

কল্পনার এক স্তরে (১৯৩০) দলের সভ্য হংসরাজ ওয়ারলেসের প্রস্তুত প্রায় চব্বিশটি বোমা লাহোরে এসে পৌঁছলে, তার শক্তি ও কার্যকারিতা পরখ করার জন্য শুকদেব ও ভগবতীচরণ চলে গেলেন রাভি নদীর তীরের নিবিড় ঘন বনে। তারপর কিছুক্ষণ পর্যন্ত উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধানের পর ভগবতীচরণ শুকদেবকে একটু দূরে দাঁড় করিয়ে বোমা পরীক্ষা করতে উদ্যত হলেন। এমনি পরীক্ষাকালে বোমার পলতেতে আগুন দিয়ে দূরে ছোঁড়ার সময় বোমার "সেফটি" হঠাৎ বিকল হয়ে যায়। তারপর অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে ফেটে গেল তাঁর হাতে। সঙ্গে সঙ্গে ভগবতীচরণের হাতের আঙুল গেল উড়ে। পা গেল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। চোখে ঢুকে গেল বোমার ভেতরকার টুকরো কাঁচ। নিমেষে সমস্ত দেহ হল ক্ষত-বিক্ষত। অচৈতন্য হলেন তিনি। সেখানে বইলো রক্তগঙ্গা।

শুকদেব দৌড়ে কাছে এসে সমস্ত উপায়ে, আপ্রাণ একক চেষ্টায় রক্ত বন্ধ করতে চাইলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন।

তখন সেই রক্তাক্ত, অচৈতন্য, ক্ষত-বিক্ষত দেহকে তিনি বহন করে নিয়ে গেলেন অপেক্ষাকৃত আরও ঘন বনের ভেতর। তারপর ছুটে গেলেন বিপ্লবীদের গোয়ালমণ্ডি কেন্দ্রে।

এই সাংঘাতিক খবর শুনে হংসরাজ ওয়ারলেস তক্ষুণি ছুটে গেলেন ভাওয়ালপুর রোডের কেন্দ্রে। সেখানে আর সব সতীর্থরা প্রস্তুত হয়ে বসেছিলেন ভগৎ সিংকে জেল থেকে মুক্ত করে আনার চেষ্টায়। শুকদেব রক্তমাখা কাপড় বদলিয়ে গোয়লমণ্ডিতে পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় রইলেন।

ওদিকে ভাওয়ালপুর রোডের বিপ্লবীরা তাঁদের আড্ডায় তখন রিভলবার পরিষ্কার করছিলেন। কেউ বা পরীক্ষা করে দেখছিলেন নিজ নিজ পিস্তল।

ভগবতীচরণ ভোরার স্ত্রী দুর্গাদেবী ও তাঁর ছোট ছেলে হরিও ছিলেন সেখানে। খবর শুনে সবাই দুঃখ ও বেদনায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর যতটা সম্ভব দ্রুতগতিতে অযুধ, তুলো, চারপাই,

বিছানা নিয়ে দশজন বিপ্লবী সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ রাভি নদীর দিকে রওনা হলেন। ঘণ্টাখানেক পরে ওঁরা সবাই সেখানে উপস্থিত হলেন বটে, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে জায়গা আর খুঁজে পেলেন না। তবু সবাই মিলে চালিয়ে যেতে লাগলেন আপ্রাণ অনুসন্ধান। রাত প্রায় ভোর হয়ে আসতে লাগলো। আলো-আধাঁরির চতুর্থ যামে, প্রায় চারটার সময় হঠাৎ একটা গাছের পাতার ফাঁকে দেখা গেল ভগবতীচরণ মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে রয়েছেন।

লুটিয়ে-পড়া অসহায় ভগবতীচরণ অনেক লোকের পদশব্দে চোখ মেলে তাকালেন। দেখা গেল তাঁর দেহের সমস্ত জখম জায়গায় পিঁপড়ে আর জংলী বিষাক্ত পোকা ভর্তি হয়ে রয়েছে। মনে হল, সে দেহে যেন প্রাণ নেই। যখন স্ত্রী দুর্গাদেবী ওঁর মাথা তুলে ধরলেন, তখন তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে—বহুকষ্টে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললেন :

"তোমরা সবাই এখানে এসেছ কেন?

আমি তো যাচ্ছি। আমাকে শেষ কর। আর নিজেদের কর্তব্য কর।

আমার শেষইচ্ছা যে, আজ রাত্রির মধ্যে ভগৎ সিংকে জেল থেকে যে করে হোক বার করে আনো!"

এই অভূতপূর্ব দৃশ্য ভোলা যায় না। একদিকে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর বিপ্লবীর নিজকর্তব্য পালনে অস্থিরতা, অন্যদিকে স্ত্রী দুর্গা-দেবীর, শিশুপুত্র হরির আর সতীর্থদের নিশ্চিত মৃত্যু-পথযাত্রীর প্রতি অপরিসীম মর্মবেদনাসহ তাঁকে ব্যর্থ সান্ত্বনা দেবার অন্তিম চেষ্টা।

তারপর সবার অলক্ষ্যে বিপ্লবীগোষ্ঠী তাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সতীর্থ, দেশের কাজে চরম আত্মদানকারীদের অন্যতম শহীদ ভগবতীচরণ ভোরাকে রাভি নদীর তীরে অবস্থিত গহন অরণ্যানীর আবৃত অন্ধকারে, উষা সমাগমের প্রাক্কালে হস্তধৃত সুতীক্ষ্ণ ছুরির ফলা দিয়ে মাটি খুঁড়ে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মাটি দিয়ে দিলেন

ঢেকে। বুক-ফাটা কান্না রয়ে গেল উপস্থিত প্রতিটি বিপ্লবীর বুকে। সেই দাহ তুঁষের আগুনের মতো জ্বলতে লাগলো অনির্বাণ অন্তরের অন্তঃস্থলে।

এমনিভাবে ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে ভগবতীচরণ শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁর সতীর্থগোষ্ঠী তাঁর অন্তিম ইচ্ছাকে স্মরণ করে বার বার চেষ্টা করতে লাগলেন ভগৎ সিংকে জেল থেকে বার করে আনার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যর্থ হতে লাগলেন পদে পদে। অভাবিত উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে একের পর এক বাধা আসতে লাগলো।

এল ফেব্রুয়ারি মাস। বিচারাধীন আসামী ভগৎ সিংকে পুলিস হেফাজত থেকে ছিনিয়ে আনার জন্য আবার নূতন করে শলা-পরামর্শ করা হল। এদিকে দলের অনেক সভ্যই জেলে। বাইরে প্রচুর অর্থাভাব। আর একাজে যে অর্থের ভীষণ দরকার, তা কে না জানে! কিন্তু কে দেবে সেই টাকা? কোথায় সেই উদার—নির্ভয় প্রাণ, যে বা যিনি আসবেন এগিয়ে! নিজেকে রিক্ত করে দেবেন আরব্ধ কর্তব্যকে রূপায়িত করতে! স্বাধীনতার স্বপ্নকে এগিয়ে নিতে! না, লাহোর বীরশূন্য হলেও বীরাঙ্গনাশূন্য হয়নি সেদিন।

তাই দেখা গেল, ভগবতীচরণের সদ্য বিধবা স্ত্রী মহিয়সী দুর্গা-দেবী নিঃশব্দে এগিয়ে আসছেন স্বামী-হত্যার প্রতিশোধ নিতে। স্বামীর শেষইচ্ছার মর্যাদা রাখতে বন্ধক রাখলেন নিজের সযত্নে-রক্ষিত প্রিয় স্বর্ণালঙ্কার। দলের হাতে তুলে দিলেন তিন হাজার টাকা। তাঁর যথাসর্বস্ব, তাঁর শেষ সম্বল।

এমনিভাবে দুর্গাদেবী ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের কালজয়ী ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে রইলেন। হলেন শহীদ-স্বামী ভগবতীচরণের সার্থক গর্বিতা সহধর্মিনী। তাঁর মৃত্যুর পরেও।

এই দুর্গাদেবীর চোখে ভগৎ সিং ছিলেন যোগী পুরুষের ন্যায় মহান এক নমস্য ব্যক্তি। যিনি সকল প্রকার ভোগ-বিলাসের সুযোগ পেয়েও উদাসীন ও নির্লিপ্ত ছিলেন। কেবল নিজ কর্তব্য-পালনে তৎপর ও একনিষ্ঠ ছিলেন।

এদিকে ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল সারা বাংলা, তথা ভারতের আসমুদ্র-হিমাচলকে কম্পিত করে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম-শাখা চট্টগ্রামের ইংরেজ সরকারের অস্ত্রাগার দখল করে নিলেন।

ইংরেজের দম্ভ গেল চূর্ণ হয়ে। ওরা ভয়ে ভীত, নির্জীব আর মৃতপ্রায় হল। প্রকৃতপক্ষে সেদিন রাত্রে কোন ইংরেজ চট্টগ্রামে না থেকে কর্ণফুলী নদীর মধ্যে জাহাজের ভেতর ঘন ঘন পরিত্রাতা যীশুর নাম উচ্চারণ করে রাত্রিযাপন করেছিলেন।

ওদিকে বিপ্লবী দলের সভ্য হিমাংশু সেন পেট্রোলের আগুনে আকস্মিকভাবে অগ্নিদগ্ধ হলেন। চন্দনপুরার নিরাপদ আশ্রয়ে হলেন স্থানান্তরিত। তবু ১৯শে এপ্রিল তারিখে ধৃত হলেন।

তারপর ২৮শে এপ্রিল (১৯৩০) তারিখে চট্টগ্রাম-জেল হাসপাতালে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

* * *

১৯৩০ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীগণ শহর থেকে দূরে চিরস্মরণীয় জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে জয়ী হয়েও হারালেন দলের বারটি অমূল্য বিপ্লবীর প্রাণ :

হরিগোপাল বল (চট্টগ্রাম)

ত্রিপুরা সেন (ঢাকা)

নির্মল লালা (হাওলা, চট্টগ্রাম)

বিধু ভট্টাচার্য (লেশিয়ারা কুঠি, কুমিল্লা)

নরেশ রায় (ময়মনসিং)

প্রভাস বল (কানুনগো পাড়া, চট্টগ্রাম)

শশাঙ্ক দত্ত (চট্টগ্রাম)

জিতেন দাশগুপ্ত (গৈরালা, চট্টগ্রাম)

মধুসূদন দত্ত (চট্টগ্রাম)

পুলিন বিকাশ ঘোষ (গোসাইডাঙ্গা, চট্টগ্রাম)

২২শে এপ্রিল তারিখে জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে আহত এবং মৃত বলে দলের লোক দ্বারা পরিত্যক্ত মতিলাল কানুনগো শত্রুর উপস্থিতিতে জালালাবাদ পাহাড়ে শেষনিঃশ্বাস ছাড়লেন ২৩শে এপ্রিল। জালালাবাদের যুদ্ধে আরেকজন গুরুতররূপে আহত, অর্ধেন্দু দস্তিদার (ধলঘাট, চট্টগ্রাম) পুলিস হেপাজতে প্রাণত্যাগ করলেন চট্টগ্রামের হাসপাতালে, ১৯৩০ সালের ২৪শে এপ্রিল ।

দলের অন্যতম বিপ্লবী অমরেন্দ্র নন্দী চট্টগ্রামের বুকে প্রাণ বিসর্জন দিলেন পুলিসের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে ১৯৩০ সালে ২৪শে এপ্রিল ।

*   *   *

১৯৩০ সালের ৬ই মে চট্টগ্রামের কালারপুলে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান সৈন্যবাহিনীর (চট্টল-শাখা) আরও চারজন বিপ্লবী সভ্য প্রাণ দিলেন পুলিসের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধ করে।

স্বদেশ রায়	সেদিন ওঁদের পতাকায় লেখা ছিল :
রজত সেন	"ওরা দু'পায়ে দলে গেল মরণ শঙ্কারে।
দেবপ্রসাদ গুপ্ত	সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে।"
মনোরঞ্জন সেন	

অপর দিকে,

১৯৩০ সালের এই মে মাসে সরকার এক অর্ডিনান্স জারী করে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার প্রাথমিক বিচারের পরিসমাপ্তি ঘটালেন।

উদ্ভব হল দ্বিতীয় পর্যায়।

সেই মর্মে সরকার তার দ্বিতীয় ঘোষণায় তিনজন বিচারক

নিয়ে এক বিশেষ আদালত গঠন করার ক্ষমতা দিলেন পাঞ্জাবের প্রধান বিচারপতিকে।

১৯৩০ সালের ১৭ই মে তারিখে পাঞ্জাবের প্রধান বিচারপতি দ্বারা গঠিত ট্রাইবুনাল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের "কোর্টে" হাজিরা দেওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি দিলেন।

১৯৩০ সালের ১১ই জুলাই ট্রাইবুনাল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ১৪জন আসামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী অভিযোগ গঠন করলেন।

এই ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে ভগৎ সিং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সতীর্থদের সুবিধে-অসুবিধের কথা ভেবে বাইরের বন্ধুদের কাছে জেল থেকে তিনি যেসব চিঠি লিখেছিলেন, তার একটি এবার তুলে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে, তাঁর বন্ধু-প্রীতি সম্পর্কে আমরা একটি পরিষ্কার ধারণা রাখতে সক্ষম হব :

"Please enquire from the Librarian, Dwaraka Dass Library, Lahore, if any books have been sent to the Brostal jail people. They are terribly short of Books. They have sent one list through Jaidev, brother of Sukdev, but no books have been received. If they are not in possession of that list, kindly ask LalaFeroz Chand to send some interesting books of his choice instead. This sunday when I go they should be already in receipt of books. Kindly see that it is done without fail."

"লাহোরের দ্বারকা দাস গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক-এর কাছে খোঁজ নিয়ে জানুন যে, ব্রোষ্টাল জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য কোন বই পাঠান হয়েছে কিনা!

ওঁরা কিন্তু বইয়ের অভাবে খুবই অস্বস্তিকর পরিবেশে দিন কাটাচ্ছেন। শুকদেবের ভাই জয়দেবের মারফত যে সব বই পাঠান হয়েছিল তার একটিও ওঁরা পাননি। যদি দ্বারকা দাস গ্রন্থাগারে বইয়ের তালিকাটি না থেকে থাকে, তবে, লালা ফিরোজ চাঁদকে বলুন যে, অন্ততঃ তাঁর পছন্দমতো কিছু ভালো ভালো বই যেন ওঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই রবিবারে আমি যাচ্ছি। এর আগেই যেন ওঁরা বইগুলি পান। আশা করি এর অন্যথা হবে না।

ওদিকে বাংলাদেশে,

১৯৩০ সালের ২৫শে আগষ্ট কলকাতার পুলিস-প্রধান মিঃ টেগার্টকে হত্যা করার চেষ্টায়, (ডালহাউসী স্কোয়ারের পূর্বদিকে) বোমা নিক্ষেপের সময় নিজেদের বোমা-দ্বারা মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন বিপ্লবী অনুজাচরণ সেনগুপ্ত।

১৯৩০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের অংশীদার ফেরারী বীর বিপ্লবী মাখন ওরফে জীবন ঘোষাল করলেন সম্মুখ-যুদ্ধে আত্মদান—ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের গোঁদলপাড়ার আশ্রয়কেন্দ্রে।

ভগৎ সিং-দের লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা ১৯২৯ সালের ২৬শে জুন থেকে সুরু হয়ে ক্রমশঃ আঁকা-বাঁকা পথে কখনো এগোচ্ছিল, কখনো ঝিমিয়ে বা পিছিয়ে পড়ছিল।

তাই, এই দীর্ঘস্থায়ী মামলা কবে যে শেষ হবে, সে সম্পর্কে কেউ কোন স্থির ধারণা করতে না পেরে মনে মনে সন্দিগ্ধ ও তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠছিল।

শেষপর্যন্ত সকল সন্দেহ ভঞ্জন করে "ট্রাইবুনাল" ১৯৩০ সালের ৭ই অক্টোবর তাঁর সুচিন্তিত রায় দিলেন :

(১) ভগৎ সিং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২১ ও ৩০২ এবং বিস্ফোরক আইনের ৪-বি ধারা অনুসারে—

(২) শিব রাজগুরু ওরফে. "এম" দণ্ডবিধির ১২১ এবং ৩০২ ধারা অনুযায়ী—

(৩) শুকদেব দণ্ডবিধির ১২১ এবং ৩০২ ধারা ছাড়াও অন্যান্য ধারা মতে আইনের চোখে দোষী বলে প্রমাণিত হলেন।

তাই ন্যায়-বিচারকগণ ভগৎ সিং, রাজগুরুও শুকদেব, এই তিনজনকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে ইংরেজ শাসনের অসীম মর্যাদাকে রক্ষা করলেন।

৮ জনের হল দ্বীপান্তর।

ট্রাইবুনালের রায় শুনে সর্দার ভগৎ সিং মাথা উঁচু করে বললেন:

"জেলে পচে মরার চাইতে ফাঁসিতে মরা ঢের ভালো।"

এই ভগৎ সিং বিচারক মিঃ ফোর্ডেকে (Forde) উচ্চ আদালতে মামলা চলা কালে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন:

"If a man construct a bomb in such a manner that it could not seriously injure any one and takes the utmost precaution that its explotion could not cause such an injuiry, would he be guilty of attempted murder ?"

"আচ্ছা, যদি কেউ একটি বোমা এমনভাবে তৈরি করে, যাতে কোন লোক জখম হবে না কিংবা বোমা ফাটলেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না; তবে কি তাকে হত্যার চেষ্টার দায়ে ফেলা যাবে?"

বিচারক ফোর্ডে উত্তরে বললেন:

"You have to show that the nature of the bomb was such and it was thrown in such a manner as not to endangar human life."

---

*দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভায় বোমা নিক্ষেপের মামলার শেষের দিকে।

"তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, বোমাটি তৈরির সময় কারুর কোন ক্ষতি যাতে না হয় সেই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল এবং ছোঁড়ার সময়ও এমনভাবে ছোঁড়া হয়েছিল যে, তাতে কোন বিপদ ঘটবার সুযোগ-সম্ভাবনা ছিল না।"

ভগৎ সিং তখন বললেন: "We know the limited capacity of the bombs and took all possible precaution to prevent injury to any one. But General Dyer had killed hundred of person in the Jallianwallabagh, but was never put in jail. He was on the contray, given lakhs of rupees as a reward by his countrymen.

In contrast, we are tried and given a life sentence. We did not intend to kill any one. Let the word 'malice' be taken out and I am satisfied. We employed certain means to achieve our ideal."

"আমরা আমাদের তৈরি বোমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিলাম এবং আমাদের বোমা নিক্ষেপের ফলে যাতে কোন লোক আহত না হয় সেজন্য সকল প্রকার সাবধানতাও অবলম্বন করেছিলাম।

কিন্তু, সেনাপতি ডায়ার, যিনি জালিয়ানওয়ালাবাগে শত শত মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করলেন, কই তাঁকে তো কেউ গ্রেপ্তার করল না? কই, তাঁর তো কোন বিচার হল না? অপর-পক্ষে, তাঁকে তাঁর দেশবাসী (ইংরেজ) এক মনুষ্যঘাতী জঘন্য কার্যের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কারস্বরূপ দিয়েছেন।

আর আমাদের দেওয়া হল কিনা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড!

কিন্তু আমরা তো কাউকে খুন করতে চাইনি! যাক্, আমি চাই যে, আপনার রায়ের ভেতর থেকে "malice" কথাটা তুলে নেওয়া হোক! তাহলেই আমি খুশি। আর কিছু চাইনে।

আমাদের কিছু আদর্শ ছিল। আর সেই আদর্শের দুয়ারে

উপস্থিত হবার জন্য আমাদের কোন উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে, এইটুকুই আমি কেবল বলতে পারি।"

যে মামলায় ১৯৩১ সালের ৭ই অক্টোবর ভারতের একজন ইংরেজ বিচারপতি ভগৎ সিং ও লাহোর মামলায় অন্যান্য বন্দীদের প্রতি দিয়েছিলেন চরম ও কঠোরতম শাস্তি—

১৯৪৭ সালে সেই মামলাকে স্মরণ করে ভারতের আরেকজন বিচারপতি গাইলেন তাঁদের প্রশস্তি :

"এটা মামলা নয়; এটা বিদ্রোহ। এটা ষড়যন্ত্র নয়; এটা দেশপ্রেম। এটা রহস্য নয়; এটা পরাধীনতা ও দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা ও মুক্তিলাভের অভিযান। এটা গল্প নয়; এটা সত্যি ঘটনা। এটা বিদ্রোহের, বিদ্রোহীর, বিপ্লবের ও বিপ্লবীর আত্মকথা। ......এটা হল ভারতের যৌবন তরঙ্গ. ভারতীয় যুবকের জন-জাগরণ।

এটা অগ্নিযুগের জাতীয় শিক্ষা, যার আলো-করা পথে বর্তমান ভারত ফিরে পেয়েছে তার বহুদিনের স্বাধীনতা।"*

এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ পথে আসে আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

সেদিন ১৯৩১ সালের ৮ই জুলাই। স্থান : কলিকাতা পৌরসভা। বিষয় : শহীদ দীনেশ গুপ্তের ফাঁসিতে দুঃখ প্রকাশ করে পৌরসভা-নায়ক বিধানচন্দ্র রায়ের অবিস্মরণীয় ভাষণ :

"......ইতিহাসে আমরা এমন অনেক কাহিনী পাঠ করিয়াছি যে, যাঁহারা একসময় এরূপ কাজের জন্য দণ্ডিত হন, পরবর্তীকালে তাঁহারাই আবার আত্মোৎসর্গকারী বলিয়া বন্দিত হন।

*কলিকাতা সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের বেতার-ভাষণের অংশ। ১৯৪৭, ৭ই ফেব্রুয়ারি, বেতার জগৎ, কলিকাতা।

সুতরাং, আসুন আমরা সকলে যে যুবক তাঁহার আদর্শের অনুসরণে অবিচলিত সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।"

এদিকে বাংলাদেশে এই ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিং চড়াও করে বেলা এগারটা নাগাদ তিনজন দুঃসাহসী বিপ্লবী যুবক নিহত করলেন কারা-বিভাগের ইনস্‌পেক্টার জেনারেল অত্যাচারী মিঃ সিম্পসনকে।

আহত করলেন আইন-বিভাগের সচিব মিঃ নেলসনকে। এই দুঃসাহসী বিপ্লবীদের প্রধান বেঙ্গল ভলেনটিয়ারের মেজর ও রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের অধিনায়ক বিনয় বসু ইতিপূর্বে ঢাকা মিটফোর্ড স্কুল হাসপাতালে পুলিস ইনস্‌পেক্টার জেনারেল মিঃ লোম্যানকে গুলি করে হত্যা করেছেন ২৯শে আগষ্ট (১৯৩০) তারিখে।

সাংঘাতিকভাবে আহত করেছিলেন মিঃ লোম্যানের সঙ্গী পুলিস-সুপার মিঃ হডসনকে।

তারপর ছিলেন ফেরার।

আজকের আর একটি চমকপ্রদ ঘটনার পরিসমাপ্তিতে তিনি নিজে পটাসিয়াম সায়নায়েডের তীব্র বিষ খেয়ে এবং রিভলবারের গুলি ছুঁড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন।

অপর দুই সঙ্গীর অন্যতম বেঙ্গল ভলেনটিয়ারের লেফটেনেণ্ট বাদল, ওরফে সুধীর গুপ্ত পূর্ব-নির্দেশ অনুযায়ী বিষাক্ত পটাসিয়াম সায়নায়েড গ্রহণ করে বরণ করলেন বীরের ইচ্ছামৃত্যু। সেইদিন, সেইক্ষণে।

তৃতীয় সঙ্গী বেঙ্গল ভলেনটিয়ারের ক্যাপ্টেন সহ-অধিনায়ক দীনেশ গুপ্ত পটাসিয়াম সায়নায়েডের কাঁচের পুরিয়া মুখে নিয়ে নিজের মাথা লক্ষ্য করে গুলি দ্বারা আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন, কিন্তু এড়াতে পারলেন না মারাত্মক জখমকে।

সাংঘাতিকভাবে আহত বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত হলেন।

ছুদিন পর, ১৯৩০সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে বিনয় বসু সবার অলক্ষ্যে নিজ মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে মাথার ঘায়ের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে ক্ষতকে বিষাক্ত করে দিলেন।

ইচ্ছামৃত্যুকে এবার সুনিশ্চিত করলেন।

ফলে, ১৯৩০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

দেশের সামনে রাখলেন বিপ্লবী-চরিত্রের এক অশ্রুতপূর্ব অসম সাহসিক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ওদিকে—ভগৎ সিং-এর ফাঁসির আদেশের কথা রাষ্ট্র হয়ে যাওয়ায় সারা ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সুরু হল প্রবল উত্তেজনা। যা পরিণত হল আন্দোলনে।

এই ভগৎ সিং সম্পর্কে তাঁর প্রাক্তন সহ-বন্দী, ভারতের সাম্যবাদী দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ (প্রবন্ধ ও ভাষণ, মস্কো, ১৯৪২, পৃঃ ১৪) বলেছেন:

"আমাদের কথোপকথন এক একসময় আমাদের বিগত বিপ্লবী জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এসে পড়ত।

১৯১৫।১৬ সনের শহীদদের, বিশেষ করে, শহীদ কর্তার সিং-এর কথায় যখন ভগৎ সিং আসতেন, তখন তাঁর মুখের চেহারায় এক আশ্চর্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হত।

এই কর্তার সিং ছিলেন প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সর্ব প্রধান ব্যক্তি। শহীদ কর্তার সিং যখন দেশের জন্য ফাঁসিতে আত্মবিসর্জন করেন, তখন আমি বা ভগৎ সিং নেহাতই ছেলেমানুষ ছিলাম।

কিন্তু আমরা তখনই শুনেছি যে, বাবা সোহন সিং ভাক্‌না,

বাবা রুর সিং, পৃথ্বী সিং আজাদের সহকর্মী সেই ১৮ বছরের যুবক কি করে গদর দলের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের আসনে বসেছিলেন।

ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের উদ্দেশ্যে তিনি গদর দলের সতীর্থদের সঙ্গে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯১৫।১৬ সালে।

কর্তার সিং ছিলেন একজন নির্ভীক যোদ্ধা আর অদ্ভুত সংগঠক। তাঁকে তাঁর শত্রুরাও পর্যন্ত প্রশংসা করত।

আমি তো বলতে গেলে কর্তার সিংকে পুজোই করতাম।

আর আমার আদর্শ বীর পুরুষ সম্পর্কে যদি কেউ অনুপ্রাণিত হয়ে কথা বলতেন, তাতে স্বভাবতই আমি আনন্দে উৎফুল্ল হতাম।" (পিউপিলস্ পাথ, মার্চ, ১৯৪৮; পৃঃ ৫১)

"Our talks drifted to past attempts at revolution and a change came over Bhagat Singh as he spoke of the Martyrs of 1915-16 and especially of Sardar Katar Singh, the central figure of the first Lahore conspiracy case. Neither of us had met Kartar Singh, he had already been hanged when we were yet kids but we knew how he, then a mere youth of 18 and a comrade of Baba Sohan Singh Bhakna, Baba Rur Singh and Prithwi Singh Azad, had became the undisputed leaderof the Ghadar party who came to India in 1915-16 with the aim of organising armed revolt aganist British rule. A fearless fighter and a superb organiser, Kartar Singh was a man admired even by his enemies. I literally worshipped him and to hear one talk inspirangly of my hero was a great pleasure."

ভগৎ সিং সম্পর্কে বাবা সোহন সিং ভাক্না তাঁর আত্মচরিত, "জীবন সংগ্রামে" বলেছেন :

(পৃঃ ৭৩। ৭৪, পিউপিলস পাথ, মার্চ, ১৯৬৮)

ভগৎ সিং এবং তাঁর সহ-বন্দীরা লাহোর জেল থেকে ব্রোষ্টাল জেলে এলেন নূতন মামলার আসামী হয়ে।

আমি আর বাবা কেশর সিং থাট্টগড় তখন সেখানে ছিলাম। কোন না কোন উপায়ে আমি ভগৎ সিং-এর সঙ্গে দেখা করতাম। একদিন তাঁকে ঠাট্টা করে বললাম :

"তুমি তো দেখছি বেশ লেখা-পড়া জানা ছেলে! তবে এসবের মধ্যে জড়িয়ে গেলে কি করে?"

"যদি কর্তার সিং সরাবা আর তাঁর সাথীরা ফাঁসিতে প্রাণ না দিতেন আর আপনাদের মতো মহাত্মারা যদি নরক-তুল্য আন্দামান থেকে এখানে উপস্থিত না হতেন, তবে হয়তো আমি কোনদিনই এপথ মাড়াতাম না।"

আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন :

"আমাদের দল শুধু টেররিজম করতে এপথে আসেনি। আমরা ব্রিটিশের নাগপাশ থেকে ভারতমাতাকে উদ্ধার করতে চেয়েছি। আপনাদের গদর দল ১৯১৪।১৫ সালে আমাদের সুমুখে যে পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন আমরা সেই পথ ধরেই চলেছি।

স্যাণ্ডার্স-হত্যা কিংবা সংসদে বোমা নিক্ষেপ, এ সব কিছুর উদ্দেশ্যই হল ব্রিটিশকে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝানো যে, আমরা তোমাদের চাইনে।"

সর্দার ভগৎ সিং-এর ফাঁসির আগে এবং পরে লাহোর কারাগারের গদর দলের সভ্যদের কাছ থেকে তিনি সব সময় অনুপ্রেরণা, প্রীতি ও ভালবাসা পেতেন। তার মধ্যে প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বাবা চুহার সিং ছিলেন

অন্যতম। বাবা চুহার সিং প্রায়ই জেলের ভেতরে ভগৎ সিং-এর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হতেন।

তেমনি এক সাক্ষাতের দিনে ভগৎ সিং বলেছেন :

"বাবাজী, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ জনপ্রিয়তার ধার ধারে না।"

"গান্ধী-ভাইসরয় দেখা-সাক্ষাৎ চলছে। কিন্তু এসব দেখা-সাক্ষাতে বাস্তবিক আমাদের কোন উপকার হবে না। আমরা তিনজন মুক্তি পাব না, ফাঁসিতেই ঝুলব। কংগ্রেসের নীতি হল দুর্বল, সংশোধন-পন্থী। আর নিয়মতান্ত্রিকদের দিয়ে বিপ্লবীদের কোন স্বার্থই কোনদিন রক্ষিত হয় না। ওরা শত্রুর হাতই শক্ত করে। সুবিধাবাদী শত্রু নিজের জান বাঁচাতে, দর কষাকষি করে,—কিছু ছেড়ে, কিছু দিয়ে চুক্তি সম্পাদন করে বটে, কিন্তু সেই চুক্তিকে কার্যকরী করার কথা যখন ওঠে, তখন সেই চুক্তিপত্র ওরা নিক্ষেপ করে আবর্জনার স্তূপে। অতীতে এমনি কত হল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সব ফাঁকা। সব মিছে।

বাবা উত্তরে বললেন : "হ্যা, তুমি যা বলেছ সবই সত্যি"।

ভগৎ সিং-এর অনুরোধে বাবা চুহার সিং সন্ত রণধীর সিং নারাংওয়ালার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করেছেন। এই সন্তজী ছিলেন গদর দলের আর-একজন যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত সর্বজন-শ্রদ্ধেয় বন্দী।

সাক্ষাতের সময় সন্তজী ভগৎ সিংকে বললেন : "নিরাশ হয়ো না। ভগবান আছেন। নির্ভীক হও। ভয়শূন্য হও। হয়তো বা ভগবান অঘটনও ঘটাতে পারেন! তাঁর কথা কে বলতে পারে! আর তখন হাসতে হাসতে কারাগারের বাইরে চলে যেতে পারবে।"

ভগৎ সিং জবাবে বলেছিলেন :

"সন্তজী, চিন্তা করবেন না। দেখবেন আমার আত্মা ঠিক হাসতে হাসতে বেড়িয়ে যাবে। দেহটা হয়তো পড়ে থাকবে।"

(পিউপিলস পাথ, মার্চ, ১৯৬৮, পৃঃ ৫৬)

এই ভগৎ সিং-এর লেখাপড়ার দিকে বরাবর তীব্র ঝোঁক্ ছিল। তাই তাঁকে নিবিড়ভাবে পড়তে দেখা যেত ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের মতামত। এছাড়া ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, মার্কসবাদের অনুসরণে সরকারী রাষ্ট্রের রূপ, পরিবারগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের ক্রম-বিকাশ নিয়ে লেখা বইও তিনি পড়তেন। আর শুধু পড়া নয়, পড়া শেষে খাতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্য লিখে রাখতেন। উদ্ধৃতিও লিপিবদ্ধ করতেন। তদুপরি ভলতেয়র, রুশো, ভিক্টর হুগো, গোর্কী, লেনিন প্রমুখ বিশিষ্ট লেখক ও ব্যক্তিদের লেখাও তিনি পড়তেন প্রচুর।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তিনি ছিলেন উৎসাহী পাঠক। জেল-খানায় প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার একখণ্ড রায়ের নকল ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে।

এবার আরো কিছু বলার আগে একটিবার ক্ষণিকের জন্য পেছনে ফিরে যাব।

ভগৎ সিং যে বিপ্লবী চরিত্রকে সামনে রেখে হাসতে হাসতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে গিয়েছিলেন নির্ভয় নিশ্চিন্তে, সেই শহীদ কর্তার সিং সুরাবার আদর্শ ও নিষ্কলুষ জীবন-গাঁথার দু' একটি পাতা উল্টে যাচ্ছি। সাংবাদিক ভগৎ সিং-এর ভাষায়, কথায় আর লেখায়ঃ

(Trauslation by Darshu Singh, Kartar Singh Sarabha by Bhagat Singh)

KARTAR SINGH SARABHA

BY SHAHEED BHAGAT SINGH

When he sacrificed himself at the alter of freedom, this supreme devotee of the war-sword, revolutionary Kartar Singh was not even 20 years of age. He appeared from without like a storm-kindled fire and

tried to awaken "the dreaming war-sword." He created a world of revolt and he himself was destroyed in it. What was he ? Where did he come from suddenly ? Where did he go all atonce, we did not know much about it. One is wonderstruck to think ,of his brave deeds at his age of 19. One rarely finds so much courage, so much self-confidence and so much devotion. India has produced only a small number of persons who were so rebllious in the true sense of the word. Kartar Singh tops the list of these chosen few. Revolution was in his blood, His aim, desire and hope lay in a revolution. He lived and died for it.

He was born in 1896 in village Sarabha in Ludhiana district. He was the only son of his parents. His father died very young. But his grand-father brought him up with utmost care. Aftrer passing his ninth class, he went to his uncle. He passed his matriculation there and joined a college. Those were the days of 1910-11. He had the opportunity to study books from outside the narrow sphere of his academic curriculum. This was the time of struggle. His patriotism was kindled in this atmosphere.

He had the desire to go to America after this. The people at home did not oppose and he was sent to America. He reached San-Francisco in 1912. He was hurt at every step in that country. He went simply mad on hearing the words "Damn the Hindu" and "Black man" from the whites. He could see the

national pride in peril at every step. He could see the helpless India in chains, whenever he remembered his home. His soft heart started hardening by and by and the determination to sacrifice life for the motherland's freedom gained strength.

RESTLESS SPIRIT

It was impossible for him to live in peace. He was always faced by the question mark of his country's freedom in case the peaceful methods failed. Then without thinking more, he started organizing the Indian workers there. He would sit for hours with them and tell them that, death was a thousand times better than the life of insult in slavery. Other people joined him after the work started. These people held a special meeting in May, 1912. Some chosen Indians attended it. All pledged to sacrifice their lives and property for India's freedom. Bhagwan Singh, the externed patriot from Punjab, reached there subsequently. Public meetings were held in a quick succession. Advice was given. Work led to more work. The field was ready. Then the need of a newspaper was felt.

A paper named *Ghadar* (Rebellion) was brought out. The first issue was published in November, 1913. Kartar Singh was on its editorial stalt. His pen had

boundless enthusiasm. The members of the editorial staff printed the newspaper by a hand press. Kartar Singh was an ever happy revolutionary young man. When he was tired after working the press, he would sing the Punjabi song :

"Seva desh di jindriey bari aukhi
Gallan karnian dher sukhalian ne
Jinhan desh-seva vich pair paiya
Unhan lakh mussebtan jhallian ne."

Everyone was encouraged by the hard work and devotion of Kartar Singh. How will India become free ? Anybody else might not have pondered over this problem, but Kartar Singh had thought a lot about it. During this period, he entered an airline and started mastering aviation techniques wholeheartedly.

In September, 1914, the ship Kama Gata Maru had to go back after facing indescribable tyrannies at the hands of the White Government. Then, our Kartar Singh flew to Japan alongwith Gupta, the revolutionary and an American anarchist Jack and met Baba Gurdit Singh at Kobe.

'GHADAR'

The 'Ghadar' and 'Ghadar Di Goonj' (Echo of the Rebellion) and many other books were printed at and distributed from the Ghadar Press of Yugantar Ashram at San-Fransisco. The propaganda gained

momentum day by day. Enthusiasm was on the increase. The flag of independence was hoisted at a general meeting in Stockton in February, 1914 and a pledge was taken in the name of equality and freedom. Kartar Singh was one of the speakers at this meeting. All declared that, they would spend their hard-earned money in the freedom struggle. Days passed by. All of a sudden, they got the news of the breaking out of World War-I in Europe. All sang in a chorus.

"Chalo chaliye desh nu yudh karne
Eho aakhri bachan furman ho gaye".
(Let us go the country for a battle.
These last words have become orders.)

Kartar Singh preached "return to the country" with vigour. Then he himself boarded a ship and reached Colombo (In those days, the immigrants from America, proceeding to Punjab, were detained by the Government).

Only a few could reach home safe. Kartar Singh reached safe. Work was started vigorously. Orzanization was lacking. But that was made up somehow. The Maratha young man Vishnu Ganesh Pingle also arrived in December, 1914. Sachindra Nath Sanyal and Rash Behari Bose also came to Punjab. Kartar Singh seemed to be present everywhere, on every occassion. One day he would attend the secret meeting at Moga and the next day he would be included in the front line propagandists among the Lahore students.

On the next day he would be negotiating with the Ferozepur Cantonment soldiers. When the problem of scarcity of funds arose, he suggested "dacoity". Many people were wonderstruck on hearing of a dacoity. But he told that there was no harm in that and that Bhai Paramanand too agreed to that. He was detailed for getting it verified from Bhai Paramanand. Without meeting him, he told them, "I have asked him, he has agreed to it." He could not tolerate that rebellion should be delayed only because of the scarcity of funds.

One day they visited a village for committing a dacoity. Kartar Singh was leading.

MOVING SCENE

Dacoity was being commited. There was an extremely beautiful girl in the house. One man could hold no longer and grabbed the girl's hand. She confused and raised a hue and cry. Kartar Singh came near suddenly and placing his pistol on the man's forehead, disarmed him and shouted at the top of his voice : "Your offence is very serious, you are a sinner and you deserve capital punishment. But circumstances dictate you to be acquitted. Accept this girl as your sister, go down on your knees and ask her to forgive you. Then request the mother to excuse you for your shameful act. You will be left alive only if they forgive you, otherwise you will be shot

dead". He did the same. Things had not gone as that. Tears swelled in the eyes of the mother and she addressed Kartar Singh lovingly : "How has a religious and god-fearing youngman like you been involved in an act like this, my son ?" Kartar Singh, too, was overwhelmed and said : "We are not doing this for the love of money. We are risking everything for this dacoity. We are preparing for a revolt against the British Government. Money is needed for buying arms. Where should we get that from ? We have been forced to adopt this measure because of this great task, mother." It was a very moving scene. The mother said again : "We are to get this girl married. Money is needed for that. It will be very good if you leave something for that." He placed all the money in fornt of the mother after this and said : "Take as much as you desire." The old woman took some and gave the rest to Kartar Singh of her own accord and blessed : "Success be yours, my son." This incident shows, how sentimental, how pure and how large-hearted was Kartar Singh even in a horrible act like dacoity.

Preparations were made for a revolt in February, 1915. Alongwith Pingle and two or three other comrades he visited Agra, Kanpur, Allahabad, Lucknow, Meerut and other places in first week and contacted people at these places. The long-awaited day was approaching at last. The 21st day of Feb-

ruary, 1915 was fixed as the day of revolt in India. Preparations were a foot. But precisely at this very time a rat was gnawing at the roots of this tree of hopes. It was suspected four or five days in advance that, everything would collapse because of Kripal Singh's treason. It was because of this fear that Kartar Singh asked Rash Behari Bose to advance the date of revolt to 19 February instead of 21 February. Kripal Singh got a clue to this too. The existence of only one traitor in this revolutionary group was responsible for this dangerous result. In the absence of proper arrangements, Kartar Singh and Rash Behari Bose could not keep the secret. What else except India's misfortune could this be attributed to ?

According to a later decision, Kartar Singh alongwith about 60 comrades reached Ferozepur. He met the Hawaldar, a comrade of his and inquired about the revolt. But Kirpal Singh had already done away with the plan. The Indian soldiers were disarmed. Arrests began in a quick succession. The Hawaldar refused help. Kartar Singh's attempt fell through dismayed, he returned to Lahore. Arrests were in full swing in the Punjab. Comrades, too began to desert. Rash Behari Bose was lying in Lahore in this sad state. Kartar Singh also came there and stretched himself on the same charpai with his face in the opposite direction. No words were

exchanged. Each could guess the depth of other's thoughts. How can we guess their state of mind ?

"Dare tadbir par sir phorna shewah raha apna,
Vasile hath hi aae na. Kismat aazmai ke."

(To strike our foreheads at the door of planning has been our sacred duty. But we never caught hold of the means to try our luck).

SUPREME WISH

It was his desire that there should be fighting somewhere and he should sacrifice his life in the process. Then he came to chak No. 5, near Sargodha and again talked of a rebellion. He was arrested and chained. The fearless rovolutionary Kartar Singh was brought to the Lahore railway station. He said to the police captain : "Mr. Tomkin, please bring me something to eat". What an ever-happy mind it was ! Everyone, whether a friend or a foe, was pleased to see this attractive personality.

He was very happy at the time of his arrest. He would usually remark : "After I die bravely and courageously confer on me the title 'revolutionary'. If anyone wishes to remember me, let him remember me as Revolutionary Kartar Singh". The court took up his case. Kartar Singh was only eighteen and a half at that time. He was the youngest of all the accused persons. But about him, the magistrate wrote : "He is one of the most dangerous of the accused. During

the journey to America and afterwards in India, there is no part of this conspiracy, in which he has not played an important role".

He was called upon to record his statement one day. He owned everything and made a statement admitting the offence. The magistrate looked at him in astonishment, the end of his pen held in between his teeth, and he did not record even a single word. He said afterwards : "Your statement has not been recorded today. Kartar Singh, think and then make your statement. Do you know what your statement can lead to ?" Observers tell that, at these words of the magistrate Kartar Singh said only these words with a sentimental gesture : "What else can you do except condemning me to death ? We are not afraid of it". Then court rose for the day.

Kartar Singh again began his statement the next day. The judges thought that Kartar Singh was making that statement at the instigation of Bhai Parmananda. But they could not scale the depth of the heart of Kartar Singh, the revolutionary. Kartar Singh's statement that day was more forceful and fiery ; and he owned the offence again. He stated in the end :

"I will get life imprisonment or capital punishment for the offence. But I will prefer the later so that after re-birth, I may, again, be prepared for the struggle for India's independence. I will die again and agin till India becomes free. This is my last wish."

GLORY OF DEATH

The judges were greatly moved by his bravery. Not calling it an act of bravery like an open-minded foe, they named it as "an act of shamelessness". Kartar Singh received not only abuses, but also the death sentence ! He thanked the judge with a smile. Kartar Singh was in a condemned cell. His grand-father came and said : "For whom you are dying, Kartar Singh ? For those who are abusing you ? It is also not clear whether the country will gain something by your sacrifice". Kartar Singh asked in an undertone : "Where is that person (a relative), grand-father ?"

"He died of plague."

"Where is the other one ?"

"He died of cholera."

"Then, do you want Kartar Singh to lie in bed for months and to die of some disease ? Isn't this death a thousand times better than that death ?

The grand-father was silenced. The question again arises today : "What was gained by his sacrifice ? What did he die for ?" The answer is crystal clear ; he died for the country. His aim was to die struggling for the country. He never wanted more than this. Also, he wanted to die unknown.

"Chaman zare mohabbet men, usi ne baghabani ki,
Ki jisne apni mihnet ko hi mihnet ka saman jana
Nahin hota hai muhtaj-numaish faiz shabnam ka,
Andheri raat men moti luta jati hai gulshan men".

(Only that gardener has a place in the garden of love who takes his hard work as the reward for his hard work. The open-mindness of the dew is not for show ; dew drops descend quietly into the garden in the dark night.)

The case was before the court for a year and a half. He was hanged on 16 November, 1915. He was happy as ever on that day, too. He had gained 10 pounds in weight.

"Long live Mother India", were his last words

(Translation by Darshan Singh Nat).

ভাবানুবাদ

কর্তার সিং সরাবা

ভগৎ সিং লিখিত

সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের এই মহান ব্রতী যখন স্বাধীনতার বেদীমূলে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, তখন বিপ্লবী কর্তার সিং-এর বয়স কুড়ি বছরও পূর্ণ হয়নি। ঝড়ের বজ্র-নির্ঘোষের মধ্যে যে অগ্নিসত্বার আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়, কর্তার সিং সরাবা যেন সেই বহ্নিগর্ভ হতে উত্থিত হয়ে "বিপ্লবী আন্দোলনের মৃত্যুপাগল" অন্যান্য স্বপ্ন বিলাসীদের জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি তাঁর চারপাশে সৃষ্টি করেছিলেন এক বিদ্রোহের রাজত্ব। আর সেখানেই তিনি গেলেন নিঃশেষে ফুরিয়ে।

তিনি কে ?

কোত্থেকেই বা হঠাৎ করে এলেন ? কোথায়ই বা আচমকা প্রস্থান করলেন ? আমরা তার কিছুই জানিনে। তাঁর উনিশ বছরের বীরত্বপূর্ণ জীবনের দিকে তাকিয়ে আমরা অবাক-বিস্ময়ে অভিভূত হই।. এমন সাহস, এমন আত্ম-প্রত্যয় ও এমন আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল। বিদ্রোহী কথাটার সত্যিকার মানে বলতে যা বোঝায়, তেমন স্বল্পসংখ্যক ভারতীয় বিদ্রোহীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ছিলেন পুরোধা। সত্যি, রক্তে তাঁর লেগেছিল সর্বনাশের নেশা।

বিপ্লব ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, আকাঙ্খা, আশা-ভরসা। বিপ্লবের জন্যই যেন তিনি জন্মেছিলেন।

আর এই বিপ্লবের জন্যই আলিঙ্গন করেছিলেন মহান মৃত্যুকে।

সরাবা লুধিয়ানা জেলার "সরাবা" গ্রামে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তখন ১৮৯৬ সাল। তিনি ছিলেন পিতার একমাত্র সন্তান।

আর দুর্ভাগ্য, সেই পিতাকে হারিয়েছিলেন অল্প বয়সেই।

তাই, প্রতিপালিত হন ঠাকুর্দার কাছে।

নবম শ্রেণীর পড়া শেষ করে সরাবা গেলেন মাতুলালয়ে। সেখানে তিনি ক্রমে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হলেন মহাবিদ্যালয়ে। সেটা ১৯১০ কি ১৯১১ সাল।

কিন্তু মহাবিদ্যালয়ের বাঁধা-ধরা সঙ্কীর্ণ পাঠ্য-তালিকা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি বলে অবসর সময়ে পড়তে লাগলেন অন্য সব পুঁথি-পুস্তক, জ্ঞানের পরিধিকে বাড়াতে, আরও জানতে এবং আরও শিখতে। সময়টা ছিল সংগ্রামের যুগ। আর এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে জাগ্রত হল তাঁর নিষ্কলঙ্ক দেশপ্রেম।

এরপর তিনি পাড়ি দিতে চাইলেন সুদূর আমেরিকায়। প্রস্তাবে আপত্তি জানালেন না বাড়ির লোক। তাই, অতি সহজেই ১৯১২ সালে উপস্থিত হলেন সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো সহরে। নূতন দেশে গিয়ে সেখানকার লোকজনদের প্রবল হিন্দু-বিরোধী

মনোভাব আর বর্ণ-বিদ্বেষের জ্বালা-যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে কাটাতে লাগলেন সকাল-সন্ধ্যা আর দুঃখের সুদীর্ঘ রাত।

এমনিভাবে বিদেশভূমিতে জাতির গৌরবকে পদে পদে লাঞ্ছিত হতে দেখে তিনি দুঃখে, অপমানে ও ক্ষোভে অধীর হয়ে উঠলেন।

দেশের কথা মনে হলে চোখের সামনে ভেসে উঠত অসহায় ভারতের পরাধীনতার ম্লান ছায়াছবি।

এই পরিবেশে তাঁর হৃদয়ের কুসুম-শুভ্র কোমলতা ধীরে ধীরে দৃঢ়-সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে রূপান্তরিত হল, শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারতমাতার শৃঙ্খল-মোচন প্রচেষ্টায় জীবন বিসর্জনের চূড়ান্ত অঙ্গীকারে।

অস্থির আত্মা

চুপচাপ করে শান্তির নিরাপদ কোলে ঝিমিয়ে পড়তে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্যর্থ হলে ভিন্ন পথ অবলম্বনের কথা সর্বদা তিনি ভাবতে থাকতেন।

শেষটায় কল্পনা-বিলাস পরিত্যাগ করে ভারতীয় শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

তিনি তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, দাসত্বের অবহেলিত জীবন যাপন করার চাইতে মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়। এভাবে কাজ সুরু করার পর অন্যান্য স্বাধীনতাপ্রিয় ভারত-সন্তানগণ এগিয়ে এলেন। তখন সবাই মিলে ১৯১২ সালে একটি বিশেষ সভার আয়োজন করলেন। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট আমন্ত্রণকারীগণই হলেন এ সভায় যোগদানের অধিকারী। সেই জমায়েতের সবাই ভারতের স্বাধীনতার তরে স্বার্থত্যাগ করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন।

এরপর পাঞ্জাব থেকে নির্বাসিত দেশ-প্রেমিক ভগবান সিং এসে উপনীত হলেন। ক্রমে একের পর এক অনুষ্ঠিত হতে লাগলো জমায়েৎ, সভা ও সম্মেলন। আদেশে ও উপদেশে এই স্বাধীনতার সংগ্রাম যতই এগুতে লাগলো ততই একটি পত্রিকা প্রকাশনের

প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল বেশি করে।. সেই অভাব পূরণ হল "গদর" বা "বিদ্রোহ" নামে পত্রিকার সার্থক আবির্ভাবে।

১৯১৩ সালে বের হল ১ম সংখ্যা।*

কর্তার সিং যুক্ত হলেন সম্পাদকীয়-বিভাগের সঙ্গে।

তাঁর লেখায় ফুটে উঠলো সাড়া-জাগানো উন্মাদনা।

পত্রিকার সম্পাদকীয়-বিভাগের কর্মীগণ কাগজটিকে বের করলেন হাতে ঘোরান মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে।

বিপ্লবী কর্তার সিং কাজ করে করে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, শ্রান্ত হতেন, তখন তিনি আপনমনে গুনগুনিয়ে গাইতেন এই পাঞ্জাবী গীতটি :

"সেবা দেশদি জিন্দিরিয়ে বড়ি ওখি
গালান কর নিয়ান ঢের স্থখালিয়ান নে
জিনহান দেশ-সেবা বেচ পের প্যায়া
উনহোনে লাখ্ মুসবিতান ঝলিয়ান নে।"**

দেখতে দেখতে কর্তার সিং-এর এই নিরবচ্ছিন্ন কর্মদক্ষতা ও আন্তরিকতার ছোঁয়া লাগলো আর সবারও মনে।

এই সময়ে কর্তার সিং ছিলেন এক উড়োজাহাজের প্রতিষ্ঠানে। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে শিখতে লাগলেন সেখানকার নিয়ম-নির্দেশ ও আইন-কানুন। উপস্থিত হল ১৯১৪ সাল। এলো সেপ্টেম্বর মাস। "কোমাগাটামারু" জাহাজকে ফিরে যেতে হল নিজ দেশ ভারতবর্ষে—শ্বেতকায়দের হাতে অবিচার-অত্যাচারের তুলনাহীন যন্ত্রণা আর অপমান সয়ে। খবর পেয়ে কর্তার সিং তাঁর বিপ্লবী বন্ধু গুপ্ত † ও আমেরিকান এনার্কিষ্ট দলের সভ্য মিঃ জ্যাক্ সহ বিমানযোগে সহসা উপস্থিত হলেন জাপানে।

---

*১লা নভেম্বর

**এর অনুবাদ বইয়ের স্থরুতেই দেওয়া হয়েছে

†বিপ্লবী হেরম্ব গুপ্ত।

সঙ্গোপনে মিলিত হলেন—কোবে বন্দরে, কোমাগাটামারু জাহাজের উচ্চাভিলাষী কর্মকর্তা বাবা গুরুদিৎ সিং-এর সঙ্গে ?

গদর

গদর এবং গদর-দি-গুঞ্জ (বিদ্রোহের প্রতিধ্বনি) এবং আরো আরো গ্রন্থ ছাপা হয়েছিল সানফ্রান্সিস্‌কোর গদর মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে যুগান্তর আশ্রমে। তারপর করা হয়েছিল অবাধ বিতরণ। পত্রিকার জ্বালাময়ী লিখনভঙ্গীতে উৎসাহিত গদর সভ্যগণ ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে Stockton-এর এক সাধারণ সভায় উড্ডীন করলেন ভারতের স্বাধীনতার পতাকা। তারপর শপথ নেওয়া হল সাম্য ও স্বাধীনতার নামে।

এই সভার অন্যতম বক্তা ছিলেন কর্তার সিং সরাবা। এখানে সকলেই ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা তাঁদের বহু কষ্টের অর্জিত সকল অর্থ ও সম্পদ নিয়োজিত করবেন ভারতের মুক্তি-সাধনায়।

এমনি করে যখন দিন কাটতে লাগলো, তখন হঠাৎ ইউরোপের রণাঙ্গনে বেজে উঠলো পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের রণভেরী। গদর দলের সবাই খুশিমনে সমবেতকণ্ঠে গেয়ে উঠলেন :

"চলো, চালিয়ে দেশনু উদ্ করনে
এ হো আখরি বচন ফারমান হো গ্যয়ে!"
("Let's go to our country for open fight,
At-last, order has been passed !")
("চলো দেশে, রণক্ষেত্রে যাই,
মিলেছে হুকুম, আর ভয় নাই!")

কর্তার সিং সজোরে প্রচার করতে লাগলেন, 'ফিরে চলো, ফিরে চলো আপন ঘরে'। তারপর নিজেও একদিন সুযোগ বুঝে জল-জাহাজের যাত্রী হলেন। পৌঁছে গেলেন "কলম্বোতে"।

(তখনকার দিনে আমেরিকা প্রবাসী পাঞ্জাবীদের স্বদেশযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করত সরকার) যে কয়জন মুষ্টিমেয় যাত্রী নিরাপদে গৃহে ফিরতে সক্ষম হলেন কর্তার ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

মারাঠা যুবক বিষ্ণুগণেশ পিংলেও ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এসে উপস্থিত হলেন ভারতবর্ষে।

তাঁর সঙ্গে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল আর রাসবিহারী বসু পাঞ্জাবে মিলিত হলেন। কর্মব্যস্ত কর্তার সিংকে তখন দেখা যেতে লাগলো এখানে-সেখানে সর্বত্র। কোথায়ই বা নয়! যেমন, একদিন হয়তো মোগার গোপনসভায়। অন্যদিন হয়তো লাহোরের ছাত্র-সমাবেশের প্রথম সারিতে। পরদিন আবার ফিরোজপুর সেনা-নিবাসের সৈন্যদের সঙ্গে গভীর আলোচনারত।

এমনি দুরন্ত কর্ম-সম্পাদনের তাগিদের সময় মূর্তিমান বাধা হয়ে দেখা দিল অর্থ-সমস্যা। সেই বাধা দূর করতে তিনি প্রস্তাব করলেন ডাকাতির।

তাঁর মতো নিষ্ঠাবান কর্মীর মুখে ডাকাতি করার কথা শুনে অনেকেই একটু যেন বিস্মিত হলেন। কিন্তু তাঁদের তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, এতে অন্যায় কিছু নেই। আর ভাই পরমানন্দও সায় দিয়েছেন এই ডাকাতিতে। এসব কথা শুনে শেষপর্যন্ত প্রস্তাবের অনুমোদনের জন্য তাঁকেই পাঠান হল ভাই পরমানন্দের কাছে।

*　　*　　*

তিনি কিন্তু ভাই পরমানন্দের সঙ্গে আদৌ দেখা করলেন না। ঘুরে এসে মিথ্যে করে বললেন যে, ভাই পরমানন্দের সম্মতি পাওয়া গেছে।

*　　*　　*

এরপর কর্তার সিং-এর পরিচালনাধীনে একদিন সত্যি সত্যিই ওঁরা সকলে ডাকাতির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন এক পল্লীতে।

"অবিস্মরণীয় দৃশ্য"

যথারীতি এক বাড়িতে ডাকাতি করে সংগ্রহ করা হল অর্থ আর সোনা দানা। কিন্তু ডাকাতি করার সময় সেই বাড়ির এক অপরূপ

রূপসী কন্যার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে দলের একজন লোক হলেন আত্মবিস্মৃত। সহসা আকর্ষণ করলেন কুমারীর দক্ষিণ হস্ত। ভীতা, সঙ্কুচিতা, অবলা কন্যার অস্ফুট আর্তনাদে আকৃষ্ট হয়ে কর্তার সিং তাকালেন মেয়েটির দিকে। মুহূর্তকাল মধ্যে দলপতি কর্তার সিং ক্রোধে জ্বলে উঠে গুলি-ভরা রিভলবার তুলে ধরলেন দলের সঙ্গীটির কপালের ওপর। বাধ্য করলেন তাকে অস্ত্র পরিহার করতে। তারপর তীব্রকণ্ঠে বললেন:

"তোমার অপরাধ অমার্জনীয়। তুমি পাপী। আর পাপের ফল হিসেবে তোমার প্রতি হওয়া উচিত মৃত্যুদণ্ডাদেশ। কিন্তু এক্ষুণি সেই দণ্ড এখানে তোমাকে দেওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং তুমি মেয়েটিকে নিজের বোনের মতো মনে করে তার পা ধরে ক্ষমা চাও। তারপর ক্ষমা চাও মেয়েটির মার কাছে। যদি ওঁরা ক্ষমা করেন, তবেই তোমাকে বাঁচতে দেওয়া হবে। নয়তো তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে শেষ করে ফেলা হবে।"

সঙ্গীটি সর্দার কর্তার সিং সরাবার আদেশ অনুযায়ী ক্ষমা চাইল মেয়েটি ও মেয়েটির মার কাছে।

ব্যাপারটা কিন্তু সেখানেই চুকে গেল না।

কর্তার সিং-এর এই অপ্রত্যাশিত মহানুভবতায় মেয়েটির মার দু'চোখ বেয়ে ঝরে পড়তে লাগলো কৃতজ্ঞতার অশ্রুবিন্দুরাশি। তিনি কর্তার সিংকে ডেকে বললেন:

"দেখ, তুমি আমার ছেলের মতো। অথচ আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, এমন মহৎ প্রাণ নিয়ে তুমি কিনা এসেছো ডাকাতি করতে!"

পুত্র সম্বোধনের এক সম্মোহনী শক্তি আছে। তারই ফলে কর্তার সিং নিজেও চঞ্চল হয়ে উঠলেন আবেগে। বললেন প্রত্যুত্তরে:

"মা, আমরা এসব কাজ লোভে পড়ে করছিনে। করছি বিপ্লবের প্রয়োজনে।' বিদেশী ইংরেজকে তাড়াতে। তার জন্য

চাই অস্ত্র।• চাই গোলা-বারুদ। আর সেই অস্ত্র কেনার জন্য টাকার দরকার। কিন্তু কে দেবে আমাদের টাকা? তাই বাধ্য হয়ে ডাকাতি করতে হচ্ছে।"

কর্তার সিং-এর এই সরল স্বীকারোক্তির ভেতর উছলে পড়ল তাঁর দেশ-প্রেম। তাঁর মহান আদর্শ। তাই দেখে আর একবার মুগ্ধ হলেন গৃহিণী। কর্তার সিং-এর ব্যবহারে ততোধিক বিস্মিত, মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ অনূঢ়া কন্যাকে দেখিয়ে তিনি বললেন, "দেখ বাবা, আমার এই মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়েছে এই মাত্র সেদিন। বোঝ তো, তার জন্য টাকা চাই। তুমি যদি সেই বাবদ কিছু টাকা আমাদের দিয়ে যাও তবে বড়ই ভালো হয়।"

এই কথা শুনে কর্তার সিং ডাকাতির সব টাকা গৃহিণীর হাতে তুলে দিয়ে বলে উঠলেন:

"বেশ, আপনি এ থেকে যা খুশি রেখে বাকিটা আমাকে দিয়ে দিন।"

কর্তার সিং-এর কথানুযায়ী গৃহকর্ত্রী সেই টাকার ভেতর থেকে তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা রেখে, বাকিটা ফিরিয়ে দিলেন কর্তার সিংকে। সেই সঙ্গে জানালেন আন্তরিক আশীর্বাদ।

বললেন: "আমি আশীর্বাদ করছি; তুমি জয়যুক্ত হও বাবা।"

এই একটি ঘটনার মধ্যেই দেখা গেল কর্তার সিং সরাবার নির্মল চরিত্রের দৃঢ়তা ও মহানুভবতা।

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিপ্লবের আয়োজন ঠিক করা হল। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পিংলে ও আরও দু'তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে সরাবা আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মীরাট ও অন্যান্য জায়গা পরিদর্শন করে সেখানকার বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করলেন।

এদিকে সুদূর প্রতীক্ষিত দিনটি দেখতে দেখতে এগিয়ে এলো।

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি নির্দিষ্ট হল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য। প্রস্তুতি চললো পুরোদমে।

ঠিক এই সময়ে অপরদিকে এই অভ্যুত্থানের বিপুল প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য চললো এক ঘৃণিত ষড়যন্ত্র। দলের সকলের অগোচরে ৪।৫ দিন আগে জানা গেল যে, বিশ্বস্ত কর্মী বলে পরিচিত বিপ্লবী সভ্য কৃপাল সিং করেছে চরম বিশ্বাসঘাতকতা!

আসন্ন বিপ্লবের বিপুল উদ্যম, আশা ও প্রচেষ্টা এমনভাবে নির্মূল হয়ে যাবার আশঙ্কায় নির্ভীক কর্তার সিং নেতা রাসবিহারী বসুকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন—বিপ্লবের তারিখ পরিবর্তন করে ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সারাভারতে বিপ্লবের দিন স্থির করতে।

তাই করা হল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই পরিবর্তিত তারিখের খবরও কৃপাল সিং জেনে ফেললো।

বিপ্লবী দলের মাত্র একটি বিশ্বাসঘাতকের জন্য সব কিছু পণ্ড হয়ে গেল।

মন্ত্রগুপ্তির ত্রুটির জন্য কর্তার সিং ও রাসবিহারী গোপনীয়তাকে ধরে রাখতে পারলেন না। একে ভারতের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে!

* * *

পরবর্তী এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্তার সিং সরাবা প্রায় ষাট-জন সাথী নিয়ে চলে গেলেন ফিরোজপুরে। সেখানে পূর্ব-পরিচিত হাওলদারের সঙ্গে মিলিত হয়ে জানতে পারলেন যে, কৃপাল সিং সশস্ত্র বিপ্লবের কথা সরকারের কাছে ফাঁস করে দেওয়ায় ইংরেজ সরকার সকল ভারতীয় সৈন্যদের নিরস্ত্র করেছেন। এমনকি, গ্রেপ্তারও সুরু হয়েছে।

এই জটিল পরিস্থিতিতে ভীত-চকিত হাওলদার তার সহযোগিতার হাত গুটিয়ে নিল।

এমনিভাবে নিজেদের পরিকল্পনা বিধ্বস্ত হতে দেখে ক্ষোভে ও দুঃখে অভিভূত হয়ে কর্তার সিং ফিরে এলেন লাহোরে।

ইতিমধ্যে ধর-পাকড়-এর হিড়িক পড়ে গেছে পাঞ্জাবের সর্বত্র। এই অবস্থায় দেখে-শুনে সাথীরা একে একে সরে পড়তে লাগলো যে যেখানে সুবিধে পায়, সেখানে।

রাসবিহারী তখন লাহোরে।

কর্তার সিং রাসবিহারীর আস্তানায় উপস্থিত হয়ে যে চৌকিতে স্বয়ং রাসবিহারী চুপচাপ শুয়ে ছিলেন সেখানে এসে তিনিও পড়লেন এলিয়ে। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে।

নিজেদের আয়োজিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের এই চরম বিফলতা যেন কেউ আর চোখ খুলে সহ্য করতে পারছিলেন না।

তাই দুঃখের পাত্র যেখানে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে সেখানে উভয়ে রইলেন স্তব্ধ হয়ে।

উভয়ে উভয়ের এই দুঃসহ জ্বালা, এই বেদনা, এই পরাজয়, এই নৈরাশ্য, এই অসহনীয় ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়ে। বলুন তো, আমরা কেমন করে প্রকাশ করব তাঁদের তখনকার সেই চরম মর্মদাহের ভাব ও ভাষা।

"Dare tadbir par sir phorna shewah raha apna,
Vasile hath hi aae na Kimat aazmai ke"

(To strike our foreheads at the door of Planning has been our sacred duty. But we never caught hold of the means to try our luck.)

ভাবানুবাদ

পবিত্র কর্তব্যের অঙ্গ হিসেবে পরিকল্পনার জোরে প্রাণপণ আমরা আমাদের মাথা ঠুকেছি।

কিন্তু হায়! সেখানে ভাগ্য-পরীক্ষা করার কোন সুযোগই আমরা পেলাম না।

অন্তিম ইচ্ছা

বেপরোয়া কর্তার সিং সরাবা তখন কোন এক রণক্ষেত্রের সম্মুখে-যুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিতে বদ্ধপরিকর ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি উপস্থিত হলেন সারগোদার কাছের পাঁচ নম্বর চকে। প্রকাশ্যে সুরু করলেন বিপ্লবের কথা বলতে। সঙ্গে সঙ্গে বরণ করলেন গ্রেপ্তার। পড়লেন হাতে হাত-কড়ি।

নির্ভীক বিপ্লবী কর্তার সিংকে নিয়ে পুলিস উপস্থিত হল লাহোর রেল-স্টেশনে।

তিনি তখন পুলিসের কর্তাকে ডেকে সহজ সরল ভাবে বললেন :

"ক্যাপ্টেন সাহেব, কিছু খাবার-দাবারের জোগাড় দেখুন তো, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে!"

দেখুন কি সদা-প্রসন্ন চিত্ত!

তাই, শত্রু-মিত্র সবার কাছেই সরাবার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আদরণীয় ও প্রিয় ছিল।

গ্রেপ্তারের পর তাঁর মনে দুঃখের কোন আভাস দেখা যায়নি তাঁকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত :

"সাহস ও মর্যাদার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার পর আমাকে তোমরা 'বিপ্লবী' আখ্যা দিও। তখন যদি কেউ আমায় মনে রাখেন, তবে তিনি যেন আমাকে বিপ্লবী কর্তার সিং হিসেবেই মনে রাখেন!"

মামলার বিচারকালে তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর ছ' মাস। অভিযুক্তদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে কনিষ্ঠ।

কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বিচারক লিখলেন :

"আসামীদের মধ্যে কর্তার সিং হল সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক ব্যক্তি। আমেরিকা যাত্রাকালে অথবা পরবর্তীকালের ভারতভূমিতে এই ষড়যন্ত্র মামলার অন্তর্ভুক্ত এমন কোন শলা-পরামর্শের খবর পাওয়া যায় না, যেখানে তার কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না।"

একদিন এই বিচারকের কাছ থেকে আহবান এল বিবৃতি দেবার। কর্তার সিং সরাবা সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে এক অপ্রত্যাশিত বিবৃতি দিলেন। দুই পাটি দাঁতের মাঝখানে কলমের গোড়া কামড়ে ধরে বিচারক খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। শুনলেন আসামীর স্বীকারোক্তি একটির পর একটি। কিন্তু লিখলেন না কিছুই। সরাবার বিবৃতির পরে বিচারক বললেন: "আজ তোমার বিবৃতি নথি-ভুক্ত করা হল না। কর্তার সিং, এখনও ভাল করে ভেবে-চিন্তে কথা বল! তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, তোমার বিবৃতি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?"

সেদিন আদালত-কক্ষে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে জানা যায় যে, বিচারকের এইসব কথা শুনে কর্তার সিং বিশেষ এক ভঙ্গি করে সরোষে বলেছিলেন:

"ফাঁসি দেওয়া ছাড়া আর তুমি কি করতে পার? আমি তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

সেদিনকার মতো বিচার মুলতুবী রইলো। বিচারক তাঁর আসন ছেড়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

পরদিন কর্তার সিং আবার তাঁর আগের দিনের বিবৃতির পুনরাবৃত্তি করলেন।

বিচারক ভাবলেন যে, কর্তার সিং ভাই পরমানন্দের ইঙ্গিতে এসব বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু তাঁরা বিপ্লবী কর্তার সিং সরাবার গভীর মনের হদিস পাননি বলেই এমন ধারণা করতে পেরেছিলেন। যাক্ সেকথা।

এদিকে সেদিনকার বিবৃতি আগের দিনের বিবৃতির চাইতেও বেশি জোরাল ও অগ্নি-বর্ষী হল।

আবার তিনি সকল দোষ স্বীকার করলেন। পরিশেষে বললেন:

"আমি যা বলেছি বা করেছি তার জন্য হয় আমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে, নয় তো ফাঁসি হবে। কিন্তু পরেরটা হলেই ভালো।

কারণ, তাহলে মৃত্যুর পর আবার আমি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব। আর যতদিন না ভারত স্বাধীন হয়, ততদিন যেন আমি স্বাধীনতার স্বপ্নকে রাঙিয়ে তোলার জন্যই বার বার জন্ম নিতে পারি।"

মহান মৃত্যু

বিচারক কর্তার সিং সরাবার এই অসম সাহসিক আচরণে মুগ্ধ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ওঁরা শত্রুপক্ষ ছিলেন বলে সরাবার এই আচরণকে "বীরত্ব-ব্যঞ্জক" আখ্যা না দিয়ে বললেন "চরম নির্লজ্জতা"। কর্তার সিং তাই কেবল বিচারকের গালাগালিই শুনলেন না, উপরন্তু শুনতে পেলেন মৃত্যুদণ্ডের ভয়াবহ আদেশ।

কর্তার সিং কিন্তু সেই ভয়াবহ আদেশ শুনে বিচলিত হলেন না। বরং মৃদু হেসে বিচারককে ধন্যবাদ জানালেন।

সরাবা যখন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর জন্য নির্দিষ্ট কনডেমড্ সেলে আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন, তখন দেখা করতে এলেন তাঁর পরম পূজনীয় ঠাকুর্দা। তিনি বললেন:

"কর্তার সিং, তুমি কাদের জন্য মরতে যাচ্ছ? যারা তোমাকে দিন-রাত্ বদনাম দেয়, তাদের জন্য? তাছাড়া তোমার আত্মত্যাগে দেশের কি করে যে মঙ্গল হবে, তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে।"

কর্তার সিং এবার খুব আস্তে তাঁর ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞেস্ করলেন:

"আচ্ছা, উনি কোথায় গেছেন ঠাকুর্দা? (উনি মানে, ঠাকুর্দার কোন এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়)

"সে প্লেগে মারা গেছে।"

"অন্যজন?"

"সে কলেরায় মারা গেছে।"

"তাহলে আপনি কি চাইছেন যে, আপনার কর্তার সিং রোগে

ভুগে, তিলে তিলে দুঃখের দহণ-জ্বালা সয়ে, জীর্ণ হয়ে, মৃত্যুবরণ করুক ? তার চাইতে এই মৃত্যু কি মহান নয় ?"

এবার কর্তার সিং-এর মনোভাব ঠিকভাবে বুঝতে পেরে ঠাকুর্দা নীরব হয়ে রইলেন।

এই প্রশ্ন আজও জাগে কারো কারো মনে :

"তাঁর আত্মত্যাগে কি ফল হল ? কিসের জন্য তিনি আত্মত্যাগ করলেন ?"

উত্তর জলের মতো সোজা। অর্থাৎ, তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন দেশের জন্য।

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশের কাজে সংগ্রামের মধ্যে মৃত্যুবরণ করা। এর চাইতে বেশি কিছু চাননি।

এছাড়া, বনফুল যেমন ঝরে যায় বনে সকলের অজান্তে, তিনিও চেয়েছিলেন তেমনি নিঃশেষে ফোটার আগে ঝরে যেতে, সকলের অজ্ঞাতে।

"Chaman zare mohabbat men, usi ne baghbani ki
Ki jisne apni mihnet kohi mihnet ka saman jana,
Nahin hota hai muhtaj—numaish Faiz shabnam ka
Andheri raat men moti luta jati hai gulshan men".

(Only that gardener has a place in the garden of love who takes his hard work as the reward. The open mindedness of the dew is not for show. Dew drops descend quitely into the garden in the dark night.)

ভাবানুবাদ

বাগানের সেই মালীরই প্রেম-উদ্যানে থাকার অধিকার আছে, যে তার কঠিন পরিশ্রমকেই (একমাত্র) পুরস্কার বলে হাসিমুখে গ্রহণ করে নিতে রাজী হয়। শিশিরের উদারতা লোক-দেখান

ব্যাপার নয়। কারণ, আঁধার রাতের নীরবতার মাঝেই সে অঝোরে ঝরে পড়ে পুষ্প-উদ্যানে।

* * *

মামলা চললো দীর্ঘ দেড় বছর ধরে। কর্তার সিং সরাবা ফাঁসির রজ্জু চুম্বন করলেন ১৯১৫ সালের ১৫ই নভেম্বর। অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিনও তিনি ছিলেন নিরুদ্বিগ্নচিত্ত। তাঁর দৈহিক ওজন বেড়ে হয়েছিল দশ পাউণ্ড।

"মাতৃভূমি ভারত চিরজীবী হোক"

এই ছিল তাঁর শেষ কথা।

[দর্শন সিং নাটের ইংরাজী তর্জমা থেকে লেখকের অনুবাদ। পিউপিলস্ পাথ, জলন্ধর, নভেম্বর, ১৯৬৭]

এই কর্তার সিং সরাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত ভগৎ সিং সম্পর্কে সমগ্র দেশ যখন চেয়েছিল যে, তিনি বাঁচুন; তখন তিনি চেয়েছিলেন তাঁর নিশ্চিত মৃত্যু। ইতিহাসের এক আশ্চর্য চরিত্র এই ভগৎ সিং।

যৌবনের প্রারম্ভে মানুষ যখন বাঁচতে চায়, তিনি তখন মৃত্যুর হিম-শীতল ছোঁয়ার জন্য ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন।

* * *

মতিলাল নেহেরু সিমলার রোগশয্যা থেকে লোক পাঠিয়েছেন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের প্রিভি-কাউন্সিলে আবেদন জানানোর সনির্বন্ধ অনুরোধ করে।

কিন্তু ভগৎ সিং কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। তাঁর সহ-বন্দী বিজয় কুমার সিন্‌হা তাঁকে বলছেন: "মতিলালজী আপীল করার অজুহাতে হাতে একটু সময় নিতে চান। কারণ, ইতিমধ্যে সরকারের সঙ্গে একটা আপোস-আলোচনার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এমনও হতে পারে যে, তাঁরা সর্দারের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হবেন।"

সর্দার ভগৎ সিং তাঁর সহ-বন্দীকে লাহোর কেন্দ্রীয় কারাগারের ফাঁসির বন্দীর কক্ষে দাঁড়িয়ে বললেন,ঃ

"বিজয়, কাঁহি এ্যয়সা না হো, কি, ফাঁসি রুখ যায়!"

[দেখো ভাই বিজয়, ফাঁসির হুকুমের যেন রদ-বদল না হয়।]

শ্রীসিন্‌হা উত্তরে বললেনঃ "না সর্দার, তেমন আশা আমরা করি না। ফাঁসি বন্ধ হবে না। কারণ, ইংরেজের দু'মুখী নীতির মূল কথা হল একদিকে কংগ্রেসকে হাতে রাখা, অন্যদিকে বিপ্লবীদের ধ্বংস করা। তবে, ফাঁসির আদেশ কার্যকরী হতে বিলম্ব হলে বিপ্লব-আন্দোলনে সারা ভারত দল বেঁধে উঠতে পারবে। তখন চাপে পড়ে হয় তো ফাঁসির দণ্ড মকুব করলেও করতে পারেন।"

ভগৎ সিং তখন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে আপীলে মত দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে শ্রীবিজয় কুমার সিন্‌হা বলছেনঃ "আমরা ব্যক্তিগত দণ্ড মকুবের জন্য আপীল করিনি। আপীল করেছিলাম মূল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সম্পূর্ণ দণ্ডাদেশ নাকচ করে দেবার জন্য। আমাদের বক্তব্য ছিল এই যে, যে অর্ডিনান্সের ক্ষমতায় লাহোর মামলার বিচার সম্পাদিত হয়েছে, সেই অর্ডিনান্সই ত্রুটিপূর্ণ।"*

যাক্, আপীল হল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই আবেদন প্রিভি-কাউন্‌সিল ১৯৩১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি সরাসরি নামঞ্জুর করেছিলেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিপ্লবীদের ফাঁসির আদেশ নিয়ে দেশ যখন তোলপাড় করছে, তখন এই ১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে এলাহাবাদের ইতিহাসে ঘটলো আর এক অশ্রুতপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য ঘটনা মধ্যাহ্নের আগে। পুলিসের

---

*শহীদ ভগৎ সিং-এর সহ-বন্দী শ্রীবিজয় কুমার সিন্‌হা লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধ অনুসরণে। "যে শহীদের বাণী অমর", পেট্রিয়ট, নয়াদিল্লী, ১৭ মার্চ, ১৯৪৮।

কাছে গোপনসূত্রে খবর গেল যে, হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাব্-লিকান এসোসিয়েসনের মহাধিনায়ক, কাকোরী ট্রেন ডাকাতি, স্যাণ্ড্যার্স-হত্যার অংশীদার, দুরন্ত বিপ্লবী নায়ক, ফেরারি স্বদেশী আসামী চন্দ্রশেখর আজাদকে এলফ্রেড পার্কে দলের কর্মীর সঙ্গে গভীর আলোচনারত দেখা গেছে।

মুহূর্তে পুলিসের প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠলো দ্রুত কর্মব্যস্ত, অস্থির ও চঞ্চল। আর কালবিলম্ব না করে ওরা চারধার থেকে ঘিরে ধরলো চন্দ্রশেখর আজাদকে, যেন হায়েনার নিঃশব্দ হামা-গুড়িতে। বিদ্রোহী নায়ক যখন বুঝতে পারলেন যে, পালানোর সকল পথই রুদ্ধ হয়ে গেছে, তখন তিনি জীবিত অবস্থায় পুলিসের হাতে ধরা দেবার কথা ভুলে গিয়ে স্থুরু করলেন অসম সাহসিক সম্মুখ-যুদ্ধ।

একা যুঝলেন সেই নিদারুণ সংগ্রাম। গুলিবিদ্ধ করলেন প্রতিপক্ষের কোন কোন দেশদ্রোহী বেতন-ভুক দালালকে।

তারপর চতুর্দিকের নিক্ষিপ্ত গুলিতে ক্রমাগত আহত, বিপর্যস্ত ও রক্তাপ্লুত অবস্থায় নিজহাতের রিভলবারের গুলিতে স্বীয় প্রশস্ত ললাট বিদ্ধ করলেন। মৃত্যুকে নিশ্চিত করতে বরণ করলেন বীরের মহান মৃত্যু। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রইলেন অপরাজিত।

* * *

ইতিমধ্যে ভারতের রাজ-প্রতিনিধি ও কংগ্রেসের কর্ণধার গান্ধীজীর সঙ্গে চললো রাজনৈতিক স্তরে আপোস-আলোচনা।

১৯৩১ সালের ৫ই মার্চ সেই আলোচনা চূড়ান্ত রূপ নিয়ে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল। যার নাম হল গান্ধী-আরউইন চুক্তি।

ভারতের বিভিন্ন কারাগার থেকে একের পর এক মুক্তি পেতে লাগলেন নিরস্ত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও সভ্যগণ।

কিন্তু মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারলেন না সশস্ত্র আন্দোলনের বিপ্লবী সংগ্রামীগণ, অন্তরীণ অবস্থায় বিনা বিচারে আটক বন্দীগণ,

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীবৃন্দ ও ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা মামলার বিচারাধীন অন্যান্য সরিক।

* * *

এই গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে বহু অসহযোগী বন্দীদের সঙ্গে ছাড়া পেলেন বাংলা কংগ্রেসের সভা-নায়ক সুভাষচন্দ্র বসু। সেদিন ৮ই মার্চ, ১৯৩১ সাল। তারপর দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগলো ভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশন।

সেইদিক লক্ষ্য করে অধীর সুভাষচন্দ্র ও আর একজন সদ্য-মুক্ত বন্দী, বিপ্লবী নায়ক ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষকে সঙ্গী করে সরাসরি পৌঁছলেন বোম্বাই। পরে মিলিত হলেন গান্ধীজীর সঙ্গে। হল নিভৃতে আলাপ-আলোচনা।

বিপ্লবী-বন্ধু সুভাষচন্দ্র আবেগ ভরা কণ্ঠে গান্ধীজীর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর মৃত্যুদণ্ড রোধ করতে।

সশস্ত্র আন্দোলনের অপরাপর বন্দীদের মুক্তির প্রতিবিধান করতেও তিনি করলেন আন্তরিক অনুরোধ। সেদিন ১৪ই মার্চ, ১৯৩১ সাল।

* * *

ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের মৃত্যুদণ্ড রোধ করতে সারা দেশ যখন আকুলনয়নে তাকিয়ে ছিল গান্ধীজীর দিকে, তখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগাব দখলের প্রায় স্থির মৃত্যু-পথযাত্রী বিচারাধীন বীর সেনানীদল জেল থেকে সংগোপনে গান্ধীজীর কাছে চিঠি পাঠালেন।

—ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের প্রাণরক্ষা করতে।

* * *

কিন্তু ইংরেজ সরকারের সঙ্গে চুক্তির সময় ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবেরর মুক্তি "দাবী" না জানিয়ে গান্ধীজী জানালেন

কেবলমাত্র তাঁর সকরুণ ইচ্ছা! পায়াস উইস্! • বিবৃতিতে বললেন :

"এই চুক্তি দেশে সর্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হলে, এমন কি, সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য যাঁদের ফাঁসির হুকুম হয়েছে, তাঁরাও মুক্তি পাবেন বলে আশা করি।"

এই অন্তঃসারশূন্য অনুরোধের ভাব ও ভাষার অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবণ করতে চতুর ইংরেজের বিলম্ব হল না।

তাই মামুলি কথার গ্যাস দিয়ে ফোলানো ফানুসের দিকে তাকিয়ে গান্ধীজীর বিব্রত ও অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে কাল-বিলম্ব না করে ইংরেজ সরকার তার নিজের তাগিদে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলো।

* * *

সেই সূত্রে ১৯৩১ সালের ১৮ই মার্চ ভগৎ সিং-এর পিতা কিষাণ সিং সরকার পক্ষ থেকে পেলেন এক মর্মান্তিক চিঠি :

"I am directed to inform you that, your interview with the condemned prisoner Bhagat Singh has been fixed for the 23rd March, at 11 A. M.

You should arrange to bring all your blood relation with you."

("আপনাকে জানান যাইতেছে যে, ফাঁসির আসামী ভগৎ সিং-এর সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হয়েছে ২৩শে মার্চ-এর সকাল ১১ টার সময়। সেদিন আপনি আপনার নিকটস্থ সকল আত্মীয়-সহ উপস্থিত হবেন।")

নিয়ম অনুসারে একই ধরনের চিঠি অপর দুই ফাঁসির আসামী রাজগুরু ও শুকদেবের অভিবাবকদের কাছে প্রেরিত হল।

লাহোর কারাগারের চারিদিকে বিরাজ করতে লাগলো এক অস্বাভাবিক নীরবতা। ভেসে বেড়াতে লাগলো বেহাগ রাগিনীর বেদনা-বিধুর সুর।

ফাঁসির পূর্বে ভগৎ সিং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার কাছে কিছু কবিত্ব আর কিছু দার্শনিক হেঁয়ালী মিশিয়ে লিখলেন ঃ

(1) "Like the flame of a candle in the morning I disappear before the light of the dawn. What harm if this handful of dust is destroyed !"

(১) "ঊষা সমাগমের পূর্বাহ্ণে, কাল প্রভাতে আমি মুছে যাব এই ধূলার ধরণী থেকে একটি প্রদীপ-শিখার মতো।

যদি এই একমুঠো ধুলোর ন্যায় আমার নশ্বর জীবন চলে যায়, তবে যাক না !"

সেদিন আর একটি চিঠিতে রাজ্যপালকে তিনি লিখলেন ভিন্ন ভাষায় ও ভিন্ন চিন্তায়ঃ "আরো নূতন উদ্যমে, অধিকতর স্পর্ধায়, দুর্দমনীয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের যুদ্ধ চলতে থাকবে, যতদিন না সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে।"

(2) "War shall be waged ever with new vigour, greater audacity and unflinching determination till the socialist republic is established.....The days of capitalist and imperalist exploitation are numbered, the war neither began with us nor it is going to end with our lives. Our humble sacrifice will be only a link in the chain."

("Martyr whose message is undying," Bijay Kumar Sinha. Sunday, March 17. 1968. Patriot, New Dehli (Daily).

(২) "স্বাধীনতার যুদ্ধ আমাদের নিয়ে সুরুও হয় নাই, আর আমাদের মৃত্যুতে শেষ হয়েও যাবে না।

আমাদের যৎসামান্য আত্মত্যাগ টিকে থাকবে স্মরণীয় যোগ-সূত্র হয়ে, সুদীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামের (সুরু ও শেষের) মালা-খানির মাঝখানে।"

* * *

অবশেষে এগিয়ে এলো ২৩শে মার্চ-এর (১৯৩১) সেই চির-বিচ্ছেদের রাত্রি। সেদিন প্রভাতে লাহোর জেল-কর্তৃপক্ষের চলা-ফেরা, নূতন নূতন লোকের আসা-যাওয়া আর একটা চাপা-গুঞ্জন থেকে গদরদলের যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী বাবা চুহার সিং আঁচ করতে পারলেন যে, আজই তাঁদের অতি আদরের ভগৎ সিং-এর জীবনের শেষ-রজনী। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। মধ্যাহ্নের আগে পাগলের মতো ছুটে গেলেন তাঁর নয়নের মণিকে শেষবারের জন্য শুধু প্রাণ ভরে দেখতে। জানালেন তাঁকে আশু সর্বনাশের ইঙ্গিত।

আনন্দলোক পথ-যাত্রী বীরশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা-সংগ্রামী ভগৎ সিং ও তাঁর সাথী রাজগুরু ও শুকদেবকে সাহস, বল, ভরসা ও আশা দিলেন।

* * *

সরকারীভাবে ভগৎ সিং ফাঁসির কথা জানতে পারলেন বিকেল ৫টায়। মৃত্যুর আড়াই ঘণ্টা আগে।

তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তায় ভীত-সন্ত্রস্ত ইংরেজ রাজপুরুষগণ সহসা ফাঁসির নির্দিষ্ট সময় পরিবর্তন করে এগিয়ে নিয়ে এলেন। ঊষা-সমাগমের জন্য অপেক্ষা করলেন না।

ভয় হল, পাছে রজনী শেষের পূর্বাহ্নে ওকে না ছিনিয়ে নিয়ে যায় জন-সমুদ্রের দীপ্ত রোষবহ্নির প্রবল প্লাবনে, জেল ভেঙে, অজানার পানে। তাই সন্ধ্যার অবগুণ্ঠনে দিবালোকের আভাস যখন ঝাপসা হয়ে গেল, ক্রমশঃ অন্ধকার

ঘনীভূত হল, তখন চুপি চুপি তস্করের দুরভিসন্ধি নিয়ে ইংরেজ সরকার ইঙ্গিত করলেন বন্দীদের বধ্যভূমে নিয়ে যেতে।

আর সাবধানতার অংশ হিসেবে সমগ্র লাহোর সহরকে ঘিরে রাখলেন সশস্ত্র পুলিস ও সামরিক বাহিনীর বাছা বাছা সৈন্য-সামন্ত দিয়ে।

সেই সঙ্গে সারা ব্রিটিশ-ভারত যেন এক অজানা আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে রইলো। চিন্তার কুটিল রেখা ফুটে উঠলো সুদূর ইংল্যাণ্ডের সেক্রেটারী অব স্টেট, স্যার স্যামুয়েল হোরের ভ্রূকুটিতে। উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হলেন ভারতের রাজ-প্রতিনিধি স্বয়ং লর্ড আরউইন।

ইস্পাত-কঠিন রুক্ষতা নিয়ে নিজকক্ষে সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত হয়ে পায়চারি করতে লাগলেন ইনটেলিজেন্ট বুরোর ডাইরেক্টর—স্যার ডেভিড প্যাট্রি।

এই সেই ডি. প্যাট্রি, যিনি ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "কোমাগাটামারু" জাহাজের যাত্রীদের ওপর নজর রাখতে প্রেরিত হয়েছিলেন কলকাতায়—পাঞ্জাব পুলিসের পক্ষে। সংঘর্ষকালে আহতও হয়েছিলেন। ইনিই সেই খ্যাতনামা গোয়েন্দা অফিসার, যিনি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে "দূরপ্রাচ্যে" প্রেরিত হয়েছিলেন ১৯১৬ সালে, পলাতক রাসবিহারী বসু ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সন্ধান রাখতে।

সরকার পক্ষ যখন নীরব কর্মতৎপরতায় এগিয়ে চলেছেন, তখন ভগৎ সিং অন্ধকার কারাকক্ষের রুদ্ধদ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন দেশের কথা, তাঁর আদর্শের কথা আর বন্ধুদের কথা। মনে মনে বলছিলেন: দেশ কি জাগবে না? দেশ কি এগিয়ে যাবে না? ভারতের স্বাধীনতা সাধ কি পূর্ণ হবে না? দুঃখী জনগণের দুঃখ কি ঘুঁচবে না? ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ ঘুঁচে ভারত তথা বিশ্বের চিরশান্তির জন্য ফরাসী-বিপ্লবের পদাঙ্ক অনুসরণে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বিজয় পতাকা কি উর্ধ্বে উত্থিত হবে না? চোখের

সামনে তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু-যন্ত্রণা বরণ করে চলে গেলেন সার্থক বিপ্লবী, আমৃত্যু-অনশনী, বাংলা মার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম বীরপুরুষ যতীন্দ্রনাথ দাস। তারপর যে চন্দ্রশেখর আজাদ ছিলেন হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের মধ্যমণি, বলতে গেলে, শেষ বল-ভরসা, তিনিও সেদিন চলে গেলেন। একে একে সবাই ধরা পড়েছেন। বাছা বাছা সভ্যদের দীর্ঘ-মেয়াদী কারাদণ্ড হয়েছে। তবে কি আশা করবার আর কিছুই নেই? বিপ্লবের শিখা কি শেষপর্যন্ত নিভে যাবে?

শত শত বীরপুরুষের রক্তস্রোত, তাঁদের আত্ম-বলিদান, ক্ষুব্ধ, ব্যথিত ও শোকাচ্ছন্ন দেশবাসী ও সতীর্থদের অশ্রুধারা সবই কি ধূলায় হবে হারা? দীর্ঘরাত্রির তপস্যা কি আনিবে না দিন?

লোহার গরাদে হাত রেখে সম্মুখের কৃষ্ণ-যবনিকার প্রতি অপলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিশ্চুপ হয়ে রইলেন ভগৎ সিং।

তারপর সেই নিরাশার নিরন্ধ্র আঁধারের মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানির মতো আশার রুপোলী বিজুরি রেখা দেখতে পেয়ে আবার বলে উঠলেন নিজের মনেঃ না না—ভগৎ সিং পরাজয় মানে না। সে ব্যর্থতার গ্লানিতে নুয়ে পড়বে না। পড়তে পারে না। আর, বিপ্লবী চরিত্রের তো তা-ই পরিচয়! প্রথম থেকে শেষ কথা, হার না মানা, পরাজয় স্বীকার না করা!

বিপ্লবীর কাছে মৃত্যু তুচ্ছ। জীবন তুচ্ছ। ইহলোকের সুখ তুচ্ছ। তুচ্ছ বিলাসিতা। তুচ্ছ সম্ভোগ। তুচ্ছ আরাম। তুচ্ছ বিরাম।

মাতা-পিতার প্রতি ভালবাসা, স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ, বিবাহের বাহুল্যতা, সন্তানের প্রতি স্নেহ, মায়া, মমতা, সব—সব তুচ্ছ। তার নিজের দেহের গ্লানি মিথ্যে, যাতনা মিথ্যে। অনুশোচনা মিথ্যে, মিথ্যে সব। সত্য একমাত্র বিপ্লবী আদর্শ। আর সত্য সর্বস্বত্যাগের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দুঃখ-বরণ। এই বিপ্লবী আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে কত বীর নিজেকে বলিদান দিয়েছেন। হয়েছেন

শহীদ। হয়েছেন অক্ষয়। কর্তার সিং সরাবা তাঁদের মধ্যে তেমনি একজন পরম-পুরুষ। তাছাড়া নীরবে মৃত্যুবরণ করে সাথী ভগবতী চরণ শেষমুহূর্তেও বিপ্লবের জয়গান গেয়ে গেছেন।

তার আগে দলের ঠাকুর রোশন সিং, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, আস-ফাঁকউল্লা, রামপ্রসাদ বিসমিল দেখিয়ে গেছেন সেই একই পথ ও নিশানা।

তাছাড়া বিভিন্ন কারাগারে শত শত স্বাধীনতা-সংগ্রামী মৃত্যু-যন্ত্রণাসম অশেষ প্রকার কারা-পীড়ন সহ্য করে অপরের কারা-ক্লেশ ভোগ সহজ করে দিচ্ছেন। ওঁরা যেন আজ সবাই বলছেন:

"ভগৎ সিং নিরাশ হয়ো না, ভগ্নোৎসাহ হয়ো না, দুর্বল হয়ো না, হেরে যেয়ো না! সত্যিকার বিপ্লবীর দৃষ্টিভঙ্গী, সাহস ও চরিত্র নিয়ে বিচার কর, বিশ্লেষণ কর, চিন্তা কর আর বীর পদভরে অগ্রসর হও!"

তাঁদের সেদিনের চিন্তাধারা কবি রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাব ও ভাষায় রূপায়িত হয়ে যেন বলে উঠলো:

বলো মিথ্যা আপনার সুখ, মিথ্যা আপনার দুঃখ
স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে,
সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে নির্ভয়ে ছুটিতে হবে,
সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা। মৃত্যুরে না করি শঙ্কা।
দুর্দিনের অশ্রুজলধারা মস্তকে পড়িবে ঝরি
তারি মাঝে যাব অভিসারে তার কাছে
জীবন সর্বস্ব ধন অর্পিয়াছি যারে।
কে সে? জানি না কে? চিনি নাই তারে, শুধু এইটুকু জানি
তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে
যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।

শুধু জানি, যে শুনেছে কানে, তাহার আহ্বান গীত ছুটেছে সে
নির্ভীক পরাণে, সঙ্কট আবর্ত মাঝে দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন।
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন শুনেছে সে
সঙ্গীতের মতো।
দহিয়াছে অগ্নি তারে, বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে
কুঠার,
সর্ব প্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন চিরজন্ম তারি লাগি
জ্বেলেছে সে হোম হুতাশন,
হৃদপিণ্ড করিয়া ছিন্ন, রক্ত পদ্ম অর্ঘ্য উপহারে ভক্তি ভরে
জন্ম শোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে, মরণে কৃতার্থ
করি প্রাণ।*

মনে পড়লো শ্রদ্ধেয় পিতা কিষাণ সিং-এর বিশুষ্ক চেহারা আর অনুরাগী ভ্রাতা কুলবীর, কুলতার, রণবীর ও রাজেনের কথা।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো বোন অমর আর সুমিত্রার কোমল চাহনি আর অশ্রু-সজল আঁখি-কোণ।

এমনি সব চিন্তায় তন্ময় হয়ে কোমল-কঠিন ও আবেগ-চঞ্চল স্নায়ুমণ্ডলীকে বার বার সংযত করে পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রসম ভগৎ সিং ফাঁসির কয়েদীর জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত আলো-বাতাসহীন অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে অপরিছন্ন ক্ষুদ্রতম কক্ষের ভেতর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, হাতে-পায়ে লোহার বেড়ি আর শেকল পরে।

তবু তাঁর মনে পড়তে লাগলো অপার স্নেহময়ী মাতা বিদ্যাবতীর অশ্রু-সজল বিষন্ন মুখখানি।

মনে পড়লো কারাগারে আবদ্ধ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী ও অন্যান্য প্রিয় সাথীদের ব্যথা-ভরা দুঃখের দিন-রাত্রির ছবি।

মনে পড়লো অতীত দিনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা:

*'এবার ফিরাও মোরে',—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাকোরী ট্রেন ডাকাতির মামলার অন্যতম বন্দী যোগেশদাকে (যোগেশ চ্যাটার্জী) পুলিসের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার তাগিদে আগ্রা রেল-স্টেশনে বন্দীকে অনুসরণ করার কথা। কিন্তু সময়ের হের-ফেরে ব্যর্থ হল সেই পরিকল্পনা। সেই ব্যর্থতার গ্লানিতে নুয়ে পড়ে শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার লজ্জিত কাহিনী। সেদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ, বিজয় কুমার সিন্‌হা, বটুকেশ্বর দত্ত, রাজগুরু, শিউরাম, সদাশিব মালকা পুরকার ও ভগবান দাস মাহোরে।

* * *

মনে পড়লো তাঁর অপরাপর বন্ধুদের কথা—যাঁরা তাঁকে এই লাহোর জেল ভেঙে একাধিকবার চেয়েছেন বাইরের মুক্ত বাতাসে নিয়ে যেতে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ, যশপাল, শুকদেব, হংসরাজ ওয়ারলেশ আর ভগবতী চরণ ভোরাও।

মনে পড়লো দিল্লীর "দেড়বা" এলাকার গুপ্ত আশ্রয়স্থলের কথা। যেখানে যাতায়াত করতেন বিশ্বস্ত সতীর্থগণ। মনে পড়লো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বোমা নিক্ষেপ করার আগে বটুকেশ্বরকে নিয়ে একাধিকবার ব্যবস্থাপক সভা পর্যবেক্ষণ করার ঘটনা।

আজ এই ব্যাকুল সন্ধ্যায়, জীবন নাট্যের শেষঅঙ্কে, সেই সব কথা মনে পড়ে কেন জানি হঠাৎ হাসি পেল ভগৎ সিং-এর। নিজের মনে তাই হো হো করে হাসতে লাগেলন প্রাণ খুলে, কারা-কক্ষের লৌহ-কপাট ধরে।

অদূরের কারা-রক্ষী ফাঁসির আসামী ক্রান্তিকারী ভগৎ সিং-এর এই হাসির মানে না খুঁজে পেয়ে বলে উঠলো: "মালুম হোতা হ্যায় দিওয়ানা হো গয়া।"

* * * *

মনে পড়লো ছোট্ট বয়সের প্রায় তুচ্ছ আর একটি ছোট্ট ঘটনা। তখন শৈশব অতিক্রান্ত, কৈশোরও যায়-যায়।

আর এই কৈশোর অতিক্রমের দিনেও ছেলের মনে সংসার পাতার দিকে এতটুকু আসক্তির চিহ্ন না দেখে চিন্তিত মনে, মা যখন তুলতে লাগলেন বিয়ের কথা, ভগৎ সিং তখন দুষ্টহাসি হেসে মাকে বলতেন: "বিয়ে তো আমার ঠিক হয়ে গেছে মা!"

ছেলের হেঁয়ালী ধরতে না পেরে সরল মনে মা তক্ষুণি জিজ্ঞেস করতেন একের জায়গায় হাজার প্রশ্ন।

কনের নাম কি? বয়স কত? দেখতে কেমন? ঘর কোথায়?

ভগৎ সিং স্নেহশীলা জননীর এ ধরনের আব্দারে প্রশ্নে অভ্যস্ত ছিলেন। আবার মাকে রাগাতেও পটু ছিলেন। তাই পরিহাসছলে উত্তরে বলতেন: "আমার বিয়ের কনের নাম মৃত্যু। আমার বিয়ের মালা হল ফাঁসির দড়ি। আর সে মালা-বদল হবে ফাঁসি-মঞ্চের বাসরে কোন এক রাত্রে।" এসব আজে-বাজে কথা শুনে মা যেতেন ভীষণ রেগে। দু'হাতে চেপে ধরতেন নিজের কান। যাতে এমন অলুক্ষণে কথা শুনতে না হয়। তার পর যেতেন তেড়ে-ফুঁড়ে ছেলেকে ধরতে।

ভগৎ সিং তখন লম্বা লম্বা পা ফেলে দিতেন চো-চা দৌড়। তারপর দূরে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকতেন মিট্ মিট্ করে। পাগল ছেলের এমনি সব কাণ্ড-কারখানা দেখে মাকেও শেষপর্যন্ত যোগ দিতে হত ছেলের চপল হাসিতে।

পরে কপট ক্রোধে বলতে হত: "ঢের হয়েছে! এবার আয় তো দেখি! খেয়ে নে পেট ভরে। তারপর যা দেখি কোথায় যাবি! পারিনে আর দস্যি ছেলেকে নিয়ে!" এমনিভাবে ঘটত ঘটনার পরিসমাপ্তি।

এসব দুর্বল চিন্তাধারা মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি দিতে দেখে ভগৎ সিং আবার হেসে উঠলেন নিজের মনে। তারপর নিঃশেষে ঝেড়ে ফেললেন ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা, পরিবারগত আকর্ষণ—মায়া, মোহ, অনুরাগ ও প্রীতি।

পরিবর্তে ধ্যানে আনলেন বৃহত্তর ভাবনা। এক পরিবার, এক জননী ছেড়ে শত-সহস্র পরিবার ও জননীদের মর্মজ্বালার কথা। ভাবলেন শতাব্দী-প্রাচীন দেশমাতার উষ্ণ দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের করুণ কাহিনী,—তার আশু মুক্তির প্রশ্নের সমাধানের কথা। আর সেই স্বপ্নে বিভোর হলেন। আত্মমগ্ন হয়ে বশে আনলেন আগোছাল অস্থিরতা। তাড়ালেন চিন্তা থেকে মনের মধ্যে গেঁথে থাকা ক্ষুদ্র স্বার্থের চারুলতা। তারপর গেয়ে উঠলেন বিপ্লবের জয়গান,—"ইনক্লাব জিন্দাবাদ"!

ইতিমধ্যে অতি সংগোপনে কারাগারের অপর এক নিভৃত ও সাধারণত অব্যবহার্য কোণে "ফাঁসি-মঞ্চের" মহড়া চলছে। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় "রিহার্শেল"।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী বা আসামীদের আলাদা আলাদা দৈহিক ওজন অনুসারে পৃথক পৃথক বালি-ভর্তি চটের থলে নিয়ে কপিকলের ওপর মোম-মাখানো ম্যানিলা রোপের* সহজ চলাচল ব্যবস্থা শেষ হল।

লিভার (Lever) টানার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসির মঞ্চ (যেখানটায় আসামীকে ঝুলিয়ে দেবার পূর্বাহ্নে দাঁড় করান হয়) অর্থাৎ, সেই কাঠের ঢাকনা বা আবরণ চকিতে সরে গিয়ে দড়ির সঙ্গে বাঁধা বালির থলে নিচে পড়ে যায়। তারপর ফাঁসির মঞ্চের নিকষ কালো অন্ধকার গহ্বরে শূন্যে ঝুলতে থাকে দড়িকে অবলম্বন করে।

ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত মনুষ্যেতর প্রাণীর বেলা (এক্ষেত্রে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের বরাতে একটু পরে যা হবে) এই প্রক্রিয়াকালে তার গলার হাড় ভেঙে গিয়ে নিষ্প্রাণ দেহটা ঝুলতে থাকে বিশেষভাবে তৈরি ঐ ম্যানিলা রজ্জু অবলম্বন করে,— ফাঁসির মঞ্চের অন্ধকার গহ্বরে।

---

*বিশেষভাবে তৈরি এক ধরনের রজ্জু

শেষটায় আবার সেই ঝুলন্ত মৃতদেহ শূন্য গহ্বর থেকে টেনে ওপরে তোলা হয়। শিরা-উপশিরা কেটে বাঁচার অবশিষ্ট সম্ভাবনায় (যদি থাকে) মূলোৎপাটন করা হয়।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত:আসামী সম্পর্কে হুকুমে লেখা থাকে :

"To be hanged by the neck till death".

"টু বি হ্যাংড বাই দি নেক টিল ডেথ।" (মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখতে হবে)।

ওদিকে কুখ্যাত লাহোর কারাগারের চোরা-দরজার কাছে প্রায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো গোড়া-সৈন্য-বোঝাই পর পর তিনটি মোটরগাড়ি ।সঙ্গে কিছু শুকনো কাঠ আর কেরোসিন তেল।

তারপর সেই খুনী-সন্ধ্যায় সরকারী ইঙ্গিতে সাক্ষাৎ যমদূত সদৃশ রক্তচক্ষু মত্তপ জহ্লাদ পরম উল্লাসে ভগৎ সিং-এর সেলের দরজার কাছে উপস্থিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে হেঁকে বললো : "ভগৎ সিং তৈয়ার হও !"

সেই সঙ্গে নিষ্করুণ নির্দয় ঘাতকের চোখে-মুখে ফুটে উঠলো জঘন্য হিংসা আর কুটিল আত্মপ্রসাদের বীভৎস কালোছায়া। ভীম-দর্শন মৃত্যুদূত ভেবেছিল, তার ভয়ঙ্কর চেহারা আর তার চেয়েও ভয়াবহ ফাঁসির সংবাদ পেয়ে ডাকু আসামী ভগৎ সিং ভয়ে আঁৎকে উঠবেন। কাঁদবেন। হাঁটু ভেঙে মেঝেতে বসে পড়ে করজোড়ে তার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবেন। ফাঁসির অনেক আসামীদের এমন করতে সে দেখেছে।

["একটা ব্যাপার খুব প্রত্যক্ষ করেছিলাম। বেশির ভাগ আসামীই বিশ্বাস করতেন না যে, সকালে তাঁর ফাঁসিতে প্রাণ যাবে। মনে করতেন, এমন একটা না একটা ব্যাপার ঘটবে, যাতে তিনি বেঁচে যাবেন। যাদের ফাঁসিতে যেতে দেখেছি তাদের

অপরাধের ইতিহাস এক একটা আকর্ষণীয় কাহিনী। অপরাধ বা খুনের ব্যাপারটার বৈচিত্র্য দেখে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছি।

তারপর রাত্রিবেলা সুরু হত নানাপ্রকারের ব্যাপার। কেউ সারারাত্রি ধরে রাম-নাম করতেন, কেউ চিৎকার করতেন। ভোর পাঁচটার সময় সুপারিণ্টেডেণ্ট দলবলসহ যখন নিতে আসত,—তখন কী বুক-ফাটা চিৎকার আর করুণ আর্তনাদ! "সাহাব মুঝে ছোড় দো, ম্যঁয় বিলকুল কসুর কর নহী, ছোড় দো সাব, ছোড় দো!"

এই চিৎকার সাধারণ ব্যাপার ছিল। কাউকে টানতে টানতে নিয়ে যেতে হয়েছে। সেলের ভেতর থেকে দেখতে পেতাম না বটে, কিন্তু দেখার চেয়েও বেশি প্রত্যক্ষ অনুভব করতাম"।]

কিন্তু না। এবার তার বদ্ধমূল ধারণা মিথ্যে প্রতিপন্ন করে প্রত্যুত্তরে ভগৎ সিং দীপ্তকণ্ঠে শত সিংহ-গর্জনের শক্তি নিয়ে বলে উঠলেন: "ইনক্লাব জিন্দাবাদ!"

মুহূর্তে সেই ধ্বনি ছড়িয়ে পড়লো সারা লাহোর কারাগারের কক্ষ হতে কক্ষান্তরে। অঙ্গন ছেড়ে প্রাঙ্গণে। তার সু-উচ্চ বৃক্ষ-পত্র-শাখায়। অট্টালিকা শীর্ষে, বায়ু তরঙ্গের কোলে কোলে ভেসে বেড়াতে লাগলো সেই বজ্র-কঠিন ধ্বনির রক্তিম প্রতিধ্বনি। সাধারণ কয়েদীরা বুঝে নিল, সময় হয়েছে।

বিপ্লবী বন্ধুরা সে-ধ্বনির মর্মান্তিক ইঙ্গিত গ্রহণ করে কারাগারে আবদ্ধ কক্ষের লৌহ-কপাট প্রাণপণে ঝেঁকে সশব্দে বলে উঠলেন, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ!"

সেই উচ্চগ্রামের ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনে মনে হচ্ছিল লাহোর কারাগারের সকল লৌহ-ফটক বুঝি আজ সব ভেঙে চুড়মার হয়ে

*বিভূতি দাশগুপ্ত গয়া জেলের অভিজ্ঞতা, ১৯৩৪

যাবে। সেই বিপ্লবের জয়ধ্বনির মধ্যে পঞ্চনদের বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং হাসিমুখে বেড়িয়ে এলেন "চৌদ্দ নম্বর" কনডেম্‌ড সেল থেকে। বায়ে তাঁর অবিচলিত শুকদেব। দক্ষিণে ভয়হীন রাজগুরু। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য!

তিন বিপ্লবী ফাঁসির বন্দী সঙ্গীণধারী সশস্ত্র রক্ষী-বেষ্টিত হয়ে স্বাভাবিক পদক্ষেপে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে চললেন।

তাঁদের নির্ভীক চলার ছন্দে যেন আভাস পাওয়া গেল শেকল-ভাঙা গানের সার্থক অভিব্যক্তি:

"এই শিকল পরা ছল মোদের, এ শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।
তোমার বন্দী কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।
এই বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করব মোরা জয়।"

১৯২৩ সালে বাংলা দেশের হুগলী কারাগারে বসে লেখা শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী কবি নজরুলের সেই ভয়-ভাঙার গানের সুমহান ছন্দে পা মিলিয়ে নিজের অজান্তে বীর ভগৎ সিং যখন মাথা উঁচু করে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছেন, দু'পাশে ফাঁসির অপর দুই বন্দীকে নিয়ে, তখন প্রকৃতপক্ষে তাঁর নির্ভীককণ্ঠে আবৃত্ত হচ্ছে উত্তর প্রদেশের কবি বিমলের লেখা দুটি অপূর্ব গানের কলি:

"যুদা মৎ হো মেরে পহেলেস্‌
এ দরদে বতন হার গিস্‌
শুনা হ্যাঁয় আজ, মুকতল মেঁ হামারা
ইস্তাহান হোগা।"*

[হে দেশমাতা, তুমি আমার কাছ থেকে কখনও দূরে থেকো না। শুনতে পাচ্ছি, ফাঁসি-মঞ্চে নাকি আজ আমার চরম পরীক্ষা হবে]

---

*'ভগৎ সিং ও দত্তের অমর কাহিনী', সম্পাদক, চমন লাল আজাদ।

সেদিন সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তের কথা বলতে গিয়ে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীকাউল তাঁর বহু বিতর্কিত গ্রন্থ "অকথিত কাহিনী" (Untold Story)-তে বলেছেন :

"ভগৎ সিং ছাড়া রাজগুরু ও শুকদেবের দেশকে ভালবাসার জন্য সেদিন ফাঁসি হয়ে গেল।

ভগৎ সিং-এর পালা যখন এলো, ফাঁসির মঞ্চে ওঠায় আগে তাঁকে দেওয়া হল একটি মুখোস। ঘৃণায় সেই মুখোস দূরে নিক্ষেপ করে নির্ভীক পদপেক্ষে গর্বোন্নত শিরে এগিয়ে গিয়ে চুম্বন করলেন ফাঁসির রজ্জু।

বললেন, 'আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারছি।'

তারপর তিনি সমবেত নীরব সাক্ষীবৃন্দ, জেলার, ডাক্তার ও বিচারকের কাছ থেকে নিলেন শেষ-বিদায়।

চোখে তাঁর জ্বলে উঠলো বিদ্যুৎবহ্নি, ওষ্ঠে ফুটে উঠলো বিপ্লবের জয়ধ্বনি। তারপব সব শেষ।

সেদিন একজন দেশ-প্রেমিককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দুঃখে আব লজ্জায় মুষ্টিমেয় ভারতীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ রইলেন মাথা নিচু করে।"

(Two others besides Bhagat Singh, Rajguru and Sukdev were being hanged that day for their country.

When Bhagat Singh's turn came, he was given a mask to cover his face, before he went to gallows.

He threw it away scornfully, advanced his chin up with a steady unfaltering step, solemnly kissed his gallows, saying he was lucky to be laying down his life for his country. He then bade good-bye to the Indian jailor, doctor, magistrate, who stood there as silent witnesses.

He was hanged with his eyes breathing fire with revolution on his lips

The handful of Indian official present at the time, hung their heads in sorrow and shame for hanging a patriot.)*

* * *

ফাঁসির পর—

শহীদ ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর আত্মা যেন ইংরেজ সরকারকে হিন্দুস্থান সোসালিস্ট আর্মির বিশেষ একটি ইস্তাহারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে শ্লেষভরে বলতে লাগলো :

"You can kill individuals, but not the ideas.
Great Empires crumbled, but the lofty ideas,
That led to their down fall, still survive.
The Bourbons* (i) and the* (ii) Czars fell,

---

*(১) ফরাসী-বিপ্লবের ফলে মদগর্বী বুরবনস্ গোষ্ঠীর পতন ঘটে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। দেওয়ালের লিখন-পাঠে অক্ষম ও অনিচ্ছুক দুর্বলচিত্ত ষোড়শ লুই তখন ফরাসী সম্রাট। দুর্বিনীতা বিলাসিনী রাণী মেরি আতোয়ানেত তখন সম্রাজ্ঞী। এক অভাবিত দুঃস্বপ্নের মতো ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট সহসা রাজপ্রাসাদ হল আক্রান্ত। মুহূর্তের মধ্যে রাজা হলেন রাজচ্যুত !! নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে। তারপর বিপ্লবী আদালতের বিচারে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি ষোড়শ লুই প্রাণ হারান গিলাটিনে !!!!

রাণী মেরি আতোয়ানেত প্রাণ দেন ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর। তারপর উর্ধ্বে উত্থিত হয় সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উজ্জ্বল পতাকা।

*(২) রাশিয়ার অত্যাচারী জার সম্রাট নিকোলাস ও তাঁর ভ্রাতা মিখাইলের সিংহাসন চ্যুতি ঘটে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে।

তারপর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ঐতিহাসিক বলশেভিক বিপ্লবের পরিণামে যুগান্তব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও অত্যাচারের ঘটে অবসান। প্রতিষ্ঠিত হয় শোষিত জণগনের আকাংখিত সরকার। মহামতি লেনিন ছিলেন যার পরিচালক।

While revolutioneries marched triumphantly ahead."†

ভাবানুবাদ

তুমি ব্যক্তি বিশেষকে হত্যা করিতে পার, কিন্তু ভাবধারাকে নয়। যে সকল মহান চিন্তাধারার সংঘাতের ফলে বিশেষ বিশেষ সাম্রাজ্যগুলি মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, সেই সকল চিন্তাধারার কিন্তু বিনাশ ঘটে নাই। "বুরবনস্" ও "জার"-এর পতন হওয়া সত্ত্বেও বিপ্লবীদের জয়যাত্রা আজও অব্যাহত গতিতে চলিতেছে।

কথায় আছে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

তাই সদাশয় ইংরেজ সরকার সেদিনের সেই কপট রাত্রিছায়ে শত প্রহরীর সতর্ক পাহারায় মৃতদেহ তিনটি নিয়ে গেলেন—দূরে, শতদ্রু নদীতীরে। তারপর?

সেই প্রশ্নের জবাবে এবার বলেছেন ভগৎ সিং-এর বিপ্লবী-জীবনের দিবারাত্রির অন্যতম সাথী, দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভায় বোমা নিক্ষেপের বিপ্লবী সঙ্গী, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী বটুকেশ্বর দত্ত:

"তারপর নিষ্ঠুরভাবে মৃতদেহগুলি অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পরিত্যক্ত হল বিশুষ্ক শতদ্রু নদীর বালুকাবেলায়।"

(Batukeswar went on to say that, their bodies were cremeted by Govt. on the same day on dry bed of sutlej and left there mercilessly half-charred."*

---

† ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল দিল্লীর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বোমা নিক্ষেপের পরে বিপ্লবী ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত দ্বারা বিতরিত হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান আরমির ইস্তাহারের অংশ বিশেষ।

*"Untold Story",—Kaul

এমনি করে ভগৎ সিং আদর্শের জন্য এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন দেশ ও দশের কাছে ; কথা আর কাজের স্মরণীয় সামঞ্জস্য দেখিয়ে।

ফাঁসির আসামীর কাছে জীবনের যে অন্তিম রাত আসে মৃত্যুর বিভীষিকা আর সম্ভাব্য যম-যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ আতঙ্ক, ভয়, আর বেদনাবোধ নিয়ে, তাকে তিনি ভরে তুললেন "সোহাগ রাতে"র কবিত্ব আর প্রীতিভরা রমণীয় চিন্তার মোহময় আবেশ দিয়ে।

এমনি করে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করলেন বীর শহীদ কর্তার সিং সরাবার উচ্চ আদর্শ ও ভাবধারা। যে অসাধ্য-সাধনের পেছনে ছুটে ষোল বছর আগে সরাবা আত্ম-বলিদান করেছিলেন ১৯১৫ সালের ১৬ই নভেম্বর,—এই লাহোর কারাগারের ফাঁসির রজ্জুতে, তাঁর কবিতার গাঁথা সার্থক করলেন অক্ষরে অক্ষরে ; যা ছিল ভগৎ সিং-এর জপের মালা :

"সেবা দেশ দি জিন্দিরিয়ে বড়ি ওখি
গ্যালন করনিয়ান ঢের সুখালিয়ান নে,
জিন্হান দেশ সেবা বিচ্ প্যার পায়া
উনহান লাখ্ মুসিবতান ঝলিয়ান নে।"

(দেশের সেবা করব বলা তো সোজা,
কিন্তু করা কঠিন।
কারণ, দেশপ্রেমের পথে ছড়ানো রয়েছে
অগুণতি বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট
আর মরণসম অশেষ পীড়ণ।)

* * *

১৯০৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরের নবীন প্রভাতে যাঁর জন্ম হয়েছিল মাতা বিদ্যাবতীর গর্ভ সার্থক করে, তিনি জীবনের চব্বিশটি বসন্ত শেষে চঞ্চল যৌবনধর্মের ব্যক্তিগত সুখের সকল দিক স্বেচ্ছায়

পরিত্যাগ করে, নিপীড়িত পরাধীন ভারতের কোটি কোটি মানুষের জন্মগত অধিকার,—স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য করলেন নিজেকে নির্বিচারে উৎসর্গ। কবিগুরু এমনি আত্মভোলা দেশসেবকদের সমর্পিত প্রাণের দিকে তাকিয়ে লিখেছিলেন তাঁর "যৌবন" কবিতায় :

"যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে ?
তুই যে পারিস কাঁটাগাছের উচ্চ ডালের পরে
পুচ্ছ নাচাতে।

*　　*　　*

যৌবন রে, তুই কি কাঙাল, আয়ুর ভিখারী ?
মরণ-বনের অন্ধকারে গহন কাঁটা পথে
তুই যে শিকারী—
মৃত্যু যে তার পাত্রে বহন করে
অমৃতরস নিত্য তোমার তরে ,
বসে আছে মানিনী তোর প্রিয়া
মরণ-ঘোম্‌টা টানি।
সেই আবরণ দেখরে উতারিয়া
মুগ্ধ সে মুখখানি।"

*　　*　　*

এদিকে গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর ভগৎ সিংদের জীবন-রক্ষার জন্য কংগ্রেসের তৎপরতার কথা স্মরণ করতে গেলে দেখি যে, গান্ধীজী ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের মুক্তি কামনায় বিবৃতি দিয়ে সিমলা ছেড়ে করাচী কংগ্রেসে পৌঁছবার আগেই লাহোর ষড়যন্ত্র মামালার বীরত্রয়ের ফাঁসি হয়ে গেল।

ফলে, বিপ্লবী যুগান্তর দল, নওজোয়ান ভারত-সভা ও শত-সহস্র করাচীবাসীদের যে বিক্ষোভ ফেটে পড়লো, তাতে করাচী কংগ্রেস-সম্মেলনের মঞ্চ ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যাবার উপক্রম হল।

বিক্ষুব্ধ দলের মিছিলের রাশি রাশি কালো পতাকা করুণনেত্রে প্রত্যক্ষ করলেন গান্ধীজী তাঁর চারপাশে। হিম-শীতল বিষন্নতার মধ্যে তিনি বরণ করে নিলেন কালো ফুলের মালা।

তারপর প্রতিকূল অবস্থার তীব্র পীড়নে রাতের গভীরে বাধ্য হলেন সুভাষচন্দ্রের দ্বারস্থ হতে। জাগ্রত জনতার রোষবহ্নি থেকে কংগ্রেসকে বাঁচাতে সাহায্য চাইলেন।

অনেক কথার পর বিদ্রোহী তরুণদলের মুখপাত্র সুভাষচন্দ্র রাজী হলেন কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে বিরোধীপক্ষের হয়ে ভাষণ না দিতে।

কিন্তু কংগ্রেস-সম্মেলনের বাইরে প্রতিবাদ জানাবার অধিকার রাখলেন অব্যাহত।

ভগৎ সিং-এর ফাঁসির পরদিন, অর্থাৎ, ১৯৩১ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে করাচীতে অনুষ্ঠিত শোকাচ্ছন্ন জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে অবশেষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল ঃ

"This Congress while disassoiating itself from disapproving of political violence in any shape or form, places on record its admiration of the bravery sacrifice of late Sardar Bhagat Singh and his comrades Sreejuktas Sukdev and Rajguru and mourns with the bereaved families the loss of there lives."

(সর্বপ্রকার রাজনৈতিক হিংসার বাইরে থেকে এবং রাজনৈতিক হিংসার প্রতি নিন্দা প্রকাশ করে এই কংগ্রেস পরলোকগত সর্দার ভগৎ সিং এবং তাঁর সাথীদ্বয় শ্রীযুক্ত শুকদেব ও রাজগুরুর সাহস এবং আত্মত্যাগের প্রশংসা করছে।

এবং এই জীবন ক'টির অপূরণীয় ক্ষতিতে তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের শোকে অংশগ্রহণ করছে।

*   *   *

এই ২৪শে মার্চ (১৯৩১) তারিখে লাহোর জেলা-শাসকের নামাঙ্কিত এক মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি দেখা গেল লাহোরের পথে পথে :

"এতদ্বারা জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের মৃতদেহ (যাদের গত ২৩শে মার্চ সন্ধ্যায় ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল) জেল হইতে লইয়া শতদ্রু নদীতীরে শিখ এবং হিন্দুধর্মের নিয়ম অনুসারে দাহ করা হইয়াছে।

দেহাবশিষ্ট জলে বিসর্জিত হইয়াছে।"

*   *   *

ভগৎ সিং-এর মৃত্যুতে জহরলাল নেহেরু বললেন :

"পাছে আমার কোন একটি কথার দ্বারা তাঁদের ফাঁসির দণ্ড মকুবের অন্তরায় ঘটে, তাই শেষের এ ক'দিন আমি ছিলাম সম্পূর্ণ নীরব। গভীর বেদনায় যখন আমি প্রায় ফেটে পড়ছিলাম, তখনও মুখ খুলিনি। এখন সব শেষ হয়ে গেছে।

যাঁর অপূর্ব সাহস ও আত্মত্যাগ আমাদের কাছে ছিল এত আদরেব আর ভারতের যুবকদের কাছে যা ছিল অনুপ্রেবণার বস্তু, তাঁকে আমরা সকলে মিলেও বাঁচাতে পারলাম না। ভারত তার একান্ত প্রিয় সন্তানদের ফাঁসির রজ্জু থেকে বাঁচাতে পারে না। সর্বত্র এখন শোক-মিছিল, হরতাল, শোক-সভা ও শোক-স্মরণী হবে। আমাদের এই চরম অসহায়তার জন্য দুঃখ হবে, কিন্তু যিনি আজ আর বেঁচে নেই, তাঁর জন্য গর্বও অনুভূত হবে।

একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়ার জন্য যখন ইংরেজ আমাদের সঙ্গে কথা বলবে, তখন তাদের ও আমাদের মাঝখানে থাকবে ভগৎ সিং-এর মৃতদেহ।"

(I have remained absolutely silent during the last days, just a word of mine injure their prospects of com-

mutation. I have remained silent though I feel like bursting; and now all is over. Not all of us could save him who was so dear to us and whose magnificent courage and sacrifice have been an inspiration to the youth of India. India cannot even save her dearly loved children from the gallows. There will be hartals, mourning, processions every where. There will be sorrow in the land of our utter helplessness, but there will be pride in him who is no more and when England speaks to us and talks of settlement, there will be the corpse of Bhagat Singh between us.)

সুভাষচন্দ্র বললেন :

"যে বিদ্রোহী আত্মা আজ দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর এক প্রান্ত পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছে, ভগৎ সিং ছিলেন সেই বিদ্রোহী আত্মার প্রতীক স্বরূপ।

সেই অজেয় শক্তি যে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছে, তা জ্বলতে থাকবে চিরদিন।"

(Bhagat Singh was a symbol of the spirit of revolt, which had taken possession of the country from one end to the others, and the flames, which the spirit has lit up, will not die.)

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বললেন :

"There never has been so much romance round any life as had surrounded that of Bhagat Singh's patriotism, his courage and his deep love for Indian humanity.

From all accounts, received by me, his daring was unequalled. Thousands feel to-day, personally bereaved by his death. In this country of self suppression and timidity almost bordering on cowardice, we cannot have too much bravery or too much self-sacrifice. Our heads bend before Bhagat Singh's bravery and sacrifice."

(ভগৎ সিংকে অবলম্বন করে যত কাহিনী, যত দেশপ্রেম, যত সাহস এবং গোটা মনুষ্য-সমাজের প্রতি যত প্রগাঢ় ভালবাসা পরিলক্ষিত হয়েছিল, তেমনটি আর দেখা যায়নি।

চারিদিক থেকে আমি যতরকম খবর পেয়েছি, তাতে দেখা গেছে, তার অসীম সাহসের সঙ্গে আর কারো তুলনাই হয় না।

হাজার হাজার দেশবাসী তার মৃত্যুকে নিজেদের ব্যক্তিগত শোক বলে গণ্য করেছে। এই দেশে যেখানে আত্মসঙ্কোচন ও ভীরুতা প্রায় কাপুরুষতায় পর্যায়ে পড়ে, সেখানে এত সাহস, এত ত্যাগ কল্পনাই করা যায় না। আমরা ভগৎ সিং-এর বীরত্বের কাছে শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত করছি।*)

এ সম্পর্কে মাইকেল এডোয়ার্ডস্ তাঁর "লাষ্ট ইয়ারস্ অফ ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়াতে" বলেছেন : (পৃঃ ৫৯)

"It has also been suggested that Gandhi put forward the request for clemency in a half-hearted way and this may well been true, for his hatred of violence

* ("মারটার হজ মেসেজ ইজ আনডাইং," বিজয় কুমার সিন্‌হা.

was so acute that it inhebited him from pressing the case of Bhagat Singh with any great enthusiasm. When the execution took place Gandhi sensed the emotional atmosphere and condemned it as a 'first class blunder!

But Congress was not much concerned with Bhagat Singh and he was soon forgotten".

(এমন কথাও বলা হয়েছে যে, গান্ধী প্রাণভিক্ষার অনুরোধটি সর্বান্তকরণ দিয়ে পেশ করেননি। একথা সত্যি হতে পারে। কারণ, হিংসার পথ সম্পর্কে গান্ধীর যে তীব্র ঘৃণা হৃদয়ে গাঁথা ছিল, সেই ঘৃণাই তাঁকে ভগৎ সিং সম্পর্কে জোর দিয়ে কিছু বলতে বারংবার নিষেধ করেছিল।

কিন্তু ফাঁসি হয়ে যাবার পর ঘটনার গভীর আবেগময় প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সজাগ হয়ে তিনি তাঁর নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। আর সেই ভুলকে 'প্রথমশ্রেণী'র ভুল বলে স্বীকারও করেছিলেন।

কিন্তু ভগৎ সিংকে নিয়ে কংগ্রেসের কোন মাথা-ব্যথা ছিল না। তাই তিনি খুব শীঘ্রই বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে গিয়েছিলেন।)

এই মাইকেল এডোয়ার্ডস তাঁর "দি লাষ্ট ইয়ারস্ অফ ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া"তে গান্ধীজী ও বিপ্লবীদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আরও বলেছিলেন (পৃঃ ৪৭):

"The British felt that, they had little to fear from Gandhi, for they soon recognised him for what he was anti-Western reformer.

If once Gandhi ceased to dominate Congress, the machine he had built up might well be used by more dynamic and violent people.

So the Govt. obliged Gandhi, by treating him with considerable respect, jailing him occasionally to keep up appearances, while they took much more positive action aganist terrorist and those Western-styled revolutioneries, whom they really feared."

(ইংরেজরা শীগ্‌গীরই বুঝতে পেরেছিল যে, গান্ধীকে ভয় করার মতো তেমন কিছু নেই। কারণ, তাদের মতে তিনি হলেন বড় জোর একজন পশ্চিম-বিদ্বেষী সমাজ-সংস্কারক।

তবু এই গান্ধী যদি কংগ্রেস-এর ওপর আধিপত্য করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, তবে তাঁর তৈরি কংগ্রেস নামক শক্তিশালী যন্ত্রটি পরিচালিত হবে তার চাইতে অধিক গতিশীল এবং সশস্ত্র বিপ্লবের বিশ্বাসী ব্যক্তিদের দ্বারা।

তাই সরকার তাঁকে খুব ঘটা করে প্রকাশ্যে সম্মান দেখাতেন আর লোক দেখানোর জন্য কখনো-সখনো কারাগারে পাঠাতেন।

অপরদিকে তারা এর চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করত সন্ত্রাসবাদী ও পশ্চিম-ঘেঁষা বিপ্লবীদের সম্পর্কে।

কারণ, সত্যি বলতে কি, তাদেরই ইংরেজেরা ভয় করত।)

পরবর্তীকালে এই প্রসঙ্গে এসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছিলেন তাঁর "ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল" গ্রন্থে (পৃঃ ২০৬), করাচী কংগ্রেসের প্রস্তাব উল্লেখ করে:

"Among the resolutions adopted at the Congress was one appreciating the courage and self sacrifice of

Sardar Bhagat Singh and his comrades, while condemning all acts of violence. This resolution was on the same lines as the 'Gopinath Saha resolution' adopted by the Bengal Provincial Conference in 1924, of which the Mahatma had strongly disapproved.*

The circumstances at Karachi were such that the resolution had to be swallowed by people who under ordinary circumstances would not have come with in miles of it. So far as the Mahatma was concerned, he had to make his conscience some what elastic. But that was not enough.

To perfect the stage management, Sardar Kishen Singh, the father of late Sardar Bhagat Singh was brought to the rostum and made to speak in support of the Congress leaders."

(করাচী কংগ্রেসে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম প্রস্তাব ছিল সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর বিপ্লবী সাথীদের সাহস ও আত্মত্যাগের প্রশংসা-জ্ঞাপক। অবশ্য সেই প্রস্তাবের এক অংশ জুড়ে ছিল সর্বপ্রকার হিংসাত্মক কার্যের প্রতি নিন্দাসূচক ভাব ও ভাষা। এ প্রস্তাব ছিল ১৯২৪ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে গৃহীত গোপীনাথ সাহার প্রস্তাবের অনুরূপ। যদিও

*১৯২৪ সালের যে মাসে গোপীনাথ সাহার ফাঁসিতে দুঃখিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে মোঃ আক্রাম খাঁর সভাপতিত্বে সিরাজগঞ্জে শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যে প্রস্তাব এনেছিল, গান্ধীজীর আপত্তিতে পরে আমেদাবাদ কংগ্রেসে সে প্রস্তাবের বিপরীত প্রস্তাব নেওয়া হয়

সেদিন মহাত্মা সেই প্রস্তাবে জানিয়েছিলেন তীব্র আপত্তি ও প্রতিবাদ। করাচী কংগ্রেসের পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তাঁদের কিন্তু সেই প্রস্তাবের তিক্ত (?) বটিকা গলাধঃকরণ করতে হয়েছিল—যাঁরা সাধারণভাবে এমনতর প্রস্তাবের ধারে-কাছেও ঘেঁষবার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না।

মহাত্মাজী সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, এ বিষয়ে তিনি নিজেকে একটু উদারভাবাপন্ন করে তুলেছিলেন।

কিন্তু এটাও শেষ কথা নয়। রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা ত্রুটিহীন করার জন্য পরলোকগত ভগৎ সিং-এর পিতা সর্দার কিষাণ সিংকে ধরে এনে বক্তৃতা-বেদীর ওপরে টেনে তোলা হল কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে ওকালতি করতে ও কথা বলতে।)

* * *

এই নিরস্ত্র ও সশস্ত্র নীতি সম্পর্কে ইংরেজদের মনোভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাংলা ও উত্তরপ্রদেশের অন্যতম প্রধান বিপ্লবী পরলোকগত যোগেশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর লিখিত "ইন সার্চ অব ফ্রীডম" গ্রন্থে বলে গেছেন:

"The British Govt. did not attach much importance to the ten years of non-violence movement, but they trembled in their shoes at the revolutionry upsurge.

This was conclusively demonstrated when the British Govt. feared to appoint a fourth European magistrate for the district of Midnapore after the successive murders of three district magistrates there."

(দশ বছর যাবত যে নিরস্ত্র স্বদেশী আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাকে ইংরেজ সরকার তেমন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু

অপরদিকে এক একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা যে ভেতরে ভেতরে কতটা ভীত ও দুর্বল হয়ে পড়তেন, সেকথা পরিষ্কার-ভাবে বুঝতে পারা গিয়েছিল তখন, যখন বিপ্লবীদের হাতে মেদিনীপুর জেলায় পর পর তিনজন ইংরেজ জেলা-শাসকের মৃত্যুর পর চতুর্থ ইংরেজ জেলা-শাসক নিযুক্ত করতে ওঁরা ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলেন।)

* * *

এই তো গেল দেশের নেতৃবৃন্দ ও বিদেশী সাংবাদিকের বক্তব্য।

এবার ভগৎ সিং সম্পর্কে পুলিসের অভিমত কি ছিল, তা যদি জানতে চাই তবে দেখি যে, ১৯৩১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে পুলিসের সংবাদে লেখা রয়েছে :

"Both Azad and Bhagat Singh are names who are likely to live in popular memory……he (Bhagat Singh) is regarded to-day as a hero, a Martyr and a most illustrious son of India."

[Home Dept., Govt. of India, 1931. File No. 18/111, Page, 82]

(আজাদ ও ভগৎ সিং-এর নাম জনসাধারণের সুখ-স্মৃতিতে জেগে থাকবে চিরদিন। তিনি (ভগৎ সিং) আজ ভারতমাতার সর্বশ্রেষ্ঠ বীর সন্তান ও শহীদরূপে স্বীকৃত হয়েছেন।)

পরিশিষ্ট

এবার আমাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাস্থল বিহার প্রদেশের অন্তর্গত "বেতিয়া" জনপদ। সেখানে ফণী ঘোষ পার্শ্ববর্তী দোকানদার গণেশপ্রসাদ গুপ্তজীর সঙ্গে নিজের দোকানে বসে কথা বলছিল। সময় সন্ধ্যা। একথা এখানে বলা ভালো যে, একদা এই ফণী ঘোষ মোতিহারী ষড়যন্ত্র মামলা, মাউলিয়া ডাকাতি ও পাটনা ষড়যন্ত্র মামলা প্রভৃতি অনেক রাজনৈতিক মামলায় গভীরভাবে জড়িত ও

লিপ্ত ছিল। সে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান দলের একজন বিশিষ্ট সভ্য ও কর্মী।

সেদিন ৯ই নভেম্বর, ১৯৩২ সাল। ফণী ঘোষ আর গণেশ-প্রসাদের কথা বলার মাঝখানে বলা নেই—কওয়া নেই পেছন থেকে হঠাৎ করে এসে পড়লো এক সুতীক্ষ্ণ ভোজালির নিশ্চিত অথচ তীব্র নিষ্করুণ আঘাত।

ভোজালির লক্ষ্য ফণী ঘোষের গ্রীবাদেশ।

মৃত্যুভয়ের আতঙ্কে ও আঘাতের বেদনায় বিদ্ধ হয়ে চিৎকার করে উঠলো ফণী ঘোষ সাহায্য পাবার আশায়। এমনি সময় গণেশপ্রসাদ গুপ্ত ফণী ঘোষের সাহায্যে এগিয়ে এলে ফণী ঘোষের আক্রমণকারীদের অন্যতম সাথী ত্বরিতগতিতে গণেশ-প্রসাদকে আঘাতের পর আঘাত করলেন ধারালো ভোজালি দিয়ে। তারপর ছুটে পালাতে লাগলেন। আহত গণেশপ্রসাদ মরিয়া হয়ে পশ্চাৎধাবন করলো আততায়ীর। সঙ্গে এসে জুটে গেল আশেপাশের আরও কিছু লোকজন।

ঘটনার কাছাকাছি যে জায়গায় দুটি সাইকেল বৈদ্যুতিক তারের থামে হেলান দেওয়া অবস্থায় রাখা ছিল, আততায়ীদ্বয় এবার সেদিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

এমনি সময় ওঁদের একজন অপরজনকে যেন অস্ফুটকণ্ঠে কানে কানে কিছু কথা বললেন বলে মনে হল। কারণ, ঠিক তারপরেই দেখা গেল যে, ওঁরা সাইকেলের মায়া কাটিয়ে একটু ডানদিক বেঁকে মিলিয়ে গেলেন।

আহত ফণী ঘোষ ও গণেশপ্রসাদ গুপ্ত মৃত্যুমুখে পতিত হল যথাক্রমে ১৭ ও ২০শে নভেম্বর (১৯৩২)।

* * *

এবার ধীরে ধীরে পুলিসের গোপনীয়তা ভেদ করে একথা ক্রমে প্রকাশিত হল যে, কিছুদিন থেকেই কারা যেন ফণী ঘোষকে আকারে-ইঙ্গিতে সতর্ক করে যাচ্ছিলেন।

*　　*　　*　　•

ফণী ঘোষ আক্রান্ত হওয়ার পঁচিশ দিন পর—

দুটি লালরঙের ইস্তাহার দেখা গেল সমস্তিপুর পৌরসভার কার্যালয়ে। সেদিন ১৪ই নভেম্বর (১৯৩২)।

তাতে লেখা ছিল :

"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্! ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসির প্রতিশোধ !!

সারা ভারত রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের অনুমতি নিয়ে আমি বিশ্বাসঘাতককে চরম শাস্তি দিয়েছি !

স্বাধীনতালাভের জন্য সত্যিকার পথ হচ্ছে বিপ্লবের পথ !

স্থির-মস্তিষ্কে একে বরণ করে নাও !

পরমাত্মার দুর্জয় শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাও !"

এদিকে ১৯৩২ সালের ১৪ই নভেম্বর ফণী ঘোষের আততায়ীদ্বয় যে সাইকেল ফেলে গিয়েছিলেন, তার পেছনের "কেরিয়ারে"-এ পাওয়া গেল একটি পুঁটুলি।

পুঁটুলির ভেতরে ছিল ছোরা, কাপড় ও সাবান।

আর সেই কাপড়ে পাওয়া গেল ধোপাবাড়ির চিহ্ন।

ব্যস্, সেই চিহ্নই কাল হল। হল পুলিসের অনুসন্ধানের হাতিয়ার। পুলিস এই চিহ্নের পেছনে এগিয়ে জানতে পারলো যে, এই কাপড়ের মালিক হলেন দ্বারভাঙ্গা মেডিকেল স্কুল হোস্টেলের একজন ছাত্র। নাম, বৈকুণ্ঠ সুকুল।

এই বৈকুণ্ঠ তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে ১৯৩২ সালের ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর দ্বারভাঙা মেডিকেল স্কুল হোস্টেলে ছিলেন।

বৈকুণ্ঠের নাম পুলিস আগে থাকতেই জানতো। তিনি হাজীপুর গান্ধী-আশ্রমের কর্মী। মজঃফরপুরের হিন্দুস্থান সেবা দলের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলে।

তিনিও ফণী ঘোষের ন্যায় বিপ্লবী হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের গুপ্ত-সভ্য ছিলেন।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৩২ সাল অর্থাৎ, রাজসাক্ষী ফণী ঘোষকে আক্রমণ করার সপ্তাহ তিনেক আগে বৈকুণ্ঠ তাঁর জামালপুরের বাড়িতে গিয়েছিলেন। জামালপুর হল মজঃফরপুর জেলার লালগঞ্জ থানার অধীন। কিন্তু কেবল সুকুলের খবর পেলেই চলবে না। পাওয়া চাই তাঁর সঙ্গীর খবরও।

তাঁর নাম-ধাম-ইতিবৃত্ত।

* * *

এবার পুলিস হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগলো বৈকুণ্ঠ সুকুল আর তাঁর সহচরকে। যেমন করে হোক তাঁদের ধরা চাই!

কিন্তু ১৯৩৩ সালের ৫ই জুলাই পর্যন্ত পুলিস তাঁদের কোন হদিসই পেল না।

এদিকে ১৯৩০ সালের ৬ই জুলাই তারিখে শোনপুরে জমেছে মস্ত মেলা। সেখানে হাতী আছে, ঘোড়া আছে, চিড়িয়া আছে—আরও কত কি! কেনা-কাটার সে এক দুর্লভ মরশুম। চারিদিকে দেখা যাচ্ছে উৎসব-মুখর জনতা আর উৎসাহী ক্রেতা। সাধু-সন্ন্যাসীরাও যথারীতি আছেন। এককথায় বলতে গেলে, এসেছেন রাজা-উজির সবাই। অজস্র ক্রেতা ও বিক্রেতার ভিড়ে মেলা একেবারে জম-জমাট।

এই মেলা দেখতে সেদিনের সেই প্রচণ্ড ভিড়ে ফেরারী আসামী বৈকুণ্ঠও এসেছেন ছদ্মবেশ ধারণ করে।

সঙ্গে বলিষ্ঠদেহী বীর্যদীপ্ত যুবক চন্দ্রমা সিং। এই সেই পুলিসের কাছে হারিয়ে-যাওয়া আর একটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। বৈকুণ্ঠের ছায়াসঙ্গী। রাজসাক্ষী ফণী ঘোষ ও তার বন্ধু গণেশপ্রসাদ গুপ্ত-হত্যার সার্থক সহকারী।

এই চন্দ্রমা সিং এর পিতার নাম ছিল রামদত্ত সিং। একদা তিনি ছিলেন পুলিস ইন্‌সপেক্টর। তারপর ১৯২১ সালের

অসহযোগ আন্দোলনের স্রোতে ভেসে পড়লেন স্বদেশ উদ্ধারের ব্রতে, পাকা লোভনীয় চাকুরীর মায়া কাটিয়ে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রায় সারা বছরগুলিতে তাঁকে দেখা যেত জেলখানায় লেঙট পরে ডন-বৈঠক করে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে দিন কাটাতে।

ক্রান্তিকারী কয়েদীদের কাছে তিনি ছিলেন বন্ধু, আত্মীয় ও বল-ভরসা স্বরূপ। এক মস্ত আশ্রয়স্থল। চন্দ্রমা সিং-এর বিপত্নীক পরিণতবয়স্ক পিতা তাই জেলের স্বদেশী-ওয়ালা কয়েদীদের কাছে হয়ে উঠলেন,—"রামদৎভাই।"

আর জেলখানার কর্তৃপক্ষের কাছে হলেন ত্রাসের প্রতীক।

চন্দ্রমা তাঁর একমাত্র মাতৃহীন ছেলে।

পিতা যখন চরকা কাটছেন, পুত্র তখন রিভলবার ছোঁড়া শিখছেন।

তাই তিনি জেলখানায় সাথীদের বলতেন ঃ

"দেখো, হম গান্ধীজীকা কাম কর রহা হুঁ—অওর চন্দ্রমা ক্রান্তিকা কাম কর রহা হ্যাঁয়। আরে, জিস্ তরহসে হো দেশকো আজাদ করনা হ্যাঁয়। উনকা কাম কে লিয়ে মেরা কোঈ আফশোস নহী হ্যাঁয়; মগর ওহ্ ফাঁসি পড় যায়েগা তো হামারা খান্দান হী চৌপট হো যায়েগা।"

(দেখো, আমি গান্ধীজীকে অনুসরণ করছি আর চন্দ্রমা বিপ্লবের পথে চলেছে।

তা যাই বল না কেন, যে—যেভাবেই দেশের কাজ করা ভালো মনে করে, করুক না! ওতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দুঃখ এই যে, ওর যদি আজ ফাঁসি হয়, তবে আমার বংশে বাতি দিতে কেউ আর থাকবে না।)

* * *

পুলিস গোপনে খবর পেয়ে তাঁদের পায়ে পায়ে ঘুরছে। একথা যখন ওঁরা বুঝতে পারলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তাঁই মেলা ছেড়ে গণ্ডক সেতু অতিক্রমকালে অতর্কিতে দু'দিক থেকে পুলিস নেকড়ে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো ফেরারী বৈকুণ্ঠ সুকুল আর বিপ্লবী চন্দ্রমা সিং-এর ওপর একই সঙ্গে। সুকুলের বুক-পকেটে তখনও তাজা বোমা রয়েছে। ধস্তাধস্তিতে যা ফেটে গিয়ে মৃত্যু ঘটাতে পারে।

তবু পালাবার জন্য উভয়েই আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু পুলিসের ক্ষিপ্রতা আর সংখ্যাধিক্যের কাছে ওঁরা হার মানতে বাধ্য হলেন। আহত বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্রমাকে পুলিশ দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে উপস্থিত হল স্থানীয় পুলিস-চৌকিতে।

* * *

পুলিসের আস্তানায় পৌঁছে বৈকুণ্ঠ নিজের শারীরিক ছোট-খাটো ব্যথা ভুলে গিয়ে এক অদ্ভুত প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশ ভুলে মুক্তকণ্ঠে বলে উঠলেন: "ভগৎ সিং কি, জয়!" বলাবাহুল্য যে, সহচর চন্দ্রমা সিং সেই সঙ্গে যুক্ত করলেন তাঁর আপন সবল ও সতেজ কণ্ঠস্বর।

দূর গাঁয়ের মানুষ হঠাৎ "ভগৎ সিং কি, জয়" ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে ভাবতে লাগলো: "ক্যা? ডাকু হ্যাঁয়? এত্‌না চিল্লাতে কিঁউ?"

(এত চেঁচাচ্ছে কেন? কি ব্যাপার? ডাকাত পড়লো নাকি?)

* * *

অবিলম্বে বৈকুণ্ঠ সুকুলকে স্থানান্তরিত করা হল ছাপরা কারাগারে। তিনি ও তাঁর সঙ্গী পুলিসের চোখে হয়ে দাঁড়ালেন সাংঘাতিক অপরাধে অপরাধী আসামী।

তাই, তাঁদের বিচার সাধারণ বিচারাশালায় হওয়া বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হল।

ফলে, বিহার-উড়িষ্যা গেজেটের ২৩শে নভেম্বর তারিখের বিশেষ সংখ্যায় একথা প্রচারিত হল যে, বৈকুণ্ঠ সুকুল ও তাঁর সঙ্গীর বিচার সম্পাদিত হবে মতিহারী কারাগারে।

১৯৩৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর দায়রা আদালতে সুরু হল বিচারের নামে অবিচারের ঐতিহাসিক প্রহসন।

১৯৩৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁকে দেওয়া হল পেনাল কোডের চরম দণ্ড,—ফাঁসি!

অপরাধ?

অপরাধ, তিনি ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীদের মৃত্যুর প্রতিশোধ স্বরূপ মহামান্য ইংরেজ-সরকারের আশ্রিত রাজসাক্ষী ফণী ঘোষকে হত্যা করেছেন।

সহকারী চন্দ্রমা সিং-এর হল বার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

রায়ের বিরুদ্ধে পাটনা হাইকোর্টে আবেদন করা হল। সেদিন ১৯৩৪ সালের ৬ই মার্চ।

একথা বলাই বাহুল্য যে, যথারীতি সেই "আপিল" ১৯৩৪ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে অগ্রাহ্য হল।

এর আগে এই বৈকুণ্ঠ সুকুলের সঙ্গে ১৯৩০ সালে পুরুলিয়ার অন্যতম দেশসেবক শ্রীবিভূতি দাশগুপ্তের দেখা হয়েছিল একবার।

স্থান: পাটনা ক্যাম্প-জেল।

উপলক্ষ্য: আইন-অমান্য আন্দোলন।

ঐ ক্যাম্প-জেলের ভেতর অবসর সময়ে বিভূতিবাবু একদিন কয়েকজন তরুণ বন্ধুদের কাছে রবীন্দ্রনাথের "মরণ-মিলন" কবিতা সুর করে, ছন্দ মিলিয়ে, প্রাণস্পর্শী ভঙ্গীতে পড়ছিলেন।

"আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ,
সেই মহা বরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।"

এই কবিতা-পাঠের সময় শ্রোতাদের মাঝখান থেকে কে যেন কুণ্ঠিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন "আমাকে এটা হিন্দী হরফে লিখে দেবেন!"

বিভূতিবাবু প্রশ্নকর্তার দিকে তাকিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করে জানতে পারলেন, ছেলেটির নাম বৈকুণ্ঠ সুকুল। বাড়ি মজঃফরপুর।

বিভূতিবাবু সেদিন তাঁকে শুধু কবিতার ছোট্ট পংক্তিটি লিখেই বিদায় দেননি, উপরন্তু দিয়েছিলেন তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার মূল বর্ণনার আসল অভিব্যক্তি। তার অন্তর্নিহিত ভাবার্থ। যেখানে কবি জানিয়ে দিয়েছেন মৃত্যুকে অতিক্রম করার নিগূঢ় সংকেত।

* * *

এরপর কেটে গেছে ১৯৩০ সাল। এগিয়ে এসেছে ১৯৩১ সালের মার্চ মাস।

আর ঐ সময় কংগ্রেস পক্ষের মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও সরকার পক্ষের রাজ-প্রতিনিধি আরউইন-এর সঙ্গে এক বোঝাপড়ার ফলে নিরস্ত্র আইন-অমান্যকারীদের সঙ্গে বিভূতি দাশগুপ্ত মুক্তি পেলেন।

* * *

কংগ্রেস ও সরকার-এর সঙ্গে চুক্তি কিন্তু বেশি দিন বজায় রইলো না। সুতরাং আবার সুরু হল আন্দোলন। বিভূতি দাশগুপ্ত পুনরায় আইন অমান্য করে কারারুদ্ধ হলেন।

তারপর নানা জেল ঘুরে ঘুরে উপস্থিত হলেন গয়া জেলে। এবার স্থান হল—পনের ডিগ্রীর দশ নম্বর সেলে।*

তাঁর পাশের সেল দুটিতে রয়েছেন রঘুনাথ পাণ্ডে ও ত্রিভুবন আজাদ।

সেদিন ১৯৩২ সাল।

*আলো-বাতাসহীন অতি ক্ষুদ্র কক্ষ। যেখানে কোন জানালা থাকে না। থাকে শুধু একটিমাত্র লোহার দরজা। আর অনেক ওপরে থাকে কয়েক ইঞ্চির ভেন্টিলেটার বা ঘুলঘুলি।

*　　　*　　　*

ইতিমধ্যে কেটে গেল আরো দুটি বছর। এগিয়ে এলো ১৯৩৪ সাল।

আর এই ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী ফণী ঘোষ-হত্যা মামলার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত পূর্ববর্ণিত বিপ্লবী বৈকুণ্ঠ সুকুলকে আনা হল গয়া কেন্দ্রীয় কারাগারে। তাঁর প্রতি যে চরম দণ্ড দেওয়া হয়েছে—সেই মৃত্যুদণ্ডকে কার্যকরী করতে।

স্থান হল সাত ডিগ্রীর কনডেম্‌ণ্ড সেলে। মুহূর্তে এই সংবাদ কর্ণগোচর হল বিভূতিবাবুর। পূর্ব-পরিচয়ের সূত্রে মিলন আশায় দুজনেই উদ্‌গ্রীব ও উৎকণ্ঠিত হলেন। কিন্তু উপায় কী! যোগাযোগের পথ কোথায়? সবাই যে পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠুরীতে লোহার গারদের ভেতরের চারপাশে সশস্ত্র সান্ত্রীর কড়া পাহারায় আটক! সুতরাং মিলন সম্ভাবনার আশা নিষ্ফল ও ধূলায় ধূসরিত হল।

*　　　*　　　*

দেখতে দেখতে সুকুলজীর ফাঁসির দিন এগিয়ে এলো। তাই সেই কারাগারের চলতি নিয়ম অনুযায়ী ফাঁসির আগের দিন—১৯৩৪ সালের ১৩ই মে সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁকে সাত ডিগ্রী থেকে নিয়ে আসা হল পনের ডিগ্রীর একনম্বর কুঠুরীতে। কারণ, এই সেল থেকেই ফাঁসির আসামীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে।

*　　　*　　　*

এবার শ্বাসরুদ্ধ করে পনের ডিগ্রীর দশনম্বর সেলের আটক বন্দী শ্রীবিভূতি দাশগুপ্তের কথায় শোনা যাক্ শেষের দিনটির সেই মর্মান্তিক পরিণতির এক অভাবনীয় স্মরণী। সেই অনুপম বর্ণনা, সেই অবিস্মরণীয় স্মৃতিচারণ—যা কাব্যকেও হার মানায়। যে লেখা লেখনীর মুখে কখনো-সখনো বের হয়। যে বক্তব্য ক্লাসিকের পর্যায়ে পড়ে :

তখনও সন্ধ্যা হয়নি। বিকেলটা সন্ধ্যার দিকে চলেছে। প্রচণ্ড শীত। কম্বল-কুর্তা গায়ে চড়িয়ে লোহার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। শিকল বেড়ির ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠ সুকুল পনের ডিগ্রীর করিডোরে ঢুকলেন। চিৎকার করে বললেন :

দাদা, আগিয়া!

আমরা তিনজনেই পাশাপাশি তিনটি সেল থেকে যুগপৎ উচ্চকণ্ঠে সংবর্ধনা ধ্বনি জানালাম: বন্দেমাতরম্‌!

অনেকগুলো ভারী বুটের শব্দে জেলার, ডেপুটি জেলার, বড় জমাদার, সেপাই-সান্ত্রী সবাই মিলে মহা-সমারোহে তাঁকে নিয়ে এসেছে এক সেল থেকে অপর আর এক সেলে।...

একনম্বর সেলে ঢোকবার সময় অন্যান্য ফাঁসির আসামীর শিকল-বেড়ি কেটে দেওয়া হত। জেল কোডে মৃত্যুযাত্রীর জন্যে এইটুকু মমতা দেখাবার বিধান আছে। কিন্তু সুকুলজীর বেলায় তার ব্যতিক্রম হল। এখানে মহাশক্তিমান ব্রিটিশরাজ মায়া-মমতা দেখাতে অনিচ্ছুক। সুকুলজীর পায়ের বেড়ি কাটা হল না। শৃঙ্খলিত সিংহ গহ্বরে ঢুকে গেলেন। ..জানি না, এই শিশুর চোখে কি ওরা বন্দী প্রমিথিয়ুয়সের চোখের আগুন দেখেছিল!......

* * *

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। বুঝলাম সন্ধ্যার গুন্‌তি মিলে গেছে। অন্ধকার ক্রমে ক্রমে আসছে। তাকিয়েছিলাম এন্টিসেলের মাথায় ঝুল্‌তে-থাকা একফালি আকাশের তারাগুলোর পানে।

দাঁড়িয়েই আছি গরাদ ধরে। কোনকিছু করার আছে বা ভাববার আছে বলে মনে হচ্ছে না। পাশের সেলে ত্রিভুবন, তার পাশে রঘুনাথ কেউ কোন কথা বলছেন না। তাঁরাও লৌহ-গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

বুটের শব্দে তাকালাম। বদলীর ওয়ার্ডার ঢুকেছে লণ্ঠন-হাতে সেলের তালা দেখতে। নীরবে চলে গেল।

মহামৌন বুঝি কথা কেড়ে নিয়েছেন সবার কণ্ঠ থেকে।

কিছুক্ষণ পর আমার এন্টিসেলে প্রবেশ করলো ডিউটি-রত হাবিলদার। আমার সঙ্গে প্রত্যহ তার সুখ-দুঃখের নানা গল্প হয়।

হাবিলদার যুক্তপ্রদেশের কোন এক পাঠান পরিবারের লোক। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিক। হাতের লণ্ঠনটি নামিয়ে রেখে কতগুলো সাদা ফুল আমাকে দিয়ে বললো: সুকুলজী পাঠিয়েছেন।...ফুলগুলি তুলে নিলাম গভীর বেদনায়। রেখে দিলাম লোহার তস্‌লাতে।

হাবিলদার শুধালো: কি ভাবছেন বাবুজী ?

—কি আর ভাবব ?

—সুকুলজীকে বাঁচানো যায় না ?

লাটের ওপরে লাট আছে। তারও ওপরে আছে বিলাতের বাদশা—বাঁচানো যায় না ?

আমি বিস্মিত হলাম। রুক্ষ, কঠিন, নির্দয় এই সৈনিক বলে কি ?

সে বলেই চললো: বাবুজি অনেক বীর দেখেছি, অনেক বাহাদুর দেখছি—এমনটি তো দেখিনি !

আমি গেল যুদ্ধে লড়েছি, মেসোপোটেমিয়ায় লড়েছি, মেরেছি অনেক, মরতে দেখেছি অনেক। সাহস, তেজ, বিক্রম ঝরে ঝরে পড়তে দেখেছি—কিন্তু এমন বাহাদুর কখনো তো দেখিনি ! কখনো তো ভাবতেই পারিনি জোয়ানের এমন রূপ !

এবার সে চুপ করেছে। বুঝলাম, প্রকাশের আবেগে রুদ্ধ হয়ে এসেছে তার কণ্ঠ। মনের বেদনা সে কাউকে বলতে পারে না। বললে সেটা হবে রাজদ্রোহিতা। কাজেই, আমার কাছেই বুকের ব্যথা উজাড় করে দিতে হবে তাকে। বললো:

যেদিন সুকুলজীর ফাঁসির হুকুম পাকা হয়ে গেল, সেদিন থেকে তাঁর শরীর যেন গোলাপের মতো রঙিন হয়ে উঠছে।

(—গুলাব জ্যায়সা—গুল জ্যায়সা খিল রহা থা।

অর্থাৎ, গোলাপ কুঁড়ি যেন; ফুলের মতো ক্রমশ বিকশিত হয়ে

উঠেছে।) বাবুজী, সেই মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে থাকতাম। এমন হাসি, এমন আনন্দ, আমি দেখিনি। এমন সাহস মানুষের হতে পারে, তা জানতাম না। কখনও ভাবতে পারিনি। কখনও শুনিনি।

(ম্যঁয় কভী শোচ ভী নহী সকতা থা, এ্যায়সা কমসীন লড়কা, এ্যায়সা বাহাদুর হো সকতা হ্যাঁয়!)

আমি অবাক হয়ে সেই আলোছায়ার মধ্যে দেখলাম, সেই পাঠান হাবিলদারের দু' চোখ বেয়ে ঝরণার মতো অশ্রুধারা নেমে আসছে। ঐ কঠিন বুকের অন্তরালে যে অন্তঃসলিলা প্রস্রবণ ছিল, আজ কোন্ বেদনার স্পর্শে তা মুক্ত হয়ে পাষাণকে সিঞ্চিত করলো?

বললো:

বাবুজী, বঁচানেকো কোঈ তরিকা, কোই সিবিল নহী?

(বাবুজী, ওকে বাঁচাবার কী কোন বুদ্ধি, কোন রাস্তা নেই?)

যদি আমার জান দিয়েও সুকুলজীকে বাঁচাতে পারতাম, তবে মনে করতাম—সত্যিই আমি খোদার কাজ করেছি!

* * p

ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে হাবিলদার চলে গেছে। তার বুটের শব্দ মেলাতে না মেলাতেই একনম্বর সেল থেকে ডাক এলো:

—বিভূতিদা!

সাড়া দিলাম। লোহার গরাদ দু'হাতে ধরে দাঁড়িয়ে সাড়া দিলাম।

বৈকুণ্ঠ আছেন একনম্বরে। আমি দশ নম্বরে। নিঝুম, নিস্তব্ধ রজনী। কাজেই, কথা শুনতে অসুবিধে নেই।

সুকুলজী ভাঙা বাঙলায় বললেন:

—একবার সেই ক্ষুদিরামের ফাঁসির গানটা গান না দাদা! —সেই 'হাসি হাসি পরব ফাঁসি'।

আমি সে-যুগে গান গাইতাম। বেশ জোরালকণ্ঠে স্বদেশী গান গাইতাম।

মজফঃরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ভাঙা সেলে বসে, জেলের ফাঁসি-মঞ্চে বসে,—'হাসি হাসি পরব ফাঁসি' গানটি গেয়েছি।

এ গানে কী যে মধু আছে জানি না। জেলে, জেলের বাইরে যখনই এ গান গেয়েছি, গান শেষ না হতে কেউ চলে যেতে পারত না।

স্বদেশী গানের ভাণ্ডার আমার কাছে ছিল বাঙলা, হিন্দি, উর্দু বহু গানের—কিন্তু জেলখানায় দেখেছি, 'হাসি হাসি পরব ফাঁসি'র মতো জনপ্রিয় গান আর একটিও ছিল না। ক্যাম্প-জেলেও আমি গাইতাম, আমাদের নাম-পাড়ার "খ্যাপা" ও গাইত।

বিহারী রাজবন্দীরা জাঙ্গিয়া-কুর্তা পরে বসে যেত, লোহার থালা-বাটি বাজিয়ে মাথা নেড়ে তাল দিত, শেষ হলে আবার গাইতে বলত।

হোক না অখ্যাত কোন কবির রচিত গান, তবু ক্ষুদিরামের ফাঁসির এ গানটিতে এমনি যাত্ব ছিল!

হৃদয় দিয়ে গড়া এ গান রসের ভিয়ানে ডুবিয়ে তিনি পরিবেশন করে গিয়েছেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুরু করেছি গান। গরাদ ধরে আকাশের পানে তাকিয়ে গান গাইছি আমার মন ও প্রাণ দিয়ে।

পূর্বগামী ক্ষুদিরামের গান,—'হাসি হাসি পরব ফাঁসি, মা দেখবে ভারতবাসী'—

শুনতে চাইছেন অনুগামী নবীন ক্ষুদিরাম, কয়েক ঘণ্টা পরেই যাঁর কণ্ঠে ঘাতক এসে পরাবে ফাঁসির রজ্জু।

বহুক্ষণ ধরে গাইলাম সে গান।

স্তব্ধ হয়ে শুনছেন একনম্বর সেলের সংগ্রামী বন্দীরা। সমগ্র জেলের সকল কয়েদী।

কারো চোখে সে রাতে ঘুম ছিল না।

'ঘুম ছিল না সিপাই-সান্ত্রী-মেট পাহারাদার অফিসার কারো চোখেই।'

একটা বোবা আর্তনাদ অসহায় আবর্তে সবার বুকে ঝড় তুলেছিল। সে ঝড় নির্বাক।

চোখের আগুন অশ্রু হয়ে ফুটে উঠেছিল কয়েদীর নয়নে। অন্ধকারের স্তরে স্তরে চোখের জলের ভাষা। সে ভাষার উত্তাপ অতি গভীরে লুক্কায়িত।

গান শেষ হল।

সুকুলজী বললেন:

দাদা, এবার বাঁশি শুনবো!

বাঁশি? বাঁশি কোথায় পাবো জেলখানায়?

একটা খালি দেশলাইয়ের খোল আর একটুকরো পাত্‌লা কাগজ হচ্ছে আমার "ইমপ্রোভাইভাইজড্" বাঁশি। এটাই বাজাতাম ফ্লুট-এর মতো করে। সুকুলজী তা জানতেন।

বাজনা অনেকক্ষণ শুনলেন সুকুলজী। বললেন:

সুরটা ভারি কোমল।

আমি বললাম: এটা বিস্‌মিলের "সর ফরোশি কী তমন্নার" সুর।

সুকুলজী যেন লাফিয়ে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন:

গানটায় সব পদ মনে আছে?

উত্তর দিলাম: গাইছি।

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার রামপ্রসাদ বিস্‌মিল ফাঁসি-মঞ্চে আরোহণ করার আগে এই গানটি রচনা করেছিলেন। গানটি খাঁটি উর্দুতে হলেও জেলের কয়েদীরা সেই গান তেমনিই অন্তর দিয়ে শুনতো, যেমন আন্তরিকতায় শুনতো তারা বাঙলায় রচিত গান:

"বিদায় দে মা ঘুরে আসি।"

এযে মহান প্রাণোৎসর্গের সামগান! এ কোন ভাষার অপেক্ষা রাখে না। যে কোন হৃদয়েই এর কাঁপন লাগে। আমার কণ্ঠ

জুড়ে বিস্‌মিলের গান। গরাদ ধরে স্তব্ধ নিশীথিনীর আকাশ পানে তাকিয়ে থেকে গেয়ে চলেছি :

"সর ফরোশী কি তমন্না
অব হমারে দিল মেঁ হ্যাঁয়।
দেখ্‌না হ্যাঁয়—জোর কিত্‌না বাজু এ
কাতিল মেঁ হ্যাঁয়।"*

(Now our earnest desire is to be headed, let us test how much might the hand of the executioner posses.

আমরা এখন গভীর আগ্রহে মৃত্যুকে বরণ করতে চাইছি। যাবার আগে দেখে যেতে চাই যে, ঘাতকের বাহুতে কত শক্তি আছে!) (ভাবানুবাদ ॥ শ্রীলোকেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত।)

(মৃত্যুকে স্পর্শ করার ভাবনা এখন আমার মনে। দেখতে চাই, ঘাতকের বাহুতে কত বল আছে!) (অনুবাদে ॥ প্রবন্ধ-লেখক শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত।)

গোটা গান ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারে বারে গেয়ে যাচ্ছি। আমার সুমুখের আকাশে তারাদের মেলা বিলীন হয়ে গেছে। আমি শুধু দেখছি উত্তরপ্রদেশের এক কারাকক্ষে বিস্‌মিলের দুটি উজ্জ্বল চোখ আর বিহারের অপর এক কারাকক্ষের একনম্বর সেলে সুকুলজীর একখানি সতেজ সুন্দর মুখ।

আমার সঙ্গে সমানভাবে গলা খুলে প্রাণ ঢেলে সুকুলজীও গেয়ে চলেছেন। আমি গাইছি গানের শেষ দুটি পংক্তি :

"অব্ না আগলে বলবলে হ্যাঁয় আউর
ন আরমানে কী ভীড়।
সিরফ্‌ মর্‌ মিটনে কি হসরৎ আপ্
দিলে এ বিস্‌মিল মেঁ হ্যাঁয়॥'

* এ গানটি মোঃ হজরৎ মোহনীর রচিত বলে ভূতপূর্ব কাকোরী-বন্দী ৺যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "ইন সার্চ অব ফ্রীডম"-এ উল্লেখ করেছেন। ইংরেজী তর্জমা তাঁরই।

(এবার থেমে গেছে সব কলরব। মিটে গেছে সব কামনা বিস্‌মিলের মন এখন চাইছে শুধু মৃত্যুকে বরণ করতে।)

কিন্তু সুকুলজী শেষের পংক্তির শেষটুকু নিয়ে উদ্বেল আবেগে বারে বারে গাইছেন ঃ

"দিলে এ সুকুল মেঁ হ্যায়", "দিলে এ সুকুল মেঁ হ্যায়", "দিলে এ সুকুল মেঁ হ্যায়"! অর্থাৎ, সুকুলের মন চাইছে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। বাহুপাশে বাঁধতে।

সেই আবেগধারার অর্ঘ্য নিবেদন সমুদ্রকে নদীর সবটুকু ঢেলে দেবার মতোই অন্তহীন ও অকুণ্ঠ।

আমার সম্বল সীমিত। তবু যত গান ছিল, যত সুর ছিল, সব গেয়ে চলেছি অবিরাম।

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মৃত্যু-যাত্রী শুনতে চাইছেন গান! আমি নীরব থাকি কি করে?

আমার সকল হিঁয়া, সকল রক্ত-কণিকা গান হয়ে ঝরে ঝরে পড়তে চায়। এই ভীষণ সুন্দর নিশীথিনীর প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে যে গান দিয়ে, সুর দিয়ে ভরে রাখতে হবে!

ঐ গান-বিছানো, ঐ সুর-বিছানো পথে যাত্রা করবেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। জ্যোতির্ময় ঐ কিশোরের অপরূপ রূপ রাত্রি শেষে উষা সমাগমে মিলিয়ে যাবে হায় উর্ধ্বতম লোকে! সকল গানের পারাবারে!

ডিউটি বদল হল পাহারাদারদের। জমাদার আমার সেলের তালা নেড়ে চলে গেল না। কাছে এসে বললো ঃ

বাবুজী লোহার গরাদ ধরে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন সারারাত। দাঁড়িয়ে আছেন সুকুলজী। দাঁড়িয়ে আছেন পাশের সেলের পাণ্ডেজী, ত্রিভুবনজী। আপনাদের কথা বুঝি। আপনারা তো একই পথের যাত্রী!

কিন্তু সারা জেলে অন্য কারো চোখেও যে আজ ঘুম নেই! সবাই বসে, শুয়ে বা দাঁড়িয়ে আপনাদের গান শুনছে। (ক্যাঁ আপ

রাতভর গাতে রহেঙ্গে?) কী ব্যাপার, আপনি কি সারারাত ধরে গেয়ে চলবেন?

জবাব দেবার কিছু নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, ক'টা বেজেছে?

বললো: এক বজ্ গ্যয়া।

ওয়ার্ডার চলে গেল। কঠিন বুটের শব্দ রোজের মতো হল না। আজ অতি সন্তর্পণে তাদের চলাফেরা। এ ঘোর রজনীর স্তব্ধতা বিঘ্নিত করার দম্ভ নেই তাদেরও।

এবার কি গাইব ভাবছিলাম। সেই মুহূর্তে সুকুলজীর আহ্বান এলো।

বলছেন: দাদা, সেই গান গাইতে হবে!

—কোন্ গান?

—ওহি, যো রবীন্দ্রনাথ কা, মরণ, হে মোর মরণ—

বললাম: ওটা তো গান নয়, কবিতা!

—নঁহী নঁহী—গাইয়ে—

'মরণ-মিলন' সবটাই আমার কণ্ঠস্থ। কিন্তু সেই বস্তু যে সুকুলজীর রক্ত-কণিকার সুগভীরে প্রবাহিত হয়ে আছে তা এবার বুঝলাম। তবু ভাবছি, একে সুর দিয়ে গাই কি করে?

কিং সুর দিয়ে, কেমন করে গাই?

একনম্বর সেল থেকে তাগিদ এলো: দাদা, গাইয়ে!

আর তো ভাবা যায় না। কিশোর-বন্ধুর বিদায়-লগ্ন দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। আর ভাবতে হল না।

কোথা থেকে, কেমন করে আমার কণ্ঠে সুর এলো জানি না। কে যেন পাত্র ভরে দিয়ে গেল।

আমি দরবারী কানাড়াতে ধরলাম:

"অত চুপিচুপি কেন কথা কও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ?"

মানুষ নিজেকে কেমন করে হারায় আমি জানি না। কিন্তু আমার কাছে সেই রাত্রি আর শুধুমাত্র রাত্রি হয়ে রইলো না; অন্তহীন সমুদ্র হয়ে আমাকে অদৃশ্য গানের লোকে ভাসিয়ে নিয়ে চললো। আকাশের দিকে চেয়ে-থাকা আমার চোখ দুটি বুজে এলো। আমি গেয়ে চললাম:

"আমি যাব যেথা তব তরী বয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি আঁধারের অনুসরণ।"

যে গান আমি সেদিন গেয়েছিলাম, সে গান কেউ কোনদিন গায়নি। এমন করে গান কেউ কোনকালে গেয়েছে কিনা জানি না। কখনো গাইবে কিনা তাও জানি না। আমিও কোনদিন গাইনি। আর কোনদিন গাইতে পারবো না, তাও জানি।

দরকারী কানাড়ায় এর অন্তরা চলছে। আকাশ অতিক্রম করে এর পরশ নামছে মৃত্যুর অভিসারের অন্তর স্পর্শ করে।

কেউ কি শুনেছে এ গান এমন করে?

মরণকে আলিঙ্গন করতে করতে তন্ময়তায় শুনছেন এবং সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইছেন দুর্জয় সেই কিশোর:

"তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌পাত
আমি নিজে লব তব শরণ,
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥"

রবীন্দ্রনাথের কোন গান, কোন কবিতা এমন অপূর্ব সার্থকতায় কখনো ভরে উঠেছে কিনা জানি না। আমি কিন্তু সারা জীবনে ঐ একটি রাতেই যথার্থ গেয়েছিলাম। কারণ, ঐ একটি হৃদয়ই পরমতম লগ্নে সেই গান শুনতে চেয়েছিল। শুধু শোনা নয়, সেই হৃদয় দিয়েই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর আমার সঙ্গে সেই গান গেয়ে আমায় ধন্য করেছিলেন।

কখন চারটে বেজে গেছে জানি না। সুকুলজী বললেন :

দাদা, ওয়ক্ত্ নজদীক্ আ গ্যয়া, আখরী গানা "বন্দেমাতরম্" শুনাইয়ে।

(দাদা সময় এবার নিকটবর্তী হয়েছে। এবার শেষসঙ্গীত হোক 'বন্দেমাতরম্'!)

একনম্বর, আট নম্বর, নয় নম্বর, সুকুলজী ও আমরা তিনজনে সমস্বরে গেয়ে চললাম, "বন্দেমাতরম্"।

সেই বন্দনা শুধু মাতৃবন্দনাই ছিল না, তা ছিল মাতৃরূপা মহামৃত্যু-পূজার মঙ্গলাচরণ।

জেল-গেটের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বেজে গেল। শীতের ভোর ৫টা। তখনো কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকার।

একসঙ্গে অনেকগুলি ভারী বুটের শব্দ পনের ডিগ্রির মধ্যে প্রবেশ করলো।

সুকুলজী ডেকে বললেন :

দাদা, অবতো চল্না হ্যাঁয়। এক বাৎ মুঝে কহনা হ্যাঁয়।

(দাদা এখন তো যাবার সময় হয়ে গেল। আমার একটি অনুরোধ রইলো।)

(শহীদ বৈকুণ্ঠ সুকুলের অন্তিম ইচ্ছা ছিল, বিহারে প্রচলিত বাল্য-বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ-সাধন। কারণ, তাঁকে সামাজিক ও পারিবারিক কারণে খুব ছোট বয়সে বিয়ে করতে হয়েছিল। নিজের আসন্ন মৃত্যুর পর হতভাগিনী অসহায়া নিতান্ত বালিকা-বধূর নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক অকাল বৈধব্য-যন্ত্রণার কথা চিন্তা করে সুকুলজী শেষের দিনে খুবই বিব্রত বোধ করেছিলেন আপন মনে। তাই অন্তিম অনুরোধ করেছিলেন শ্রদ্ধেয় বন্দী শ্রীবিভূতি দাশগুপ্তকে) :

দাদা, একটি অনুরোধ রেখে গেলাম। আপনি বাইরে গিয়ে এবার বিহারের বাল্য-বিবাহ প্রথটা তুলে দেবার চেষ্টা করবেন।

এবার সব নিস্তব্ধ-নিশ্চ প।

সুকুলজীর সেলের তালা খুলে গেল শব্দ পেলাম।

তাঁর পায়ের শিকল-বেড়ি কাটার আওয়াজ হল।

কানে এল সুকুলজী বলছেন : আমি তৈয়ার আছি। দলবল সেল থেকে বেরুচ্ছে, তার শব্দও পাচ্ছি।

* * *

একনম্বর সেল থেকে বেরিয়ে সুকুলজী বোধহয় একটু দাঁড়ালেন। আমাদের সেলের দিকে তাকিয়ে বলতে শুনলাম :

দাদা, তবে চলি! আবার আমি আসবো। দেশ তো এখনও আজাদ হয়নি। আবার আসবো। বন্দেমাতরম্!

আমরা তিনজনে সমস্বরে ধ্বনি তুললাম : বন্দেমাতরম্!

সারা জেলে ধ্বনি উঠে গেল : বন্দেমাতরম্!

তারপর নিশ্চুপ পৃথিবী।

মৃত্যুর অভিসারের নিস্তব্ধতা। শুধু সুকুলজীর কণ্ঠে তখনো শুনছি :

বন্দেমাতরম্, ভারত মাতা কি জয়!

মুক্তির অগ্রদূত রক্ত-রঞ্জিত কঠিন পথের ক্ষত-বিক্ষত একক যাত্রী, তাঁর কণ্ঠধ্বনি মন্ত্রের মতো করে সকলে সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে শুধু শুনছে। তাঁকে নিজেদের কণ্ঠস্বরে আবৃত করার মন আর কারো নেই।

ওদিকে আই. জি. এ্যাংলো-মাদ্রাজী জেল-সুপার মিঃ প্যারেরা (আই. এম. এস.), জেলার, সান্ত্রী, হাকিম সকলে পায়ে পায়ে হাজির হল ফাঁসির মঞ্চের কাছে। একে একে তাদের অতিক্রম করে সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত বৈকুণ্ঠ সুকুল ভয়-লেশহীন চিত্তে উঠে দাঁড়ালেন ফাঁসি-মঞ্চে। সুকুলের গলায় ফাঁসির দড়ি পড়াবার আগে নিজের ফাঁসির বিভীষিকা নিজের চোখে নিজেকে যাতে দেখতে না হয়, তার জন্য নিয়ম-মাফিক একজন মুখ ঢাকবার জন্যে এগিয়ে দিল একটি কালো মুখোস। কিন্তু সবাইকে হতবিহ্বল

করে সুকুলজী জানালেন যে, এসবের তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি হাসিমুখেই ফাঁসিকে বরণ করে নিতে পারবেন। আশ্চর্য! তখন তিনি সত্যি সত্যিই হাসছিলেন।

স্তম্ভিত জেল-সুপার মিঃ প্যারেরার কি জানি কি হল ; জেল-প্রথা রক্ষার জন্য মুখোস পড়ার জন্য সুকুলজীকে আর পীড়াপীড়ি করলেন না। শুধু আস্তে বললেন : মৎ দো। অর্থাৎ, দিও না।

এবার সাহেব তাঁর চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন সব ঠিক আছে কিনা। আর সেই মুহূর্তে ডানহাতের রুমাল নেড়ে নিষ্করুণ জহ্লাদকে করলেন সেই ভয়াবহ ইঙ্গিত, যার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে ফাঁসির আসামীর চোখের সামনে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ-যবনিকা। যে ইঙ্গিতের পর চুকিয়ে যেতে হয় জীবনের সব কিছু দেনা-পাওনা। লাভ-ক্ষতির হিসেব-নিকেশ।

ঠিক এই সময় ঘটল অঘটন। যেমন অদৃষ্টপূর্ব, তেমনি অপ্রত্যাশিত ও কল্পনাতীত। যা কিংবদন্তীকে হার মানায়, যা নাটকের চাইতেও নাটকীয়।

অর্থাৎ, যে জহ্লাদ "লিভার" টেনে ফাঁসির ম্যানিলা রোপ আসামীর গলায় পড়িয়ে দেয়, যে জহ্লাদ নিষ্ঠুর পিশাচ আর শয়তানের সাক্ষাৎ অনুচর বলে লোক-সমাজে চিহ্নিত ও ঘৃণিত, সেই পাষাণ জহ্লাদ কিনা তার কর্তব্য ভুলে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো অনিন্দ্য-সুন্দর বিপ্লবী তরুণ বৈকুণ্ঠ সুকুলের ফুলের মতো হাসি-ভরা মুখের দিকে! এর চাইতে নাটকীয় সত্য ঘটনা আর কী হতে পারে জানিনে। কিন্তু সেই প্রায় অনৈতিহাসিক জটিল পরিস্থিতিতে উপস্থিত সকল রাজপুরুষবৃন্দ যখন বিস্ময়ে হতবাক্, বিমূঢ়, বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত, তখন মরণ-বিজয়ী বিপ্লবী কুল-তিলক বৈকুণ্ঠ সুকুল শেষবারের মতো আবার সকলকে অবাক করে দিয়ে, গভীরভাবে বিচলিত জহ্লাদকে লক্ষ্য করে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন :

দের কিঁউ করতে হো? (অর্থাৎ, দেরি করছ কেন?)

সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন ভঙ্গ হল মায়া-মুগ্ধ জহ্লাদের। বিস্ময়ের ঘোর কাটলো এন্ডু সকলের। আর সেই মুহূর্তে তৎপর হয়ে উঠলো জহ্লাদ। যার নিষ্ঠুর পরিণামে সুকুলের কণ্ঠের "ভারতমাতা কি জয়" ধ্বনি মাঝপথে হারিয়ে গেল।*

ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সেদিন ছিল ১৯৩৪ সালের ১৪ই মে।

সুকুলজীর অর্ধসমাপ্ত "ভারত মাতা কি জয়" ধ্বনির সঙ্গে আমাদের তিনজনের ধ্বনি আরম্ভ হল।

সুকুলজীর মৃতদেহ বাইরে নিয়ে যাবার আগে নম্বর খুলবে না।

রুদ্ধকক্ষে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরা ধ্বনি দিয়ে চলেছি: "বন্দেমাতরম্, ভারত মাতা কি জয়, সুকুলজী কি জয়, ভগৎ সিং কি জয়, ক্ষুদিরাম কি জয়!"

ফাঁসি হয়েছে বলে যত লোকের নাম মনে পড়েছে, আমরা তিনজনে তাঁদের জয় দিয়ে যাচ্ছি।

হঠাৎ শুনলাম বহু বুটের ক্রুদ্ধ আওয়াজ। জেলের আই. জি. দলবলসহ পনের নম্বরে ঢুকে চিৎকার করতে করতে আসছে:

চোপ রহো, চোপ রহো!

প্রথম আট নম্বরে, ন' নম্বরে, দশ নম্বরে তারপর আমার সেলে এলো। কম্বল-কুর্তা ও জাঙ্গিয়া পরে সারারাত জেগে ক্ষোভে, শোকে ও উত্তেজনায় আমরা মরিয়া হয়ে উঠলাম।

আমাদের গরাদ ধরে দাঁড়ানো, আমাদের সেই চেহারা ও অবিশ্রান্ত ধ্বনি শুনে আই. জি. বোধহয় খেপে গিয়েছিলেন।

---

* শিখা, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮, "বিপ্লবের কিছু কাহিনী", ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়।

প্রবন্ধটির প্রথম প্রকাশ, কম্পাস, ১৯৪৮, শারদীয়া সংখ্যায়। প্রবন্ধটির মূল লেখক শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত হলেন প্রাক্তন সংসদ সদস্য ও প: ব: যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী। নিবাস, পুরুলিয়া।

চিৎকার করে যতই বলছে "সাট আপ," আমরা ততই ধ্বনি দিয়ে যাচ্ছি।

রঘুনাথ পাণ্ডে চেঁচিয়ে বলেছিলেন : আরে জহ্লাদ, ঠহর যাও! তুমকো ভী ফাঁসি পর চঢ়ায়েগা।

আই. জি. চিৎকার করে বলেছিলেন : তুম লোগোকো বেত লাগায়েগা—

(You will be flogged)

ত্রিভুবন আরও বেশি চিৎকার করে বললেন :

মেরা সাথীকো তো ফাঁসি পর চঢ়ায়া, লে আও তুমহারা কয়ঠো টিকটিকি হ্যঁায়! লে আও, লে আও—আংরেজ মুর্দাবাদ, শুকুলজী কি জয়—বন্দেমাতরম্!

গাল দিতে দিতে আই. জি. দলবলসহ বলতে বলতে চলে গেল :

বেত লাগায়েগা, বেত লাগায়েগা।

নম্বর খুলে দিয়েছে। আমরা তিনজন* মিলে একনম্বর সেলের দিকে যাচ্ছিলাম। বড় জমাদার ঢুকলো, বললো :

পাণ্ডেজী, ত্রিভুবনজী চলিয়ে!

অমনি বললাম : কিঁউ, টিকটিকি তৈয়ার হ্যঁায়? দো আদমী কিঁউ—হমকো কাহে নহী বতায়া?

জমাদার বললো : ওহ্ বাৎ নহী, হুক্‌ম হুঁয়া দুসরা ওয়ার্ডমে লেজানা।

ওরা দুজনে চলে গেল। করিডোরে আমি একা পায়চারি করছি।

একনম্বর সেলের কাছে গিয়ে দেখলাম, সেল ধোয়া-মোছা হয়ে গেছে। ভনসিয়া বালতি করে সকালের খিচুড়ী নিয়ে এলো।

বললাম : নিয়ে যাও।

*পাণ্ডেজী, ত্রিভুবনজী ও বিভুতি দাশগুপ্ত

মেজাজ দেখে একটাও কথা না বলে চলে গেল।

চেয়ে দেখি সুপার প্যারেরা পনের নম্বরে ঢুকছেন। সঙ্গে আরদালী ওয়ার্ডার ছাড়া কেউ নেই। একেবারে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন : তুমি সকালে খাবার ফিরিয়ে দিয়েছ ?

বললাম : সাহেব, অনশন করছি না, কিছু খাবার ইচ্ছে নেই। আমাকে একটু একা থাকতে দেবে ? আমাদের বন্ধুদের তো বেত মারবার জন্য নিয়ে গেছে। তুমি মনে কি কর, I am not fit for flogging ?

(একজন মানুষের দৈর্ঘ্যের চাইতে বড়ো একটি কাঠের বোর্ডের ওপর বেত্রদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীকে টিকটিকির মতো উপুড় করে শুইয়ে রেখে দুদিকে ছড়িয়ে দুহাত-পা শক্ত করে বাঁধা হয়। তারপর উলঙ্গ করে পশ্চাৎ দেশে একের পর এক চালান হয় লিকলিকে বেত। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে দর দর করে ঝরে পড়তে থাকে তাজা রক্ত। বেত্রচালক হয় বিশেষভাবে তৈরি জল্লাদশ্রেণীর।)

প্যারেরা আরও এগিয়ে এলেন, বললেন :

Don't mind. জানো ? আমিও কাল সারারাত ঘুমুতে পারিনি। I felt for the boy, the day I saw him first. No, no he can't kill a man. আমি ছুটি নিতে চেয়েছিলাম। ফাঁসির সময় থাকতে চাইনি। I did not. I did not !

গলা ভারী হয়ে এলো। কি বলতে চেয়েছিলেন, বলতে পারলেন না। আমি হতবাক্ হয়ে দেখলাম, প্যারেরা রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়ছেন।

একটু সামলে নিয়ে ব্যথা ভারাক্রান্ত প্যারেরা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন : Oh, he was such a brave boy !
